নির্মিতি অংশ

অনুচ্ছেদ

বাক্য মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু সব সময় একটি বাক্যের মাধ্যমে মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এজন্য প্রয়োজন একাধিক বাক্যের। মনের ভাব সম্পূর্ণরূ পে প্রকাশ করার জন্য পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বাক্যের সমষ্টিই অনুচ্ছেদ। অনুচ্ছেদে কোনো বিষয়ের একটি দিকের আলোচনা করা হয় এবং একটি মাত্র ভাব প্রকাশ পায়। অনুচ্ছেদ রচনার ৰেত্রে কয়েকটি দিকে লৰ রাখা প্রয়োজন। যেমন–

ক) একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি মাত্র ভাব প্রকাশ করতে হবে। অতিরিক্ত কোনো কথা লেখা যাবে না।

খ) সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো বাক্যের মাধ্যমে বিষয় ও ভাব প্রকাশ করতে হবে।

গ) অনুচ্ছেদটি খুব বেশি বড় করা যাবে না। লিখতে হবে একটি মাত্র প্যারায়। কোনোভাবেই একাধিক প্যারা করা যাবে না।

ঘ) একই কথার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ঙ) যে বিষয়ে অনুচ্ছেদটি রচনা করা হবে তার গুরবত্বপূর্ণ দিকটি সহজ–সরল ভাষায় সুন্দরভাবে তুলে ধরতে হবে। অনুচ্ছেদের বক্তব্যে যেন স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১ জাতীয় পতাকা

জাতীয় পতাকা একটি জাতির স্বাধীনতার প্রতীক। বিশ্বের প্রতিটি জাতির তাদের নিজস্ব জাতীয় পতাকা আছে। আমাদের দেশেরও একটি জাতীয় পতাকা আছে। এই একটি পতাকার জন্য আমাদের অনেক রক্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর আমরা এই পতাকাটি অর্জন করি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ রঙের ওপর একটি লাল বৃত্ত থাকে। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে এর অনুপাত ১০:৬। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পাতাকার দৈর্ঘ্যের এক–পঞ্চমাংশ। সবুজ রং তারবণ্যদীপ্ত প্রাণশক্তির জয়গান এবং বাংলাদেশের সবুজ মাঠ ও চিরহরিৎ উপক্রান্তীয় বনভূমিকে তুলে ধরে। লাল বৃত্তটি একটি নবগঠিত জাতির নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষা সমন্বিত একটি উদীয়মান সূর্যকে চিহ্নিত করে। জাতীয় পতাকা আমাদের গর্বের প্রতিদিন গুরবত্বপূর্ণ সরকারি ভবন এবং শিৰাপ্রতিষ্ঠানগুলোর চূড়ায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিশেষ কিছু দিবসে এটি অর্ধনমিত রাখা হয়। আমাদের জাতীয় পতাকা রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে সর্বদা আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রেরণা দেয়। এটি প্রতিনিয়ত স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর মর্যাদা রৰায় আমাদের সদা সচেষ্ট থাকা উচিত।

২ বাংলা নববর্ষ [ঢা. বো. ১৫]

নববর্ষ সকল দেশের সকল জাতিরই আনন্দ উচ্ছ্বাস ও মঙ্গল কামনার দিন। পুরাতন বছরের জীর্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে বছরের এই দিনটিতে নতুনকে আহ্বান জানানো হয়। বাংলাদেশেও পয়লা বৈশাখে সকলের কল্যাণ প্রত্যাশা করে মহা ধুমধামের সাথে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। এটি বাংলাদেশের সর্বজনীন ও শ্রেষ্ঠ লোকউৎসব। প্রবল উৎসাহ–উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালি এই উৎসব পালন করে থাকে। বাঙালির জাতিসত্তা বিনির্মাণে এবং স্বাধীনতা অর্জনে নববর্ষের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সম্রাট আকবরের সময় বাংলা সনের গণনা শুরব হয় বলে ধারণা করা হয়। জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুণ্যাহ আয়োজন করতেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার বিশেষ গুরবত্ব দিয়ে নববর্ষ পালন করায় সে আয়োজন দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। সবার মুখে লেগে থাকে হাসি, গায়ে থাকে রঙিন জামা। নববর্ষে হালখাতা, বৈশাখী মেলা, ঘোড়দৌড় এবং বিভিন্ন লোকমেলার আয়োজন করে সাধারণ মানুষ। সংস্কৃতি সংগঠন ছায়ানট নববর্ষে রমনার বটমূলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারবকলা ইনস্টিটিউট আয়োজন করে মঙ্গল শোভাযাত্রা। এতে আবহমান বাঙালির ঐতিহ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি থাকে সমকালীন সমাজ–রাজনীতির সমালোচনাও। এছাড়াও নানা বর্ণিল আয়োজনে দিনটিকে বরণ করা হয়। এই দিনে প্রত্যেক বাঙালি নিজের, বন্ধুর, পরিবার ও দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে। কোনো ধর্ম–গোত্র–শ্রেণির বন্ধনে বাঁধা পড়ে না বাংলা নববর্ষের উদ্‌যাপন। ফলে আমাদের জাতিগত সংহতি ও ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

৩ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ [ব. বো. ১৫]

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে উলেরখযোগ্য অধ্যায়। ১৯৭১ সালে এক রক্তৰয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি অর্জন করে প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। ত্রিশ লৰ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে যে স্বাধীনতা তাকে চিরসমুন্নত রাখতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের প্রেরণা জোগাবে চিরদিন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি লাভ করলেও প্রকৃত মুক্তি আসেনি বাঙালি জাতির। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত, ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট, ৫৮ সালে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ৬৬ সালের ৬ দফা, ৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানিরা ৰমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি শুরব করে। তখনই চূড়ান্ত স্বাধীনতা আন্দোলন শুরব হয়। বঙ্গবন্ধু চূড়ান্ত ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ২৫ই মার্চ মধ্যরাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগসহ নানা ধরনের বর্বরতা চালায় দেশজুড়ে। বাংলারজনতা সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানিদের অত্যাচার রবখে দেয়। দীর্ঘ নয় মাস ধরে রক্তৰয়ী সশস্ত্র যুদ্ধ চলে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। ৩০ লৰ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত রক্তৰয়ী যুদ্ধই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরব, আমাদের চেতনা। এই চেতনাকে মনেপ্রাণে ধারণ করেই আমাদের জাতি গঠনে কাজ করতে হবে।

৪ একুশে বইমেলা

একুশে ফেব্রবয়ারির সংগ্রামী চেতনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ফেব্রবয়ারি মাসজুড়ে বিভিন্ন ধরনের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম আয়োজন হলো মহান একুশে বইমেলা। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ফেব্রবয়ারি মাসজুড়ে এ মেলা চলে। বইমেলা উপলৰে বই বিক্রেতা ও প্রকাশকরা নানা সাজে বইয়ের স্টল বা দোকান সাজিয়ে বসেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের বইয়ের সমাহার ঘটে। বইমেলা উপলৰে প্রচুর নতুন বইমেলায় আসে। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি নতুন লেখকদের বইও পাওয়া যায় এখানে। প্রতিদিন বইয়ের আকর্ষণে বই প্রেমিক মানুষেরা মেলা প্রাঙ্গণে ছুটে আসে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি লেখক, ভাষাবিদ ও বরেণ্য ব্যক্তিত্বরা বইমেলায় আসেন। লেখক ও পাঠকদের মিলনমেলায় রূ প নেয় এই মেলা। এটি বাংলা একাডেমির একটি মহৎ উদ্যোগ। এ বইমেলার ফলে পাঠকরা এক জায়গা থেকে তাদের পছন্দের বই কিনতে পারে। এছাড়া বই

কেনার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহও তৈরি হয়। একুশের বইমেলা আমাদের সাহিত্য–সংস্কৃতিবোধ জাগ্রত করে। এ বইমেলা এখন আমাদের জাতীয় চেতনার সাথে সম্পৃক্ত।

৫ প্রিয় শিৰক

সুন্দর এই পৃথিবীতে পিতা–মাতার বদৌলতে সন্তান জন্মলাভ করে ঠিকই কিন্তু সেই সন্তানের জীবনকে সার্থক এবং সফল করে তোলার পেছনে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন শিৰক। শিৰকের কাছে আমরা গ্রহণ করি জীবনের মূল্যবান পাঠ। জ্ঞানের পৃথিবীতে তিনি আমাদের দ্বিতীয়বার জন্মদান করেন। সুশিৰকের প্রভাব মানুষের জীবন চলার পথে গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যে শিৰক আমার হৃদয় মানসে ধ্রুবতারার মতো জেগে আছেন তিনি হলেন ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিৰক জনাব বাবু হরিমন বিশ্বাস। তিনি আমাকে তাঁর সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। সবসময় আমার যত্ন নিতেন। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ছিল অনেক চমৎকার। আমাদের পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত অতিথি। তাছাড়া পাঠ্য বইয়ের বাইরেও আমি যাতে জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিষয় জানতে পারি সেজন্য তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। স্যার ছিলেন অনুভূতিপ্রবণ এক সুবিশাল ব্যক্তিত্ব। তিনি হৃদয় দিয়ে যা অনুভব করতেন তা সবার সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন। তাই তিনি আজও আমার প্রিয় শিৰক এবং চিরদিন আমার জীবনাকাশে আদর্শের মূর্ত তারকা হয়েই প্রজ্জ্বলিত থাকবেন।

৬ পিতা–মাতা

সন্তানের নিকট পিতা–মাতার স্থান সবার ওপরে। পিতা–মাতার মতো প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন সন্তানের কাছে আর কেউ নেই। পিতা–মাতাই সন্তানের সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী ও সবচেয়ে আপন। তাঁদের নিকট সন্তানরা এত বেশি ঋণী যে, এ ঋণ জীবনে শোধ করা সন্তানদের পৰে সম্ভব নয়। পিতা–মাতার কারণেই সন্তান এ পৃথিবীতে আসতে পারে। জন্মের পর মায়ের কোলই সন্তানের প্রধান আশ্রয়। সন্তানের লালন–পালনের জন্য পিতা–মাতাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। সন্তান অসুস্থ হলে তাঁরা আহার–নিদ্রা ভুলে তার পাশে বসে থাকেন। সর্বস্ব ব্যয় করে সন্তানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন। নিজে না খেয়ে হলেও সন্তানের জন্য তাঁরা আহার জোগান। সন্তানের প্রতি পিতা–মাতার ভালোবাসা নিঃস্বার্থ। মাতা–পিতা শৈশবে আমাদের লালন–পালন করেছেন, তেমনি বৃদ্ধ বয়সে তাঁদেরকে আদর যত্নের মধ্যে রাখা আমাদের কর্তব্য। আমাদের উচিত সর্বাবস্থায় পিতা–মাতাকে সুখী রাখার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করা। সন্তান যখন পিতা–মাতার মুখে হাসি ফোটাতে পারে, তখনই তার জীবন সার্থক হয়ে ওঠে।

৭ শিৰাসফর

'শিৰা সফর' শব্দটি শিৰার্থীদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। জ্ঞান আহরণের ৰেত্রে দুটি মাধ্যম সবচেয়ে বেশি গুরৰত্বপূর্ণ। এগুলো হলো– বই এবং ভ্রমণ। বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করলে মানুষ প্রত্যৰ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এ অভিজ্ঞতা সব সময় মানুষের মনে অম্লান হয়ে থাকে। ছাত্রসমাজকে জ্ঞানের সংস্পর্শে নিয়ে যাওয়ার জন্যই বিভিন্ন স্কুল–কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিৰাসফরের আয়োজন করে থাকে। শিৰাসফরে একটি নির্দিষ্ট জায়গা পরিভ্রমণের মাধ্যমে অদেখাকে দেখা যায়, অজানাকে জানা যায় সফর মাত্রই রোমাঞ্চকর। আর তা যদি শিৰাকে কেন্দ্র করে হয় তবে তো কথাই নেই। আমাদের পাঠ্যশিৰার বিষয়টি শিৰাসফরের মাধ্যমে আরও পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয় আমাদের কাছে। যেকোনো ঐতিহাসিক স্থান, জাদুঘর কিংবা বিশেষ কোনো স্মৃতিবিজড়িত স্থান পরিদর্শনের মাধ্যমে শিৰা লাভের পথ সুগম হয়। বাস্তবিক জীবনবোধের সাথে পরিচিত হতে হলে শিৰাসফরকে গুরৰত্ব দেওয়া আবশ্যক। শিৰাসফর আমাদের জীবনবোধের পরিধিকে বিস্তৃত করে জ্ঞানকে পরিপূর্ণতা দান করে। এতে দৃষ্টি উন্মীলিত হয় এবং মানুষ নব নব অভিযানে অংশ নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি একঘেয়েমি দূর করে বৈচিত্র্য এনে দিতে পারে শিৰাসফর। শিৰার পরিপূর্ণতা লাভে শিৰাসফর কার্যকর ভূমিকা রাখতে সৰম।

৮ স্বেচ্ছায় রক্তদান

মানুষ সামাজিক জীব। পরের কল্যাণে নিজে উৎসর্গ করে জীবনকে সার্থক করার সুযোগ কেবল মানুষই পায়। বর্তমান সময়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান মানুষের কল্যাণ করার এক চমৎকার সুযোগ হয়ে ধরা দিয়েছে মানুষের কাছে। রক্ত মানবদেহের অপরিহার্য একটি উপাদান। রক্ত থাকলেই মানুষের দেহ সজীব ও সক্রিয় থাকে। কিন্তু রক্তের ঘাটতি হলেই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুস্থ ব্যক্তির স্বেচ্ছায় রক্তদানের বিনিময়ে যেকোনো মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবন বেঁচে যেতে পারে। তাই স্বেচ্ছায় রক্তদানের মতো মহৎ কাজ আর নেই। বর্তমানে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে আগ্রহী করতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নানা ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগঠন হলো 'সন্ধানী'। ১৯৭৭ সাল থেকে। এখনও এটি জনস্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন শিৰাপ্রতিষ্ঠানে 'বাঁধন'–এর অন্তত ১০০টি শাখা রয়েছে। স্বেচ্ছায় রক্তদান করলে যেকোনো ব্যক্তি শারীরিকভাবেও সুস্থ থাকতে পারেন আবার তা অন্যের জীবনকেও বাঁচিয়ে তোলে। তাই স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়ে সবাইকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসবে হবে।

৯ মহান বিজয় দিবস [দি. বো. ১৫]

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রাম শেষে এদিন আমাদের দেশ শত্রুমুক্ত হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তাই ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯–এর গণ–অভ্যুত্থান, ৭০–এর সাধারণ নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর আমরা এই ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয় লাভ করি। তাই বাংলার আবাল–বৃদ্ধ–বণিতা মহাসমারোহে এদিনটি উদ্‌যাপন করে। এদিন বিভিন্ন অফিস–আদালত, শিৰাপ্রতিষ্ঠান ও প্রতিরৰা বাহিনীর সদস্যগণ পতাকা উত্তোলন করেন এবং কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। সরকারি–বেসরকারি ভবন ও দেশের প্রধান প্রধান সড়ককে জাতীয় পতাকায় সুশোভিত হয়। বহু ত্যাগ–তিতিৰা আর রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে কত ছাত্র, জনতা, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী মানুষ। বিজয়ের আনন্দের মাঝে তাই জেগে ওঠে তাদের হারানোর বেদনা। মহান বিজয় দিবস শুধু জাতীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন নয়, এটি বাঙালির হৃদয় এবং সত্তার গভীরে প্রোথিত একটি অনন্য দিন। বিজয় দিবস স্বাধীনতাকামী বাঙালির পবিত্র চেতনার ধারক। বাঙালির হাজার বছরের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে দ্যুতিময় এ মহান বিজয় দিবস চিরদিন সমুজ্জ্বলভাবে টিকে থাকবে। প্রতিবছর এ দিবসে আমরা আত্মসচেতন হই, প্রত্যয়ে দৃপ্ত হই, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করি–রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এ স্বাধীনতাকে আমরা যেকোনো মূল্যে সমুন্নত রাখব।

১০ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি" –এ চরণ দ্বারা আমরা স্মরণ করি ভাষাশহিদদের যারা মাতৃভাষা বাংলার জন্য প্রাণ দিয়েছিল। এ দিনটি ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব লাভ করেছে। বহু তাজা রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের মাতৃভাষার গৌরব রৰা করেছি। ১৯৪৭ সালের ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে 'পাকিস্তান' সৃষ্টি হলেও পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের মাতৃভাষার মর্যাদা দিতে চায়নি। ১৯৪৮ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন। ছাত্ররা তাৎৰণিক এর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। এ প্রতিবাদ আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রজনতা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা করে মিছিলে মিছিলে রাজপথ প্রকম্পিত করে। প্রতিবাদী ছাত্রদের মিছিলে গুলি করা হলে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বারসহ অনেকে। তাদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় মাতৃভাষার মর্যাদা। প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি সরকারিভাবে পালন করা হয়। আমরা শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে একুশের শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদের ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে ১৮৮টি দেশে এ দিবস পালিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার স্বীকৃতির দাবিতে শহিদ হওয়ার ঘটনা শুধু ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতেই ঘটেছিল। বাংলা ভাষার জন্য আত্মবিসর্জনের সে ঘটনা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলা ভাষার কথা বাঙালিদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

১১ অতিথি পাখি

অতিথি পাখি বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতি বছরই উষ্ণতার খোঁজে হাজার হাজার কিলোমিটারের পথ পাড়ি দিয়ে এই পাখিরা আমাদের দেশে উড়ে আসে। শীতপ্রধান দেশে তাপমাত্রা অধিকাংশ সময়ই শূন্যের নিচে থাকে। এর পাশাপাশি তুষারপাত, তুষারঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও দেখা যায়। এ সময় প্রচণ্ড ঠান্ডা থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য উত্তর মেরব, সাইবেরিয়া, ইউরোপ, হিমালয়ের আশপাশের কিছু অঞ্চল ইত্যাদি স্থান থেকে পাখিরা দল বেঁধে চলে আসতে থাকে অপেৰাকৃত কম ঠান্ডা অঞ্চলের দিকে। এই পাখিদেরকেই বলা হয় পরিযায়ী পাখি বা অতিথি পাখি। শীতের সময় অতিথি পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে আমাদের নাটোরের চলনবিল অঞ্চলসহ কিছু জলাশয়। বাংলাদেশে আগত অতিথি পাখিদের মধ্যে অধিকাংশই আসে হিমালয়ের পাদদেশের তিব্বতের লাদখা থেকে সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান ফ্লাইওয়ে দিয়ে। এসব পাখির মধ্যে বালিহাঁস, বুনোহাঁস, চখাচখি, হেরন, সারস, ডাহুক, কাদাখোঁচা, গায়ক রেন পাখি, ডুবুরি পাখি, রাজসরালি, গ্যাডওয়াল, পিন্টেইল, নীলশীর, পিয়াং, চীনা, পান্তামুখী, গিরিয়া, খঞ্জনা, পাতারি, জলপিপি উলেৱখযোগ্য। প্রায় ১৫০ প্রজাতির পাখি প্রতিবছর আমাদের দেশে বেড়াতে আসে। কয়েক মাস কাটিয়ে বসন্তকালে অর্থাৎ মার্চ–এপ্রিলের দিকে যখন শীতপ্রধান অঞ্চলের বরফ গলতে থাকে তখন তারা নিজ দেশে ফিরে যায়। এই পাখিগুলো আমাদের জীববৈচিত্র্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য সংযোজন করে। কিন্তু কতিপয় অসাধু পাখি শিকারি অতিথি পাখি শিকার করে বাঙালির অতিথিপরায়ণতার সুনামকে ক্ষুণ্ন করে। অতিথি পাখির জন্য বাংলাদেশকে অভয়ারণ্য হিসেবে গড়ে তোলাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

১২ বর্ষণমুখর দিন

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহে প্রকৃতি যখন নির্জীব হয়ে ওঠে তখন বর্ষা আসে প্রাণস্পন্দন নিয়ে। বর্ষণমুখর দিনে অনুভূতিপ্রবণ মানুষ আরও বেশি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। বর্ষণস্নাত দিন এক মিশ্র অনুভূতি সৃষ্টি করে মানুষের মনে। এদিনে মানুষ ও প্রকৃতি যেন একে অপরের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। প্রতিটি মানুষের কাছেই এদিনটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তপ্ত তৃষিত পৃথিবীর বুকে বৃষ্টির স্পর্শ জাগায় রোমাঞ্চকর অনুভূতি। মানুষের মনেও তার প্রভাব পড়ে। প্রকৃতির বৃষ্টিস্নাত রূ প মানুষকে আবেগাপ্লুত করে তোলে। বর্ষণমুখর দিনে মানুষের মাঝে অজানা এক আলস্য এসেও যেন ভর করে। কোনো কাজ–কর্মে মন বসে না। বাইরে যেতেও ইচ্ছা করে না কারও। এ দিন ঘরে থেকে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যেতেই মন চায় অধিকাংশ মানুষের। আর তার সাথে যদি খাবার হিসেবে থাকে গরম খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ তবে তো কথাই নেই। বর্ষণমুখর দিনে আলাদা বিশেষত্ব রয়েছে। আকাশ কালো করে যখন চারদিক ছাপিয়ে বৃষ্টি নামে তখন প্রত্যেক মানুষের মনে এক শীতল অনুভূতির সৃষ্টি হয়। মাঠে–ঘাটে–প্রান্তরে সর্বত্র হুঙ্কার তুলে আসে প্রমত্ত বাদল। কর্মব্যস্ত মানুষকে এক পশলা শান্তির নির্যাস দিয়ে যায় যেন বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতি। আর ঘরে অবস্থানরত মানুষের মনে একাকিত্বের করুণ সুর বেজে ওঠে। তাই বর্ষণমুখর দিন মানুষের মনে মিশ্র অনুভূতির সঞ্চার করে।

১৩ নারী শিৰা [কু. বো. ১৫]

শিৰা প্রতিটি মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। এৰেত্রে নারী–পুরুষ উভয়ের সমান অংশীদারিত্ব রয়েছে। নারী ও পুরুষ সমাজ নামক দেহের দুইটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নারী শিৰিত হলে পরবর্তী প্রজন্মও শিৰিত হয়ে গড়ে ওঠে। তাই নেপোলিয়ন বলেছেন, "আমাকে একটি শিৰিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিৰিত জাতি দেব।" বর্তমানে বাংলাদেশে নারী শিৰার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। দেশের উন্নতিতে পুরুষের পাশাপাশি এখন নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা থাকলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে শুধু মেয়েদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত নারী শিৰা অবৈতনিক করা হয়েছে। নারী শিৰায় অগ্রসর হওয়ার লৰ্যে সরকারের এ পদৰেপ প্রশংসনীয়। শিৰকতায় এর মধ্যে ৬০ ভাগ শিৰিকাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পেশাগত শিৰায় এখন নারীর অংশগ্রহণ ৩৮ শতাংশ। সরকারের নানা উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে নারী শিৰার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। নারী শিৰার অগ্রগতিতে বাংলাদেশ 'রোল মডেল' হিসেবে কাজ করছে। নারী শিৰায় বাংলাদেশ তুলনামূলক অগ্রগতি সাধন করলেও সার্বিক দিক বিবেচনায় তা এখনও পর্যাপ্ত নয়। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে নারী শিৰার প্রসারে। তবেই দেশ ও জাতির যথাযথ অগ্রগতি সাধিত হবে।

১৪ সড়ক দুর্ঘটনা [চ. বো. ১৫]

সাম্প্রতিককালের অন্যতম জাতীয় সমস্যা হলো সড়ক দুর্ঘটনা। নিরাপদ জীবনযাপনের ৰেত্রে বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এটি। প্রতিদিনই ঘটছে সড়ক দুর্ঘটনা। পত্রিকা ওল্টালেই প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনার বীভৎস সব খবর আমাদের চোখে পড়ে। সড়ক দুর্ঘটনার ফলে মানবসম্পদের অপূরণীয় ৰতি সাধিত হচ্ছে। বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ সেন্টারের (এআরসি) গবেষণা অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় গড়ে ১২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। আহত হয় ৩৫ হাজার লোক। সড়ক দুর্ঘটনা ঘটার পেছনে রয়েছে নানা কিছু কারণ।

এগুলোর মধ্যে উলেরখযোগ্য হলো– সরব রাস্তা ও রাস্তায় ডিভাইডার না থাকা, পুরনো ও ত্রবটিপূর্ণ যানবাহন, উন্নতমানের ও টেকসই সড়কের অভাব, চালকের অদৰতা, ড্রাইভিং পেশার উৎকর্ষহীনতা, সনাতনি ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা, সড়ক নিরাপত্তায় সচেতনতার অভাব, বিকল্প যানবাহনের পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকা, আইন প্রয়োগের অভাব, জনসচেতনতার অভাব, চালকের ওভারটেকিং করার প্রবণতা, রাস্তায় সড়কবাতি না থাকায় ইত্যাদি মনে রাখতে হবে যে, "একটি দুর্ঘটনা, সারা জীবনের কান্না"। তাই সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

১৫ বই পড়া [য. বো. ১৫]

বই হলো জ্ঞানের আধার। জ্ঞান অর্জনের জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বই পড়া সর্বাপেৰা উত্তম কাজ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান বই পড়ার মাধ্যমেই আমরা পেয়ে থাকি। মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ সাধনের অন্যতম মাধ্যম হলো বই। সকল কালের এবং সকল দেশের ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে বইয়ের প্রতিটি পাতায়। মানুষের জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের আধার নয়। প্রতি মুহূর্তে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ায় নানা চিন্তায় মগ্ন থাকতে হয় মানুষকে। নির্মল আনন্দের উৎস খুঁজে পাওয়া বিরল। বই পড়ার মাধ্যমে আমরা সে নির্মল আনন্দের উৎসকে সহজেই খুঁজে পেতে পারি। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের বই পড়েই পাওয়া যায়। বই মানুষের সবচেয়ে উত্তম সঙ্গী। তবে বইয়ের পাতায় বিবৃত ইতিবাচক জ্ঞান তখনই মানুষ অর্জন করতে পারবে যখন সে একটি ভালো বই বেছে নেবে। বইয়ের নানা ধরন রয়েছে। বিশুদ্ধ জ্ঞান তখনই অর্জন করা যায় যখন সঠিক ও ভালো বইকে আমরা সঙ্গী হিসেবে বেছে নিই। বই আমাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে উপকার করে। একটি বই কাল থেকে কালান্তরে জ্ঞান বিলিয়ে থাকে। মানুষকে স্বশিৰিত ও সুশিৰিত করে গড়ে তোলে। বই পড়ার মাধ্যমে নির্মল জ্ঞানের সন্ধান করাই জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ। তাই সঠিক জ্ঞান ও জীবনপথের সন্ধান পেতে হলে উত্তম বই পড়া আবশ্যক।

১৬ সত্যবাদিতা [সি. বো. ১৫]

প্রকৃত মানুষ হতে হলে যেসব নৈতিক গুণ থাকা আবশ্যক তার মধ্যে সত্যবাদিতা অন্যতম। সত্যবাদিতা একটি পবিত্র গুণ। যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে তার পৰে অন্যায় কাজ করা অসম্ভব। সত্য বললে মানুষের জীবনযাপন অনেক সহজ হয়ে যায় এবং সে পাপ–পঙ্কিলতা থেকে দূরে থাকতে পারে। যে ব্যক্তি মিথ্যার আশ্রয় নেয় সে একটি চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। একটি মিথ্যা লুকানোর জন্য তাকে আরও অনেক মিথ্যা বলতে হয়। ফলে সে অনবরত নানা পাপকাজে লিপ্ত হয়। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তাকে মিথ্যা বলতে হয়। কিন্তু জীবনকে সুখ ও শান্তিময় করে তুলতে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্য পথে থাকলেও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে। তবুও কোনো অবস্থাতেই সত্যের পথ ত্যাগ করা সমীচীন নয়। সত্যবাদিতা মানুষকে সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ করতে সাহায্য করে। শত বাধার সম্মুখীন হয়েও যে ব্যক্তি সত্যকে অবলম্বন করে পথ চলে সে সকলের কাছে প্রিয় হয়। তার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই সুখের হয়। সত্যবাদিতার সাহায্যে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজও সহজে সমাধান করা যায়। তাই সব অবস্থাতেই সত্যবাদিতাকে আশ্রয় করা উচিত।

১৭ বিদ্যালয়ের শেষ দিন [সি. বো. ১৫]

বিদ্যালয়ের প্রথম দিন এবং শেষ দিন দুটোই আমার কাছে বেশ স্মৃতিময় ও আবেগপূর্ণ। বিদ্যালয়ের শেষ দিন আমার কাছে স্মৃতির ডালা হিসেবে ধরা দেয়। আমাদের এসএসসি পরীৰার দ্বারপ্রান্তে ছিলাম তখন আমরা। আমাদের নির্বাচনি পরীৰা শেষ হওয়ার কিছুদিন পরই ক্লাস বন্ধ হওয়ার ঘোষণা দিলেন শিৰক–শিৰিকাগণ। তাই আমরা বিদ্যালয়ের শেষ দিনটি আনন্দের সাথে উদ্‌যাপন করার পরিকল্পনা করলাম। প্রথমেই আমরা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীরা শ্রেণিশিৰিকাকে সাথে নিয়ে কেক কাটলাম। আমাদের উদ্দেশে তিনি অনেক মূল্যবান উপদেশ দিলেন। এরপর আমাদের মধ্যে অনেকেই নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করল। তার মধ্যে আমিও ছিলাম। দীর্ঘ সময় একই বিদ্যালয়ে কাটানোর পর ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট লাগছিল। আমরা সব বিভাগের ছাত্রীরা মিলে একসাথে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম। সেখানে প্রধান শিৰিকা আমাদের উদ্দেশে অনেক কথা বললেন। এরপর আমরা বান্ধবীরা মিলে নাচ–গান করে বেশ হইচই করলাম। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আমাদের। এতদিনের সান্নিধ্যের ছন্দপতনের ভয়ে সবাই বিষণ্ন হলাম। পরৰণেই আমাদের আবেগ যেন বাঁধ ভেঙে দিয়ে অশ্রব হয়ে গড়িয়ে পড়ল। সবাই সবার সাথে এক আত্মিক বন্ধন অনুভব করলাম। আমার প্রিয় শিৰিকসহ রেহানা ম্যাডামকে আমরা দিনে একটি ফুলের ডালি, কার্ড, কলম, ডায়েরি ইত্যাদি উপহার দিলাম। তাঁদের সাথে ছবিও তুলে নিলাম। আজও আমার কাছে বিদ্যালয়ের সেই শেষ দিনটি বিশেষভাবে ধরা দেয়। এদিনটির কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

১৮ পহেলা ফাল্গুন

বসন্তের প্রথম দিন পহেলা ফাল্গুন হিসেবে পরিচিত। বাংলার ষড়ঋতু পরিক্রমায় সবার শেষে আসে ঋতুরাজ বসন্ত। ফাল্গুন ও চৈত্র, এ দুই মাস মিলে বসন্তকাল। শীতের শুষ্কতা আর জীর্ণতাকে ঘুচিয়ে নবীন আলোক বার্তা নিয়ে আসে ফাল্গুন। ১লা ফাল্গুন আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির একটি উলেরখযোগ্য দিন। এদিন সারাদেশে তারবণ্যের জোয়ার নামে। মেয়েরা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে সেজেগুজে বের হয়। মাথায় পরে রং–বেরঙের ফুলের মালা। ছেলেরাও পরে পাঞ্জাবি। বিভিন্ন শ্রেণিপেশার, বিভিন্ন বয়সের মানুষ পহেলা ফাল্গুন উপলৰে উৎসবমুখর পরিবেশে বাইরে ঘুরতে বের হয়। পহেলা ফাল্গুনের উৎসব শহরেই বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে ঢাকায়। চারবকলা ইনস্টিটিউটের শিৰার্থীরা এদিন বকুলতলায় বসন্ত উৎসব পালন করে। দেশীয় সংস্কৃতিকে ধারণ করে সারাদিন গান চলতে থাকে। এ উৎসব ছড়িয়ে যায় শাহবাগ, পাবলিক লাইব্রেরি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত। এদিন মানুষে মানুষে শুভেচ্ছা ও কুশলাদী বিনিময় হয়ে থাকে। পহেলা ফাল্গুন আমাদের উৎসব ও ঐতিহ্যপ্রিয়তারই অনন্য নিদর্শন। বাঙালির জীবনে পহেলা ফাল্গুনের গুরবত্ব তাই অপরিসীম। এটি বাঙালির সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ সংস্কৃতির চেতনা আমাদের ধারণ ও লালন করতে হবে।

১৯ ডিজিটাল বাংলাদেশ

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বর্তমান সময়ে অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয়। উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এটি একটি সময়োচিত পদৰেপ। ডিজিটাল বাংলাদেশ কী, এ বিষয়কে বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে একটি দেশ কীভাবে ডিজিটাল দেশে পরিণত হতে পারে। একটি দেশকে তখনই ডিজিটাল দেশ বলা যাবে যখন তা ই–স্টেটে পরিণত হবে। অর্থাৎ ওই দেশের যাবতীয় কাজ যেমন– সরকারব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, ব্যবসায়–বাণিজ্য, শিৰা, চিকিৎসা, কৃষি প্রভৃতি কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। তাই একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি গুরবত্বপূর্ণ

প্রত্যয়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে একটি গুরবত্বপূর্ণ দিক ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার। ২০২১ সালে পালিত হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। সেই লব্যে এ সময়ের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লব্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে একটি ডিজিটাল সমাজ নিশ্চিত করবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, যেখানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সমস্ত কর্মকাণ্ডে অনলাইন প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত হবে। কার্যকর তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি সুশাসিত সমাজব্যবস্থা নিশ্চিত করাই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রকল্পের মূল লব্য। এবেত্রে সবার আগে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী তথ্যপ্রযুক্তি কাঠামো গড়ে তোলা। সেই লব্যে বিদ্যুৎ ঘাটতির সমাধান, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কাঠামোর উন্নয়ন ও ইন্টারনেট ব্যবহারে প্রশিবণ, ইংরেজি শিবার ব্যবহারসহ বিভিন্ন পদবেপ নিতে হবে। বিশ্বায়ন সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি দ্রবত প্রসারের ফলে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে ডিজিটাল উন্নয়নের চলমান প্রক্রিয়ায়। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামক প্রকল্পের সাথে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র তৈরি করতে হবে। তবেই উন্নত, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের এই স্বপ্ন পূরণ হবে।

২০ সততা

সততা মানবচরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি গুণ। সর্বদা সত্য কথা বলা, সৎপথে চলা এবং কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত না হওয়ার নামই সততা। এক কথায় সত্যের অনুসারী মানুষের সৎ থাকার গুণকে সততা বলা হয়। এই গুণ অর্জনের চেষ্টা ও চর্চা একজন মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে মর্যাদা ও গৌরবের আসনে। নিষ্ঠার সঙ্গে নিরলস অনুশীলনের মাধ্যমে এই গুণ অর্জন করা যায়। আর এই গুণ যিনি অর্জন করতে পারেন তিনিই সমাজে আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে থাকেন। সততাকে তাই মানবচরিত্রের অলংকার বলা হয়। সততার সুফল শত ধারায় বিকশিত। জীবনকে সুন্দর, সফল ও সার্থক করার জন্য সৎ থাকার অভ্যাস করতে হয়। সৎগুণসম্পন্ন মানুষ কখনোই অন্যায় ও অবৈধ কাজে লিপ্ত থাকতে পারে না। সৎ লোক মাত্রই চরিত্রবান ও মহৎ হয়ে থাকে। তাই সে সবার বিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধেয় হয়। সততা মানুষের নৈতিকতাকে সমুন্নত করে। সৎ ব্যক্তি কখনোই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না। একটি সমৃদ্ধ ও আদর্শ জীবন গড়ার জন্য সততার বিকল্প নেই। শিবার্থীদের উচিত ছাত্রজীবন থেকেই সৎ গুণগুলো অনুশীলন করা। তাহলেই তারা পরিবার ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে।

২১ দুর্নীতি

জাতীয় জীবনে উন্নতির অন্যতম অন্তরায় দুর্নীতি। আমাদের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রকোষ্ঠে দুর্নীতি এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, আজকাল একে এড়িয়ে আমাদের চলাই দায়। অফিস–আদালতে, পেশায়–নেশায়, ঘরে–বাইরে, রাজনীতি কিংবা ধর্মনীতি সর্ববেত্রে দুর্নীতির সর্বগ্রাসী প্রভাব বিদ্যমান। দুর্নীতি যেন সভ্য সমাজে স্বাভাবিক বিষয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পর পর বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দুর্নীতির কারণে বিদেশি বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে, সাহায্যের হাতও গুটিয়ে নিচ্ছে ধনী দেশগুলো। দুর্নীতির অবাধ বিস্তার সামাজিক বেত্রে নব্য ধনিকশ্রেণির সৃষ্টি করছে, জন্ম দিচ্ছে নানামুখী বৈষম্য। সন্ত্রাস নামক যে ভয়ংকর দানব সমাজকে নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে তার পেছনেও রয়েছে দুর্নীতির প্রভাব। দুর্নীতি জন্ম দিয়েছে মূল্যবোধহীনতা, যা সমাজকে অবরয়ের অতলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে দুর্নীতি এক দুরারোগ্য ব্যাধি, দুর্বিষহ অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। এর করাল গ্রাসে জাতীয় উন্নতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। মেধা ও পরিশ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না। বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। দেশের সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। স্বনির্ভর জাতি গড়ে তোলার জন্য দুর্নীতি নামক এই অভিশাপকে রবখতে হবে এখনই। সকলের সম্মিলিত অঙ্গীকারই পারে এর প্রভাব কমিয়ে আনতে।

২২ আমাদের লোকশিল্প

দেশি জিনিস দিয়ে দেশের মানুষের হাতে তৈরি শিল্পসম্মত দ্রব্যকেই লোকশিল্প বলা হয়। বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপন ও গ্রামীণ ঐতিহ্যের সাথে লোকশিল্পের নিবিড় যোগাযোগ বিদ্যমান। নানা ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পে আমাদের দেশ সমৃদ্ধ। ঢাকাই মসলিন নিয়ে আজ অবধি আমরা গর্ববোধ করি। লুপ্তপ্রায় নকশিকাঁথা আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্যের স্মারক। আমাদের দেশের লোকশিল্প বিভিন্ন রূ পে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রাধান্য পেয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা, টাঙ্গাইল, সাহজাদপুর, কুমিলরা, চট্টগ্রাম এলাকার তাঁতশিল্প উলেরখযোগ্য। এ ছাড়াও নারায়ণগঞ্জের জামদানি, খুলনার মাদুর, সিলেটের শীতল পাটি আমাদের সবার পরিচিত। বাংলাদেশের মৃৎশিল্পীদের তৈরি পোড়ামাটির কলস, হাঁড়ি, পাতিল, সানকি, ফুলদানি, পুতুলও আমাদের লোকশিল্পের গুরবত্বপূর্ণ অংশ। গ্রামের ঘরে ঘরে শিকা, হাতপাখা, বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র, কাপড়ের পুতুলও আমাদের দেশের মানুষের রবচির পরিচায়ক। লোকশিল্প যেমন আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে তেমনি বিদেশি মুদ্রা উপার্জনেও অবদান রাখে। এর ভেতর দিয়ে দেশের অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব। তাই লোকশিল্পের সংরবণ ও সম্প্রসারণের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

২৩ পরিবেশ দূষণ [ঢা. বো. ১৫]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর। জীবনযাপন তাই এখন অনেক আধুনিক, অনেক সহজ। কিন্তু তা করতে গিয়ে মানুষ পরিবেশ ধ্বংসের নেতিবাচক দিকে লব রাখছে না। মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তু পরিবেশও প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতির দানেই মানুষ নানা আঙ্গিকে নিজের জীবনকে সাজিয়ে তুলেছে। অথচ অবিবেচক মানুষদের কারণেই পরিবেশ আজ ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ দূষণ মূলত দুটি কারণে ঘটে। একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণ আর অন্যটি মানবসৃষ্ট কারণ। বর্তমান সময়ে পরিবেশ দূষণের পেছনে মানুষের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। জনসংখ্যার বিস্ফোরণের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ– বায়ু, পানি, মাটির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। বনজ সম্পদ ধ্বংসে রীতিমতো উৎসব চলছে বিশ্বজুড়ে। ফলে পরিবেশ দূষণের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাতাসে ধুলোবালি, কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া, কীটনাশক ইত্যাদির উপস্থিতি বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে। কলকারখানার বর্জ্য, কীটনাশক ইত্যাদি পানিকে করে তুলেছে বিষাক্ত। হাজারো রকমের উৎকট শব্দের কারণে শব্দদূষণ ঘটছে। নষ্ট হচ্ছে মনের শান্তি। ৰতিকর রাসায়নিক ও যত্রতত্র আবর্জনা ফেলায় দূষিত হচ্ছে মাটি। এভাবে দূষিত হতে থাকলে একসময় পরিবেশের ভারসাম্য সম্পূর্ণরূ পে নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে এই বিশ্ব জীবের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব আজ মারাত্মক হুমকির মুখে। বিশ্বের পরিবেশবাদীরা চেষ্টা করছেন এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তুলতে। নেওয়া হচ্ছে নানামুখী পদবেপ। উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরবণ–এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধ ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা ব্যাপক ভিত্তিতে তৈরি না হলে পরিবেশ দূষণ কমানো সম্ভব হবে না।

পরিবেশ দূষণ যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে সবারই ভূমিকা রাখা উচিত। সকলের সচেতনতাই আমাদের পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে পারে।

২৪ যানজট [দি. বো. ১৫]

যানজট বলতে বোঝায় যানবাহনের জট। রাস্তায় যানবাহন যখন স্বাভাবিক গতিতে চলতে না পেরে অস্বাভাবিক জটের সৃষ্টি করে তখন তাকেই আমরা যানজট বলে থাকি। যানজট জনবহুল এই বাংলাদেশের এক বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি লৰ করা যায় শহরগুলোতে, বিশেষত রাজধানী ঢাকাতে। যানজটের সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার শহরাঞ্চলের প্রতিটি মানুষ। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে শহরগুলো প্রতিনিয়ত মানুষের ভিড় বেড়েই চলেছে। জনগণের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে যানবাহনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে; যা তৈরি করছে যানজট। এছাড়া রাস্তার স্বল্পতা, অপ্রশস্ততা, অপরিকল্পিত নগরায়ন, ট্রাফিক আইন অমান্য করাই হচ্ছে যানজটের অন্যতম কারণ। যানজটের ফলে নষ্ট হয় অসংখ্য কর্মঘণ্টা। প্রয়োজনীয় কাজগুলো যথাসময়ে করা সম্ভব হয় না। প্রায়ই ঘটে মারাত্মক সব দুর্ঘটনা। এভাবে যানজটের কারণে ব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন ৰতিগ্রস্ত হচ্ছে। যানজট সমস্যা দূর করার জন্য অত্যন্ত কঠোরভাবে ট্রাফিক আইন পালন করাই হতে পারে এৰেত্রে কার্যকর পদৰেপ। নগর উন্নয়নের জন্য পরিচালিত কর্মকাণ্ডগুলোও হওয়া উচিত সুপরিকল্পিত। শহরগুলোর যানজট সমস্যা সমাধানে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদৰেপ গ্রহণ করার কোনো বিকল্প নেই।

২৫ কম্পিউটার

বিবর্তনের সোপান বেয়ে আসে সভ্যতা। এর ফলে সৃষ্টি হয় নানা বিস্ময়কর জিনিস। বর্তমানে আমরা কম্পিউটারের যুগে উত্তীর্ণ হয়েছি। কম্পিউটার যুগ বলতে বোঝায় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যুগ। আর কম্পিউটার হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র, যা মানুষের মস্তিষ্কের বিকল্প। কম্পিউটার ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল কাজ অনুগত ভৃত্যের মতো হুকুম তামিল করতে সদা প্রস্তুত। কম্পিউটারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার সকল পর্যায়ের অত্যন্ত জটিল কাজ খুব সহজেই সমাধান করা সম্ভব। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি কম্পিউটার এমন হিসাব-নিকাশ করতে পারে যা একজন প্রশিৰণপ্রাপ্ত গণিতজ্ঞের কয়েক বছর সময় প্রয়োজন হবে। দ্রুততম কম্পিউটারগুলো লৰ লৰ সমস্যা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সমাধান করতে পারে। কোনো ধরনের ত্রুটি ছাড়াই এটি একই সময়ে অনেকগুলো কার্যক্রম চালাতে পারে। আজকাল কম্পিউটার বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি ব্যবসা চালাতে পারে, শিৰা প্রদান করতে পারে, বিমান চালাতে পারে, এমনকি সংগীত সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের উচিত দেশের উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। তাহলেই আমরা একটি প্রযুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক জাতি গড়তে পারব।

২৬ ইন্টারনেট

আধুনিক যোগাযোগের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির নাম ইন্টারনেট। তথ্য প্রযুক্তির ৰেত্রে এটি বৈপৱবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো ব্যবহার করে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হলো ইন্টারনেট। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে বহুল আলোচিত ও সবচেয়ে গতিশীল যোগাযোগ ব্যবস্থা এটি। ইন্টারনেটকে বলা হয় নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক। ইন্টারনেটের অবদানের ফলে এক যুগ আগে যোগাযোগের ৰেত্রে যা ছিল অসম্ভব বা অকল্পনীয়, বর্তমানে তা চোখের পলকে সাধিত হচ্ছে। তথ্য আদান-প্রদান থেকে শুরু করে বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষের সাথে আড্ডা, সম্মেলন, শিৰা, বিপণন, অফিস ব্যবস্থাপনা, বিনোদন ইত্যাদি ইন্টারনেটের সাহায্যে করা যাচ্ছে। মাল্টিমিডিয়ার বিকাশের সাথে সাথে প্রতিদিন এর সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হচ্ছে। এক দেশের মানুষ ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্য দেশের চিকিৎসকের নিকট থেকে চিকিৎসাসেবা পাচ্ছে। ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এক দেশে বসে অন্য দেশে জিনিসপত্র কেনাকাটা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রযুক্তির সাহায্যে ঘরে বসেই কোনো শিৰার্থী বিশ্বের বড় বড় লাইব্রেরির শ্রেষ্ঠ বইগুলো পড়তে পারছে। অল্প খরচে পৃথিবীর এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। মানুষ তার জীবনকে অনেক আনন্দের সাথে উপভোগ করতে সৰম হচ্ছে ইন্টারনেটের কল্যাণেই। বাংলাদেশও এই প্রযুক্তিতে পিছিয়ে নেই। ইন্টারনেটের প্রতি মানুষের জনপ্রিয়তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ব্যবহারে শিৰা, অর্থনীতিসহ সকল ৰেত্রে আসছে আধুনিকতা। মোটকথা, ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে শিৰা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও যোগাযোগে সেতুবন্ধ সৃষ্টি করেছে।

২৭ শীতের সকাল

শীতের সকাল অন্যসব ঋতু থেকে আলাদা। কুয়াশার চাদরে মোড়া শীতের সকাল হাড় শীতল করা ঠান্ডা নিয়ে দেখা দেয়। এ সময় এক ফালি রোদ সকলের কাছে বহুল প্রতীৰিত হয়ে ওঠে। শীতের সকালে মানুষের মাঝে এক অজানা অলসতা ভর করে। লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকাতেই যেন তখন স্বর্গীয় সুখ অনুভূত হয়। কুয়াশার অন্ধকারে সূর্যদেবতার দেখা পাওয়া ভার। তাই সকালের উপস্থিতি টের পাওয়াও কষ্টকর। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা শীতকেও দূরে সরিয়ে দেয়। তাই আড়মোড়া ভেঙে উঠতেই হয় সকলকে। নিজেকে তৈরি করে নিতে হয় কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। শীতের সকালে প্রকৃতি ও প্রাণীর মধ্যে এক ভিন্ন আমেজ লৰ করা যায়। মানুষ, জীবজন্তু, পাখ-পাখালি শীতের বেলায় সূর্যের প্রত্যাশায় প্রহর গুনতে থাকে। শীতের সকালের প্রকৃত আনন্দ গ্রামীণ জীবনেই খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার গ্রামগুলোতে শীতের সকাল বেশ মনোরম হয়। গ্রামের মাঠে মাঠে শীতের প্রভাব বেশ চোখে পড়ে। শীতের কুয়াশা ভেদ করে নিজ নিজ গৃহপালিত প্রাণীদের নিয়ে বের হয় গ্রামের কর্মঠ মানুষেরা। সূর্যের দেখা পাওয়া মাত্রই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রোদ পোহাতে শুরু করে। গ্রামের মানুষেরা খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে শীতকালে উষ্ণতা খুঁজে ফিরে। শীতের সকালে গ্রামের সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত হলো পিঠা-পুলি খাওয়ার মুহূর্ত। গাছে গাছে খেজুরের রসের হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায়। এ রস দিয়ে নানা রকম পিঠা বানানো হয়। গ্রামীণ জীবনের আবেদন ইট-কাঠ-পাথরের শহুরে জীবনে পাওয়া যায় না। শহরে দেখা যায় বারান্দায় বসে রোদ পোহানোর দৃশ্য কিংবা গরম চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ার দৃশ্য। লেপ জড়ানো কর্মব্যস্ত মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের পরেও আরও একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়। কিন্তু জীবিকার টানে তকে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতেই হয়। সর্বোপরি সকলের কাছেই শীতের সকাল হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময়।

২৮ বিশ্বায়ন

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ৰেত্রে বিশ্বায়ন বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। বিশ্বায়ন মূলত পারস্পরিক ক্রিয়া ও আন্তঃসংযোগ সৃষ্টিকারী একটি পদ্ধতি। বিভিন্ন জাতির সরকার, প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মাঝে এটি সমন্বয় সাধন ও মিথস্ক্রিয়ার সূচনা করে। এই পদ্ধতির চালিকাশক্তি হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি। পরিবেশ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক পদ্ধতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রগতি এবং মানবিক ও সামাজিক অগ্রগতি; সবকিছুর ওপরই এর সুস্পষ্ট প্রভাব লৰ করা যায়। জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে একীভূতকরণের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার ৰেত্রে 'বিশ্বায়ন' শব্দটির অধিকতর

ব্যবহার হয়ে থাকে। অনেকে এ প্রক্রিয়াকে নতুন হিসেবে উলেরখ করে একে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন। প্রকৃতপৰে বহু পূর্ব থেকেই এ প্রক্রিয়াটি বিশ্ব জুড়ে চলমান রয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যেই এর উৎস নিহিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্ভবের ফলে এর ৰেত্র অধিকতর প্রসারিত হয়। গত পঞ্চাশ বছরে এ প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি গতি লাভ করেছে। বিশ্বায়নের ফলে বৈশ্বিক ব্যবসায়–বাণিজ্যসহ সকলৰেত্রে অভূতপূর্ব বিপরব সাধিত হয়েছে। এক দেশের পণ্য অন্য দেশে বসে সহজেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি। প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থার কারণে পণ্যের দামও থাকছে হাতের নাগালে। তথ্য প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের ফলে জ্ঞানার্জনের পথ হয়েছে প্রশস্ত। দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা ও অপশাসন দূর করে বিশ্বকে একটি শান্তিপূর্ণ আবাসস্থল করার ৰেত্রে বিশ্বায়ন একটি বড় সুযোগ। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের সব জাতি একযোগে এ সমস্যাগুলোর বিরবদ্ধে লড়াই করতে পারে। তবে ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি বিশ্বায়নের কিছু নেতিবাচক দিকও আমাদের চোখে পড়ে। তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকা দেশগুলো বিশ্বায়নকে নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এর ফলে হাতে গোনা কিছু পুঁজিপতিরা লাভবান হচ্ছে। গরিব হচ্ছে আরও গরিব। তবে বিশ্বায়নের ভালো দিকগুলোর উপযোগিতা অনস্বীকার্য। আমাদের উচিত এই ইতিবাচক দিকগুলোর প্রতি মনোযোগী হয়ে অর্থনৈতিকভাবে এবং মেধা ও মননে সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করা

পত্র রচনা

❑ চিঠি বা পত্র :

চিঠির আভিধানিক অর্থ হলো স্মারক বা চিহ্ন। তবে ব্যবহারিক অর্থে চিঠি বা পত্র লিখন বলতে বোঝায়, একের মনের ভাব বা বক্তব্যকে লিখিতভাবে অন্যের কাছে পৌঁছানোর বিশেষ পদ্ধতিকে। আরও সহজ করে বলা যায়, দূরের কিংবা কাছের কোনো আত্মীয়–স্বজন বা বন্ধু–বান্ধবের কাছে নিজের প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখে জানানোর পদ্ধতিকে চিঠি বা পত্র লিখন বলে।

❑ চিঠি বা পত্রের বিভিন্ন অংশ :

একটি চিঠি বা পত্রে সাধারণত ছয়টি অংশ থাকে। এগুলো হলো– ১. যেখান থেকে চিঠি লেখা হচ্ছে সে জায়গার নাম ও তারিখ; ২. সম্বোধন বা সম্ভাষণ; ৩. মূল বক্তব্য; ৪. বিদায় সম্ভাষণ; ৫. প্রেরকের (যে চিঠি পাঠাচ্ছে তার) স্বাৰর ও ৬. প্রাপকের (যে চিঠি পাবে তার) নাম ও ঠিকানা।

❑ চিঠি বা পত্রের প্রকারভেদ :

বিষয়বস্তু বিবেচনায় চিঠিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ব্যক্তিগত চিঠি। যেমন– মা-বাবা বা বন্ধু-বান্ধবকে ব্যক্তিগত বিষয় উলেরখ করে লেখা চিঠি।

২. সামাজিক চিঠি। যেমন– সামাজিক কোনো সমস্যা জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কিংবা প্রশাসনকে জানানোর জন্য লেখা চিঠি।

৩. ব্যবহারিক চিঠি। যেমন– ব্যবহারিক প্রয়োজনে লেখা আবেদনপত্র, ব্যবসাপত্র, নিমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি।

❑ চিঠি বা পত্র লেখার নিয়ম :

চিঠি বা পত্র লেখার সময় সাধারণ কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হয়। যেমন– ১. সুন্দর ও স্পষ্ট হস্তাৰরে লেখা; ২. সহজ, সরল ভাষায় লেখা; ৩. নির্ভুল বানানে লেখা; ৪. চলিত ভাষায় লেখা; ৫. বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করা; ৬. একই কথার পুনরাবৃত্তি না করা; ৭. পাত্রভেদে সম্মান ও স্নেহসূচক বাক্য ব্যবহার ইত্যাদি।

❑ ব্যক্তিগত পত্র

১. মনে করো, তুমি সম্প্রতি একটি নতুন উপন্যাস পড়েছো। নতুন এই বইটি পড়ার অভিজ্ঞতা জানিয়ে এবার তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখো। [ব. বো. ১৫]

উত্তর :

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
০৮.০৮.২০১৬ ইং

প্রিয় সুমন,

পত্রের শুরবতেই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি পরম করবণাময়ের কৃপায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছো। তোমার গত চিঠিতে তুমি আমার পড়া নতুন একটি বই সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলে। চিঠির উত্তর দিতে দেরি হলো বলে আমি দুঃখিত। আজ তোমাকে এ সম্পর্কে জানাতেই আমি চিঠি লিখছি।

সম্প্রতি আমি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বটি পড়েছি। উপন্যাসটির কাহিনি মূল চরিত্র শ্রীকান্তের আত্মকথনের ওপর রচিত। গ্রন্থটির প্রায় অর্ধেক অংশজুড়েই রয়েছে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ নামের দুজন কিশোরের বিচিত্র কাহিনি। তবে ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি আকস্মিকভাবে হারিয়ে যায় সপ্তম পরিচ্ছেদে। উপন্যাসের বাকি পাঁচটি পরিচ্ছেদে রয়েছে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর প্রণয়ের কাহিনি। উপন্যাসটিতে আরও কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রের সমাবেশ লৰ করা যায়। এসব চরিত্রের মধ্যে রয়েছে– অন্নদাদি, নতুনদা, নিরবদি, রতন প্রমুখ। সব মিলিয়ে উপন্যাসটিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে। প্রতিটি চরিত্র যেন বিশেষ কোনো বার্তা দিচ্ছে। তাই আমার কাছে বইটি পাঠের অভিজ্ঞতা চির অমলিন হয়ে থাকবে। সুযোগ করে তুমিও পড়ে নিয়ো। আশা করি তোমার ভালো লাগবে।

তোমার পরিবারের বড়দেরকে আমার সালাম এবং ছোটদের আদর দিয়ো। আমাদের জন্য দোয়া করো।

ইতি–
তোমার বন্ধু
শোভন।

		ডাকটিকিট
প্রেরক	প্রাপক	
শোভন	মো. সুমন	
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	সোনারতরী	
	৩৩, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।	

২. একুশের বইমেলা সম্পর্কে তোমার প্রবাসী বন্ধুকে চিঠি লেখো। অথবা, তোমার দেখা কোনো বইমেলার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে পত্র লেখো। [কু. বো. ০৯, ০৭]

সাভার, ঢাকা

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

সুপ্রিয় কথা,

অনেক দিন হয় তুমি কোনো চিঠি লেখোনি। অথচ তোমাকে আমার প্রায়ই মনে পড়ে।

এই তো সেদিন বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশের বইমেলায় গিয়েছিলাম। তুমি এই শহর ছেড়ে গিয়েছ প্রায় তিন বছর, অথচ এরই মধ্যে একুশের বইমেলার যে কতটা পরিবর্তন হয়েছে নিজের চোখে না দেখলে তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে রাস্তার ওপর আগে যে স্টলগুলোর বরাদ্দ দেওয়া হতো, সেগুলো এখন আর নেই। দোকান বসে শুধু একাডেমির ভেতরে আর একটি অংশ বসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। মেলার ভেতর কোনো রকম গান-বাজনা চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারটিও প্রশংসার দাবিদার। সর্বোপরি বইমেলাকে এখন আদর্শ বইমেলাই মনে হয়। এসব নিয়মনীতির জন্য ক্রেতা ও দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বইও বিক্রি হচ্ছে আগের তুলনায় বেশি। বাংলা একাডেমি আয়োজিত মাসব্যাপী এই বইমেলার প্রথম দিন থেকেই নেমেছিল জনতার ঢল। অগণিত মানুষের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে মেলার সুবিশাল অঙ্গন। পরিণত হয় লেখক-প্রকাশক-পাঠকের মিলনমেলায়। এবারের বইমেলার সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নতুন লেখকদের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা এবং বিক্রি ছিল বেশ আশাব্যঞ্জক।

বাংলা একাডেমি ফেব্রুয়ারির পহেলা থেকে একটানা একুশ দিন আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যে কয়দিন মেলায় গিয়েছি উপভোগ করেছি বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানমালা। বইও কিনেছি বেশ কিছু। শীঘ্রই তোমার জন্য কয়েকটি বই পাঠিয়ে দেবো। আজ বিদায় নিচ্ছি। তোমার খবরাখবর জানিয়ে চিঠি দিয়ো।

ইতি

তোমার বান্ধবী

সাথী

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৩. স্কুলের শেষ দিনে তোমার মনের অবস্থা বর্ণনা করে বন্ধুর কাছে চিঠি লেখো। [রা. বো. ১৪, চ. বো. ০৯, সি. বো. ১৩]

মোহাম্মদপুর, ঢাকা

২১শে ডিসেম্বর, ২০১৬

প্রিয় কবির,

একটু আগে স্কুল থেকে ফিরেছি। মনটা দারুণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ভাবলাম তোমার কাছে দু-কলম লিখতে পারলে আমার বেদনাহত হৃদয় কিছুটা হয়তো শান্ত হবে।

আজ আমার স্কুলজীবনের শেষ দিন। স্কুলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনার মাধ্যমে আমাদের বিদায় জানানো হয়। আমরা যারা পরীক্ষার্থী ছিলাম সবাই অন্য দিনের চেয়ে দু-ঘণ্টা আগেই স্কুলে এসে হাজির হয়েছি। কিন্তু আজ আর কারো মনে কোনো আনন্দ নেই, নেই কোনো চঞ্চলতা। সবার চোখেমুখে একটা বিষণ্নতার ছাপ। চারদিকে যেন বিদায়ের করুণ সুর বাজছে, সে ধ্বনি আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনি হয়ে আমার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল। মনে হলো সবচেয়ে বেশি কষ্ট বোধ হয় আমিই পাচ্ছি। আসলে এ-কষ্ট এবং দুঃখ কাউকে বোঝানো কিংবা বলা যায় না বলেই এর তীব্রতা এত বেশি।

যথাসময়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্কুলের নবম শ্রেণির কৃতী ছাত্রী দোলা আমাদের সবাইকে ফুলের-মালা পরিয়ে দিল। সূচনা হলো বিদায়ের! ওবায়দুল স্যার সূচনা-ভাষণ দিলেন। একে একে সিনিয়র শিক্ষকগণ বক্তব্য রেখে আমাদের প্রতি তাদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন।

স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে আমাকে যখন বক্তব্য দেওয়ার জন্য বলা হলো, তখন আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না কীভাবে কথা বলব। দু-একটি কথা বলার পর আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। দু-চোখের জল বাধা মানল না। পনেরো সেকেন্ড পর অতি কষ্টে উচ্চারণ করলাম আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করতে হলো। সভাপতির ভাষণে বক্তব্য রাখলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রধান শিক্ষক। তিনি আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে চলার পথের পাথেয় সম্পর্কে নানা উপদেশ দিলেন। সবশেষে আমাদের সবাইকে উপহার হিসেবে একটি করে বই দেওয়া হলো। এরপর সংগীতানুষ্ঠান। বিদায়ের গানে বেদনার সুর বেজে উঠতেই আমাদের স্কুলজীবনের শেষ দিনের মুহূর্তগুলো হৃদয়পটে ছবির মতো আটকে গেল। এ-স্মৃতি কখনোই ভোলার নয়।

সত্যিই, আজকের দিনে তোমাকে পাশে পেলে ভালো হতো। আজ এখানেই শেষ করছি। তাড়াতাড়ি চিঠি দিও। চাচা-চাচিকে সালাম জানিও।

ইতি

তোমার বন্ধু

টুটুল

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৪. এসএসসি পরীক্ষা পাসের পর তুমি বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে চাও। এ ব্যাপারে যুক্তি দেখিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লেখো।

১৮ই জুন ২০১৬

প্রিয় পবন

কেমন আছো? পড়ালেখার কী অবস্থা? অনেক দিন তোমার চিঠি পাই না। আজকে আমি তোমাকে জানাব পরীক্ষার পর কী করব সেই পরিকল্পনার কথা।

এসএসসি ভালো ফলের জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করছি। পরীক্ষার পর আমি বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি হয়তো ভাবছ সাধারণ পড়াশোনা ছেড়ে কেন বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হলাম। তোমাকে তার কারণটা বুঝিয়ে বলি।

তুমি তো আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা জানো। বাবাকে হারিয়েছি সেই ছেলেবেলায়। আমাদের দুই ভাইকে মানুষ করার জন্য মা অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। অনেক ত্যাগ তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁর সামান্য বেতনের চাকরি দিয়ে আমাদের সংসার খুব কষ্টে চলছে। আমি বড় বলে পরিবারের জন্য আমার একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের দেশে সাধারণ পড়াশোনা খুবই ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। অন্যদিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হলো হাতে-কলমে শিক্ষা। এ শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের অভাব ও সময়ের অপচয় হয় না। তাছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণে সেশনজটের কোনো ঝামেলা নেই। এ শিক্ষা শেষে সরাসরি কাজে ঢোকা সম্ভব। তাই মন হতাশায় জর্জরিত হয় না। এর ফলে আর্থিক সমস্যার সমাধান সহজতর হয়।

আশা করি বুঝতে পেরেছ কেন আমি পরীক্ষার পর বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমার পরিকল্পনা জানিয়ে চিঠি লিখো। ভালো থেকো।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

সুব্রত

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৫. তোমার গ্রামকে নিরৰরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে তুমি যেমন ভূমিকা পালন করবে তার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো। [সি. বো. ১৫]

রামপুরা, ঢাকা–১২১৯
৪ঠা জানুয়ারি, ২০১৬

প্রিয় কমল

শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি ভালোই আছ। পথশিশুদের লেখাপড়া নিয়ে কাজ করছো শুনে খুব ভালো লাগল। তোমার মতোই আমিও মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। সে সম্পর্কে জানাব বলেই আজ লিখছি।

নিরৰরতার কুফল সম্পর্কে তোমার নিশ্চয়ই ভালো ধারণা আছে। এই অভিশাপ থেকে আমার প্রিয় গ্রামকে মুক্ত করার জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছি। আশা করি আমার কাজটি সম্পর্কে জানলে তুমি খুশি হবে এবং নিজেও অনুপ্রাণিত হবে।

আমার প্রিয় গ্রামটি নিরৰরতার অভিশাপে অন্ধকারাচ্ছন্ন– এ বিষয়টি সত্যিই খুব হতাশাজনক। তাই আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যেভাবেই হোক গ্রামকে নিরৰরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করব। এজন্য গ্রামের শিৰিত ও সমাজসেবী মানুষদের সাথে কথা বলি। তাঁরা আমাদের উদ্দেশ্যের কথা শুনে খুব খুশি হলেন এবং নানা রকম পরামর্শ দিলেন। আমরা আমাদের গ্রামের স্কুল মাঠের একটি পাশে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছি। গ্রামের নিরৰর পুরৰষ, ছেলে, বউ–ঝিরা পড়ালেখা করতে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নৈশ বিদ্যালয়ে আসতে শুরৰ করেন। আমরা বন্ধুরা প্রত্যেকেই নিজেদের অবস্থান থেকে নিরৰরতামুক্ত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছি। লেখাপড়ার প্রতি মানুষের এমন ইচ্ছাশক্তির উদাহরণ আমাদের দারৰণভাবে অনুপ্রাণিত করছে। আমাদের এখানে এসে বেড়িয়ে যাও। কোনো পরামর্শ থাকলে জানিয়ো। আজ আর নয়। উত্তর দিয়ো।

ইতি
তোমার বন্ধু
ইউসুফ

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৬. নিয়মিত লেখাপড়া করার উপদেশ দিয়ে/ভবিষ্যতে পরীৰায় ভালো ফলাফল করার উৎসাহ দিয়ে তোমার ছোট ভাই–বোনের কাছে পত্র লেখো।

আজিমপুর, ঢাকা
১৫ই মে, ২০১৬

স্নেহের আমান,

আমার ভালোবাসা রইল। গতদিন মায়ের লেখা একটা চিঠি পেলাম। মা জানিয়েছেন পড়াশোনায় তোমার মন নেই। তোমার সম্পর্কে এমনটা শুনব আশা করিনি। তোমাকে ঘিরে আমাদের সবার অনেক আশা–ভরসা।

লেখাপড়া সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হলো এটি কেউ কাউকে দান করতে পারে না। নিজের আগ্রহেই একে অর্জন করে নিতে হয়। মুখস্থ বিদ্যার জোরে পরীৰায় কেবল পাস করা যায়। কিন্তু তাতে প্রকৃত জ্ঞান তোমার ভেতর সঞ্চিত হবে না। সুতরাং যেটুকু পড়বে মন দিয়ে পড়বে। সারাবেলা তোমাকে বই নিয়ে বসে থাকার পরামর্শ আমি দিচ্ছি না। কেননা মন থেকে পড়তে না বসলে সে পড়াশোনা দিয়ে কোনো লাভ নেই। লেখাপড়ার বিষয়টাকে তুমি আনন্দের সাথে নাও–এই আমার কামনা। তোমাকে আমি নানা সময় ছোটদের উপযোগী কিছু বই পাঠাই। সে বইগুলো যেমন মজার, তেমনি শিৰণীয়। অবসরে এই বইগুলো পড়ে দেখো। দেখবে পাঠ্য বইয়ের প্রতিও তোমার আগ্রহ তৈরি হবে। বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে পড়াশোনা করলেও ভালো ফল পাবে। তবে এৰেত্রে সঙ্গী নির্বাচনে সতর্ক থাকা চাই।

তোমার জেএসসি পরীৰার তো আর মাত্র তিন মাস বাকি। তাই পড়া জমিয়ে না রেখে নিয়মিত পড়াশোনা করো। অনেক শিৰার্থীই সময়ের পড়া সময়ে না পড়ে তা জমিয়ে রাখে। পরে পরীৰা চলে এলে সিলেবাস সম্পূর্ণ শেষ করতে না পেরে নকলের মতো জঘন্য পথ বেছে নেয়। নকল করে অনেক সময় পরীৰা পাসের সার্টিফিকেট পাওয়া গেলেও, ভবিষ্যৎ কর্মৰেত্রে তা কোনো কাজে আসে না। তোমার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, এ বিষয়ে তুমি বেশ সচেতন।

সবশেষে বলতে চাই, পরিশ্রম ছাড়া জীবনে উন্নতি করার বিকল্প কোনো উপায় নেই। যে ব্যক্তি অধ্যবসায়ী নয়, জীবনের কোনো কাজেই সে সফলতা লাভ করতে পারে না। তাই আমাদের সকলের উচিত অধ্যবসায়ের মতো এই মহৎ গুণটিকে আয়ত্ত করা। এর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আশা করি এখন থেকে তুমি পড়াশোনার প্রতি যত্নবান হবে। আব্বু–আম্মুর প্রতি খেয়াল রেখো। তোমার পরীৰার আগেই বাড়ি আসব। আজ এখানেই শেষ করছি।

ইতি
তোমার বড় বোন
কবিতা

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৭. পরীৰায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো। [কু. বো. ১৪, ঢা. বো. ০৯, দি. বো. ১৪]

বগুড়া সদর
২৫শে মে, ২০১৬

প্রিয় কাঞ্চন,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ো। এসএসসি পরীৰায় তোমায় গোল্ডেন এ পরাস পাওয়ার খবর শুনে আমি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। এমন গৌরবোজ্জ্বল ফল অর্জন করায় তোমাকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই।

তোমার মতো ফল আমি করতে পারিনি। তবে যেটুকু হয়েছে তাতেই আমি খুশি। আমি পেয়েছি ৪.৮৮। তোমার ফলাফলের কথা শুনে বাবা–মাও খুব খুশি হয়েছেন। আমার মনে হয় তোমার এই সাফল্য তোমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সামনের দিনে অপেৰা করছে কঠিনতর চ্যালেঞ্জ। সে চ্যালেঞ্জে জয়ী হওয়ার জন্য তোমাকে পরিশ্রমের ধারাটি অব্যাহত রাখতে হবে। দৃঢ়সংকল্প ও পরিশ্রমের জোরেই যে জীবনে সফলতা আসে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তো তুমি নিজেই। তুমি তোমার লৰ্যকে সামনে রেখে নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে গেছ। আমি আশা করেছিলাম যে, পরীৰায় তুমি অবশ্যই দারৰণ ফলাফল করবে। আমার কথা অৰরে অৰরে ফলেছে। তুমি তোমার পরিশ্রমের পুরস্কার পেয়েছ।

তোমার বাবা–মাকে আমার সালাম জানাবে। তোমার ভবিষ্যৎ জীবন আরও সুন্দর ও সফল হোক। এই কামনা করে শেষ করছি। ভালো থেকো।

ইতি

তোমার বন্ধু

সাগর

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৮. তোমার দেখা একটি বিজ্ঞান মেলার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে পত্র লেখো। [রা. বো. ১২]

জামালপুর

প্রিয় অসীম

কেমন আছ বন্ধু? আমার খবর ভালো। তবে গত সপ্তাহটি পার করেছি ভীষণ ব্যস্ততায়। আমাদের স্কুলে আয়োজন করা হয়েছিল সপ্তাহব্যাপী একটি বিজ্ঞান মেলার। তার খবর জানাতেই তোমাকে আজ লিখছি।

মেলায় বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজেদের তৈরি বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রজেক্ট প্রদর্শন করে। মেলা উপলৰে পুরো স্কুল ভবনকে সাজানো হয়। প্রতিদিন বিকাল ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনী খোলা রাখা হয়। আমরা বিভিন্ন স্টলে নিজ নিজ প্রদর্শনী বস্তু নিয়ে প্রদর্শন শুরব করি। আমি আমার অটোমেটিক লাইট ডিটেক্টর যন্ত্রটি প্রদর্শন করি এবং বিচারকগণের রায়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি।

উক্ত প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক। তিনি সবগুলো স্টল পরিদর্শন করেন এবং আমাদের কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমাদের প্রধান শিৰক এতে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। প্রদর্শনী সফল হওয়ার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি ঘোষণা দেন যে, এখন থেকে নিয়মিতভাবে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। এ বছর দশটি স্কুল এতে অংশ নেয়। ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করি।

আজ এ পর্যন্তই। তোমার আব্বা–আম্মাকে আমার সালাম দেবে। আর ছোট ভাইবোনদের দেবে অনেক অনেক আদর। তোমার গাছগুলোর কী খবর? চিঠিতে জানিয়ো।

ইতি

তোমার বন্ধু

পুনম

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৯. তোমাদের বিদ্যালয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিবরণ দিয়ে বন্ধুর কাছে পত্র লেখো।

পরশুরাম, ফেনী

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

প্রিয় মারুফ,

তোমার চিঠি পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছি। তোমার ভ্রমণের বৃত্তান্ত পড়ে খুব ভালো লাগল। গত সপ্তাহে আমাদের স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই কথা জানাতেই এই চিঠি।

প্রায় এক মাস আগে থেকে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি শুরব হয়। প্রতিটি ক্লাস থেকে বিভিন্ন ইভেন্টের জন্য প্রতিযোগী বাছাই করা হয়। এ কটা দিন সব ছাত্রছাত্রীই প্রচণ্ড উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে। সবার এক চিন্তা– বাছাইপর্বের চেয়ে ভালো করতে হবে। যা হোক, অবশেষে এলো সেই প্রতীৰিত দিন। সকাল আটটায় প্রতিযোগিতা শুরব হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। এরপর প্রজ্জ্বলিত হয় অলিম্পিক মশাল। মাননীয় প্রধান অতিথি তাঁর সংৰিপ্ত ভাষণ শেষে শান্তির প্রতীক শ্বেত কপোত ও রঙবেরঙের বেলুন মুক্তাকাশে উড়িয়ে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ৮টা ৩৫ মিনিটে শুরব হয় ক্রীড়া প্রতিযোগীদের মার্চপাস্ট। সকাল ৯টায় শুরব হয় মূল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন আমাদের ক্রীড়াবিষয়ক শিৰক। তাঁকে সহযোগিতা করে রোভার স্কাউট ও বিএনসিসির সদস্যরা। মোট ১৫টি ইভেন্টে ১২০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। এদের মধ্যে ছাত্র ৭২ জন এবং ছাত্রী ৪৮ জন। দৌড়, হাইজাম্প, লংজাম্প, গোলক নিৰেপ, চাকতি নিৰেপ, বর্শা নিৰেপসহ প্রায় সবগুলো ইভেন্টেই দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

সবচেয়ে মজার ইভেন্টটি ছিল আমন্ত্রিত অতিথি ও স্কুলের শিৰকদের মধ্যে রশি টানাটানি খেলা। খুব হৈ–হুল্লোড়ের মাঝে অতিথিরাই জিতে যান। আমন্ত্রিত মহিলাদের জন্য ছিল মিউজিক্যাল চেয়ার। এটাতেও খুব মজা হয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরেকটি ব্যতিক্রমী ইভেন্ট ছিল 'যেমন খুশি তেমন সাজো'। বছরের এই একটি দিনের সুযোগ অনেকেই কাজে লাগিয়ে ইচ্ছেমতো সেজেছিল। বিকেল ৫টায় পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার। সবাই পুরস্কার পায়নি, কিন্তু কারো মুখেই পরাজিত হওয়ার কোনো গ্লানি ছিল না– এটিই হলো খেলাধুলার সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ও মহৎ শিৰা। আমি ২০০ মিটার দৌড়ে অংশ নিয়ে ২য় স্থান অধিকার করেছি।

আজ এখানেই ইতি টানছি। তোমার কাছে নতুন কোনো বই থাকলে জানিয়ো। ভালো থেকো।

ইতি

তোমারই

আফসান

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১০. সংবাদপত্র পাঠের গুরবত্ব ব্যাখ্যা করে তোমার বন্ধুর কাছে একটি পত্র লেখো। [চ. বো. ১১]

অথবা, সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখ। [ব. বো. ১১]

২০.০৫.২০১৬

ঢাকা।

প্রিয় আমান,

আশা করি ভালো আছো। আমার খবর ভালো।

আমি জানি, তুমি প্রচুর বই পড়ো। শুধু বই পড়লেই হবে না বিশ্বের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিও জানতে হবে। কেবল পাঠ্যবই পড়লেই জ্ঞান অর্জন করা যায় না। একজন মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে হলে তাকে সব বিষয়ে জ্ঞান রাখতে হয়। আর সেটি অর্জন করার অন্যতম উপায় সংবাদপত্র পাঠ করা। সংবাদপত্র পাঠ করলে তুমি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, স্বদেশ–বিদেশসহ সব রকম তথ্য জানতে পারবে। দেখবে সে এক মজার তথ্য–জগৎ। নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ তোমার মেধাকে শানিত করবে। তুমি একজন প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। এজন্য তুমি নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করো। এতে তোমার জানার পরিধি যেমন বাড়বে, তেমনি বিভিন্ন বিষয়ে দৰতা বৃদ্ধি পাবে।

আসলে সংবাদপত্র পাঠ আমাদের প্রত্যেকটি সচেতন মানুষের জন্যই অতীব প্রয়োজন। আশা করি এ প্রয়োজনীয়তা তুমিও উপলব্ধি করতে পেরেছ।

আজ এখানেই শেষ করলাম। ভালো থেকো।

ইতি

তোমার বন্ধু

কামাল

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১১. নববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য কেমন আয়োজন চলছে তা জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো।

২৫.০২.২০১৬

আলরারদর্গা, কুষ্টিয়া

প্রিয় জুয়েল,

আশা করি ভালো আছো। শুনে খুশি হবে আসছে পহেলা বৈশাখে আমাদের স্কুল থেকে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি শুরব হয়েছে। আমাদের অনুষ্ঠানমালার মধ্যে থাকবে সপ্তাহব্যাপী বৈশাখী মেলার আয়োজন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, সংগীতানুষ্ঠান ইত্যাদি। আবৃত্তি অনুষ্ঠানে আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করব। তাছাড়া সংগীত সন্ধ্যায় আমরা সমবেত কণ্ঠে সূচনা সংগীত হিসেবে পরিবেশন করব "এসো হে বৈশাখ, এসো এসো" গানটি। আমাদের অনুষ্ঠানগুলোতে প্রধান অতিথি থাকবেন মাননীয় জেলা প্রশাসক ও বিশেষ অতিথি থাকবেন আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিৰক মহোদয়।

অনুষ্ঠানের শেষ দিন পুরস্কার বিতরণীর ব্যবস্থা রয়েছে। নববর্ষ উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে আমাদের বিদ্যালয় ভবন ও প্রাঙ্গণ নতুন সাজে সাজানো হবে। ঐদিন আমরা সবই নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়ে একত্রিত হব। ছোট–বড় সবাই মিলে মজা করব এবং পান্তা ভাত ও ভাজা ইলিশের আয়োজন করব।

এই আয়োজনে তোমারও নিমন্ত্রণ রইল। আজ এখানেই শেষ করছি। তাড়াতাড়ি চিঠি পাঠিয়ো।

ইতি

তোমার বন্ধু

রানা

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১২. মনে করো, তোমার নাম নিলয়। তোমার বন্ধুর নাম সাগর। সে খুলনায় থাকে। বৃৰরোপণের প্রয়োজনীয়তা উলেরখ করে তার কাছে একটি পত্র লেখ। [কু. বো. ১২, য. বো. ১৪]

১৩.০৭.২০১৬

পলরবী, ঢাকা

প্রিয় সাগর,

কেমন আছ? অনেক দিন হলো তোমার কোনো খবর পাই না। গতকাল আমাদের স্কুলে 'বৃৰরোপণের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে একটি সেমিনার হয়ে গেল। সেই সেমিনারেই বৃৰরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক কথা শুনলাম। তোমাকে সে সম্পর্কে জানাতেই এ চিঠি লিখতে বসেছি।

তুমি তো জানো, গাছ আমাদের পরম বন্ধু। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ করি, কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি। আর গাছ আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে নেয়, পরিবেশের ভারসাম্য রৰা করে। কিন্তু মানুষ তার প্রয়োজনে প্রচুর গাছ কাটছে। বন উজাড় হচ্ছে। তাতে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভীষণ ৰতি হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রৰার জন্য একটি দেশের মূল ভূখণ্ডের কমপৰে পঁচিশ ভাগ বন থাকা দরকার। আমাদের দেশে তা নেই। যেটুকু আছে তা-ও নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। সভ্যতা ও উন্নয়নের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে কলকারখানা। রাস্তায় যানবাহনের চলাচল বাড়ছে। কলকারখানা ও গাড়ির ধোঁয়ায় বাতাসে বাড়ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ। কমছে বাতাসের ওজোন স্তর। যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে গ্রিনহাউস ইফেক্ট। ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। দেখা দিচ্ছে নানা রোগ-ব্যাধি। এসবই ঘটছে বাতাসে অক্সিজেনের অভাবের কারণে। তাই বেশি বেশি গাছ লাগালে বাতাসে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ হবে। প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরে আসবে। পরিবেশ দূষণমুক্ত হবে। তাছাড়া আমাদের জ্বালানির চাহিদার বেশির ভাগ পূরণ হয় বৃৰের মাধ্যমে। কাঠ থেকে আমরা বাড়িঘর এবং আমাদের প্রয়োজনীয় আসবাব প্রস্তুত করে থাকি। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখনই আমাদের অধিক হারে বৃৰরোপণ করা প্রয়োজন। বাড়ির চারপাশে, রাস্তার দুপাশে, পতিত জমিতে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে। বৃৰরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে আরো সচেতন করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, বৃৰ বাঁচলেই আমরা বাঁচব।

আজ এই পর্যন্তই। তোমার মা-বাবাকে আমার সালাম জানিয়ো। চিঠি দিয়ো।

ইতি–

তোমার বন্ধু

নিলয়

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১৩. কম্পিউটার শিৰার গুরুত্ব বর্ণনা করে তোমার বন্ধু অভ্রকে একটি চিঠি লেখো। [চ. বো. ১৩, ব. বো. ১২]

১৭.০৭.২০১৬

শাসনগাছা, কুমিলরা।

প্রিয় অভ্র,

আমার শুভেচ্ছা নিয়ো। অনেক দিন পর তোমার চিঠি পেলাম। তুমি ক্লাসে প্রথম হয়েছ জেনে খুব আনন্দিত হয়েছি। আমি আরো খুশি হয়েছি তুমি ক্লাসের পড়াশোনার বাইরে কম্পিউটার শিখছ বলে।

বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। আর প্রযুক্তির এ যুগে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে কম্পিউটার। কম্পিউটার ছাড়া আধুনিক জীবন-যাপন কল্পনা করা যায় না। এর ব্যবহারে সব ধরনের কাজ তুলনামূলক কম সময়ে ও নির্ভুলভাবে করা সম্ভব। শিৰা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, ব্যবসায়–বাণিজ্য, অফিস-আদালত, চিকিৎসা, বিনোদন সব ৰেত্রেই কম্পিউটারের ব্যবহার আজ অপরিহার্য। তাই কর্মৰেত্রেও এখন কম্পিউটার জানা লোকদের অগ্রাধিকার। কম্পিউটার–অভিজ্ঞ লোক কখনো বেকার বসে থাকে না। তাই বর্তমান শিৰাব্যবস্থায় কম্পিউটার শিৰার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমাদের প্রত্যেকের উচিত অন্যান্য বিষয়ের সাথে কম্পিউটার শিৰার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। বর্তমানে পাঠ্যবইয়ের পড়াশোনা ভালোভাবে আত্মস্থ করার কাজে অগ্রসর শিৰার্থীরা কম্পিউটারের সাহায্য নিচ্ছে। তাছাড়া পাঠ্যবইয়ের বাইরেও নানা সৃজনশীল কাজেও এটি ব্যবহার করতে পারছে। তুমি ক্লাসের পড়াশোনার পাশাপাশি কম্পিউটার ভালোভাবে আয়ত্ত করবে, আমার এই শুভকামনা রইল।

আজ আর নয়। মা ও বাবাকে আমার সালাম দিয়ো। তুমি ভালো থেকো।

ইতি–

তোমার বন্ধু

রাজন

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১৪. মনে করো, তুমি কাজল। তোমার এসএসসি পরীৰার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পরীৰার ফলাফল সম্পর্কে জানিয়ে বাবার কাছে একটি পত্র লেখো।

এপ্রিল ২৫, ২০১৬

বাজিতপুর

শ্রদ্ধেয় বাবা,

সালাম নিন। আশা করি ভালো আছেন। গতকাল আপনার চিঠি পেলাম। আপনার আসতে দেরি হবে জেনে মনটা খুব খারাপ হলো।

আজ আমার এসএসসি পরীৰার ফল প্রকাশিত হয়েছে। আমার ফল জেনে আপনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন। আমি গোল্ডেন A^+ পেয়েছি। দোয়া করবেন, আমি যেন ভবিষ্যতে আপনার মুখ উজ্জ্বল করতে পারি।

আপনাকে অনেক দিন দেখিনি। আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। ছুটি নিয়ে দুটো দিনের জন্য হলেও আমাদের সঙ্গে দেখা করে যান। আমরা আপনার অপেৰায় রইলাম।

বাড়ির সবাই ভালো আছে। আপনি শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। ভালো থাকবেন।

ইতি

তোমার শুভার্থী

কাজল

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১৫. মনে করো, তোমার নাম খসরব। তোমার বড় বোনের বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছে। তোমার প্রিয় বন্ধু হামিদকে এ উপলৰে একটি চিঠি লেখো।

২৫শে মার্চ, ২০১৬

পূর্ব ঘোপাল, ফেনী

প্রিয় হামিদ,

শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি ভালো আছ। তোমাকে আজ একটা সুখবর দেওয়ার জন্য লিখছি।

আগামী ১০ই এপ্রিল আমার বড় আপার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। ৯ তারিখ গায়েহলুদ আর ১২ তারিখ বৌভাত অনুষ্ঠিত হবে। আপার বিয়ের সব আয়োজনের দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর। তুমি অবশ্যই আসবে। মা, আপা সবাই তোমাকে আসতে বলেছেন। তুমি কিন্তু ৭ তারিখের মধ্যেই চলে আসবে, কেমন? অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের সব বন্ধুই আসছে। খুব মজা হবে।

আজকের মতো বিদায়। সাবধানে এসো।

ইতি

তোমার বন্ধু

খসরব

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১৬. মনে করো, তুমি ফরহাদ। গ্রীষ্মের ছুটি কীভাবে কাটাবে তা জানিয়ে তোমার বন্ধু শফিককে একটি চিঠি লেখো।

১০/০৪/২০১৬

বয়রা, খুলনা

প্রিয় শফিক,

ভালোবাসা নিয়ো। তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। তোমার সাথে কতদিন দেখা হয় না।

যা হোক, তোমাকে একটা খুশির খবর দিই। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি শুরব হবে। ঠিক করেছি আমি বাংলাদেশের বিখ্যাত কিছু ঐতিহাসিক স্থাপনায় বেড়াতে যাব। তুমি তো জানোই ইতিহাস আর ভূগোল সম্পর্কে আমার অনেক আগ্রহ। এ কারণেই ভাবছি মা-বাবার সাথে এই ছুটিতে সোনারগাঁ ও পাহাড়পুর যাব। এ দুটিই আমাদের দেশের অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান। বইয়ে এ দুটো জায়গার কথা অনেক পড়েছি। নিজের চোখে দেখতে পেলে সেই জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করবে। স্থানগুলোতে গেলে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে। তুমিও চলোনা আমাদের সাথে। খুব মজা হবে।

ভালো থেকো। তোমার মতামত জানিয়ো।

ইতি

তোমার শুভার্থী

ফরহাদ

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১৭. মনে করো, তোমার নাম অহনা/অহন। তোমার কলকাতা প্রবাসী এক বন্ধুর নাম বাদল/বৃষ্টি। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তুমি যা জানো তা তোমার বন্ধুকে জানিয়ে একটি চিঠি লেখো। ধরো, তোমার বন্ধুকে

লেখার ঠিকানা– ৩৬, সল্ট লেক, কলকাতা, ভারত।

২২শে ফেব্রবয়ারি, ২০১৬

মহিষাকান্দি, নরসিংদী।

প্রিয় বাদল,

কেমন আছ? আমি ভালোই আছি। কাল ছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাঙালির জীবনে এ দিনটি অত্যন্ত গৌরবমণ্ডিত ও তাৎপর্যপূর্ণ। আজ তোমাকে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানিয়ে লিখছি।

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা দেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে বাংলার ছাত্রসমাজ। ২১শে ফেব্রবয়ারিকে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে ২০শে ফেব্রবয়ারি সন্ধ্যা থেকে ঢাকায় ১৪৪ দ্বারা জারি করা হয়। ২১শে ফেব্রবয়ারির দিন সেরাগানে সেরাগানে রাজপথ উত্তাল হয়ে ওঠে। সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারার পরোয়া না করেই এগিয়ে যায় ছাত্র-জনতা। পুলিশের গুলিতে রফিক, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে শহিদ হন। এ ঘটনা সারা দেশের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। রাস্তায় নেমে আসে সর্বস্তরের লাখো জনতা। অবশেষে ভাষাশহিদদের জীবনের বিনিময়ে আমরা পাই মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার। তাই একুশ আমাদের অহংকার। আমাদের দৃপ্ত চেতনার অগ্নিমশাল।

তোমার বাবা-মাকে আমার সালাম জানিয়ো। আজ বিদায় নিচ্ছি।

ইতি

তোমার বন্ধু

অহনা

BY AIR MAIL	STAMP
From Badal Mohishalkandi, Narsinghdi, BANGLADESH.	To, Ahona 36, Salt Lake, Calcutta, INDIA.

১৮. মনে করো, তোমার নাম পলরব/পলি। জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়ে তোমার আমেরিকা প্রবাসী বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো। ধরো, তোমার বন্ধুর নাম ড্যানিয়েল/ডোরি। তার ঠিকানা– ২৪ ডাউনিং স্ট্রিট, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

প্রিয় ড্যানিয়েল,

কেমন আছ বন্ধু? গত চিঠিতে তুমি জন্মভূমি সম্পর্কে আমার অনুভূতির কথা জানতে চেয়েছ। আজ সে কথা জানিয়ে তোমাকে লিখছি।

পৃথিবীর সব মানুষের মনেই জন্মভূমির জন্য আলাদা একটা টান থাকে। আমার দেশের প্রতিও আমি গভীর মমতা অনুভব করি। আমাদের দেশটা অনেক সুন্দর। মন ভোলানো এর প্রকৃতি। সারা দেশে সবুজের ছড়াছড়ি। নদী, পাহাড়, সমুদ্র সবই আছে এদেশে। আর আছে নানা ধর্ম, পেশা ও সংস্কৃতির মানুষ। সকলেই এদেশে মিলেমিশে বসবাস করে। এই সবকিছুই আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ত্রিশ লৰ মানুষ সে যুদ্ধে শহিদ হয়েছে। এদেশকে নিয়ে তাই আমাদের অহংকারের শেষ নেই। বাংলাদেশে জন্ম নিতে পেরে আমি গর্বিত। দেশকে আমি আমার মায়ের মতোই ভালোবাসি।

আজ আর নয়। তোমার দেশের কথা জানিয়ে আমাকে চিঠি দিয়ো।

ইতি
তোমার বন্ধু
পলরব

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১৯. মনে করো, তোমার নাম সাকিব/সালমা। তোমার বন্ধুর নাম অয়ন/আয়না। সম্প্রতি তুমি একটি স্থান থেকে বেড়িয়ে এসেছ। সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখো। [চ. বো. ১৫, কু. বো. ১১, রা. বো. ১৩]

১৭/০২/২০১৬
মালিবাগ, ঢাকা।

প্রিয় অয়ন,

শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা করি ভালো আছ। ছুটি কেমন কাটল? আমার কিন্তু দারবণ কেটেছে। কারণটা বলছি, শোনো।

গত সপ্তাহে বাবা-মায়ের সাথে প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিন থেকে ঘুরে এসেছি। দারবন মজা হয়েছে। ঢাকা থেকে ট্রেনে চড়ে প্রথমে গিয়েছি চট্টগ্রাম। ট্রেনে চেপে এটাই আমার প্রথম ভ্রমণ। কী যে ভালো লেগেছে বলে বোঝানো যাবে না। চট্টগ্রাম থেকে বাসে করে টেকনাফ। তারপর জাহাজে চড়ে সেন্টমার্টিন পৌঁছেছি। সমুদ্রের বুকে জাহাজে চড়ার অভিজ্ঞতাটা সত্যিই অসাধারণ। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে থাকা পাহাড়গুলোর সৌন্দর্য যে কাউকে মুগ্ধ করবে। আর সেন্টমার্টিনের সৌন্দর্য তো বলে বোঝানোর মতো নয়। সাগরের স্বচ্ছ নীল পানি, রাতের আকাশে হাজার তারার মেলা, সৈকতে ঘুরে বেড়ানো নানা রঙের কাঁকড়া, সূর্যোদয়ের দৃশ্য ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। অনেক রকমের সামুদ্রিক মাছের স্বাদ নিয়েছি। আর খেয়েছি সেন্টমার্টিনের সুমিষ্ট ডাবের পানি। সেন্টমার্টিনের অদূরেই আছে ছেঁড়াদ্বীপ। ট্রলারে চড়ে সেখানেও গিয়েছি। উত্তাল সমুদ্রের মাঝে ট্রলারটি বিপজ্জনকভাবে দুলছিল। ৰণে ৰণে তা মনের ভেতর উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ সৃষ্টি করছিল। সেন্টমার্টিনে আমরা দুই দিন ছিলাম। ফেরার পথে টেকনাফ এসে বাসে চড়ে সরাসরি ঢাকায় ফিরেছি। সব মিলিয়ে সেন্টমার্টিন ভ্রমণের স্মৃতি ভোলার মতো নয়।

আজ বিদায় নিচ্ছি। তোমার ময়না পাখিটার কী খবর? ভালো থেকো।

ইতি
তোমার বন্ধু
সাকিব

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

২০. মনে করো, তোমার নাম হাসনা/সেলিম। তোমার ছোট ভাইয়ের নাম আকাশ। স্বাধীনতা দিবস কীভাবে উদ্‌যাপন করেছ সে সম্পর্কে জানিয়ে তাকে একটি পত্র লেখো।

২৯/০৩/২০১৬
সাভার, ঢাকা।

আদরের আকাশ,

কেমন আছ? বাড়ির সবাই ভালো তো? তোমার বিড়ালটা কত বড় হলো?

২৬ তারিখ ছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। নানা রকম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের সবাই মিলে এ দিবসটি উদ্‌যাপন করেছি। দিনটি উপলৰে আমরা পুরো স্কুল কাগজের পতাকা দিয়ে সাজিয়েছিলাম। সবাই মিলে স্কুলের বিভিন্ন দেয়ালে মুক্তিযুদ্ধের বেশ কয়েকটি ছবি এঁকেছি। সব মিলিয়ে পুরো স্কুলটি দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। সকালবেলা বিদ্যালয়ের পৰ থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে। সেখানে আমরা ফুল দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। স্মৃতিসৌধের আশপাশের স্থানগুলো ঘুরে দেখি। দুপুর থেকে স্কুলে শুরব হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি, নাচ, গান, নাটিকা ইত্যাদি উপস্থাপন করে। আমিও একটি কবিতা আবৃত্তি করি। বিকেলে অডিটোরিয়ামের বড় পর্দায় দেখানো হয় 'আমার বন্ধু রাশেদ' চলচ্চিত্রটি। দেখে খুব ভালো লাগল। সব মিলিয়ে খুব আনন্দময় একটি দিন কেটেছে।

আজ আর নয়, গরমের ছুটিতে বাড়ি আসছি। মন দিয়ে লেখাপড়া করো। আম্মার কথা শুনো।

ইতি
তোমার বড় বোন
হাসনা

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

২১। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বন্ধুকে সমবেদনা জানিয়ে একটি চিঠি লেখো।

০৫/০২/২০১৬
হালিশহর, চট্টগ্রাম

প্রিয় রাজীব,

সড়ক দুর্ঘটনায় তুমি আহত হয়েছ শুনে ভীষণ চিন্তিত আছি। আজ সকালে তুষার ফোন করে জানাল যে, তুমি রিক্‌শা উল্টে পড়ে গিয়েছ। ডান হাত আর ডান পায়ে মারাত্মক জখম হয়েছ। শুনে খুব কষ্ট পেলাম। আশা করি, জখমগুলো শরীরের কোনো স্থায়ী ৰতি করবে না।

পা এক্স-রে করেছ কি? ডাক্তার কী বলেছেন? ওখানে যদি ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা না হয়, তবে দ্রুত চট্টগ্রাম চলে এসো। আমার মামা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের বোন্-স্পেশালিস্ট। মামাকে আমি তোমার কথা বলে রাখব, কোনো সমস্যা হবে না। সরাসরি আমাদের বাসায় এসে উঠবে। কোনো দ্বিধা করবে না। আমার মনে হয়, ভয়ের কিছু নেই। এখন চিকিৎসা-ব্যবস্থা অনেক উন্নত। দরকার শুধু সময়মতো ডাক্তারের কাছে যাওয়া। আশা করি, পরম করুণাময়ের কৃপায় তুমি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে। আমাদের ফোন নম্বর তো তোমার জানা। প্রয়োজনে ফোন করো। তুমি দ্রুত ভালো হয়ে ওঠো, এটাই কামনা করি।

ইতি-
তোমার বন্ধু
মামুন

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

২২। এসএসসি পরীক্ষার পর অবসর দিনগুলো কীভাবে কাটাবে জানিয়ে বন্ধুর কাছে একটি পত্র লেখো।

৫.১.২০১৬
কুড়িগ্রাম

প্রিয় হানিফ,

শুভেচ্ছা নিস। অনেকদিন পর তোর চিঠি পেলাম। চিঠিতে তুই জানতে চেয়েছিস, আসন্ন পরীক্ষার পর কী করব? কেন, তোর কোনো পরিকল্পনা আছে নাকি? সিঙ্গাপুর, কলকাতা, কাঠমান্ডু কিংবা কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে আনন্দভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা? আসলে পরীক্ষার পর তিনমাস সময়টা যে খুব দীর্ঘ তা নয়। দেখতে দেখতে হয়তো কেটে যাবে। তবে আমি এই সময়টা কাজে লাগাতে চাই। নিরর্থক আনন্দভ্রমণের চেয়ে আমি বরং সময়টাকে অর্থময় করে তুলতে চাই।

প্রথমে আমার ইচ্ছে, পরীক্ষার পর কিছুদিন আমি গ্রামের বাড়িতে কাটাব। সেখানে আমার একটা পরিকল্পনা আছে। আমরা গ্রামের বন্ধুরা মিলে ১০০০টি ফলজ, বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ করব। চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে আমাদের গ্রামের যে নতুন রাস্তাটা হয়েছে, তার দুপাশে গাছগুলো লাগাব। কয়েকদিন গ্রামের বাড়িতে থাকাও হবে, আর বন্ধুদের নিয়ে গ্রামের জন্য কিছু করতে পারলে ভালো লাগবে। আমাদের দেশে যে হারে বৃক্ষনিধন চলছে, তাতে পরিবেশ বিপর্যয় অত্যাসন্ন।

তারপর ঢাকায় আমার বড়মামার বাসায় কিছুদিন বেড়াব। ঢাকার বেশকিছু দর্শনীয় স্থান আমার দেখা হয়নি। মামা-মামি কতবার যেতে বলেছেন। কিন্তু পড়াশোনার জন্যে এতদিন যাওয়া হয়নি। ভাবছি মামার বাসায় বেড়ানো হবে, দর্শনীয় স্থানও দেখা হবে। আপাতত পরিকল্পনা হচ্ছে, ঢাকার রায়েরবাজারে অবস্থিত শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ, লালবাগ কেল্লা ও আহসান মঞ্জিল দেখা। সম্ভব হলে ঈশা খাঁর স্মৃতিবিজড়িত সোনারগাঁও পরিদর্শন করব।

তুই তো জানিস, আমার বড়মামা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আমার মেঝমামাকে পাকিস্তানি আর্মিরা গুলি করে হত্যা করেছে। এসব আমার জন্মেরও আগের কথা। মায়ের মুখে মেজমামার নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা শুনতে শুনতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জন্মে গেছে। তাই প্রথমে রায়েরবাজারের বধ্যভূমি ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব। তারপর অন্যান্য জায়গা। মোটামুটি এই আমার পরিকল্পনা। ইচ্ছে করলে তুইও সঙ্গে যোগ দিতে পারিস।

আমার পরিকল্পনা তো জানালাম। এবার তোর অবসর কাটানোর পরিকল্পনা লিখে জানা। চাচা ও চাচিকে আমার সালাম দিস। তোর সুন্দর, বিকশিত জীবন কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি।

শুভেচ্ছান্তে
সালমান

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

২৩। ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক সফরের উপকারিতা বর্ণনা করে বন্ধুর কাছে একটি পত্র লেখো।

২৪/৪/২০১৬
নীলফামারী

প্রিয় অরুণ,

শুভেচ্ছা নিও। আশা করি বাড়ির সবাইকে নিয়ে ভালো আছ। আমরাও খোদার কৃপায় ভালো আছি। গত সপ্তাহে আমাদের স্কুলের সবাই মিলে ইতিহাসখ্যাত বগুড়া মহাস্থানগড় শিক্ষাসফরে গিয়েছিলাম। তোমাকে আজ লিখছি আমাদের সেই শিক্ষাসফর সম্পর্কে।

সেদিন সকাল সাড়ে আটটায় স্কুল ক্যাম্পাস থেকে আমাদের বাস ছেড়েছে। গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর একটা। শিক্ষাসফরে যাব বলে সবার মাঝে ছিল দারুণ আনন্দ। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন পুরাকীর্তি, বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শন ও ভাস্কর্য সম্পর্কে বইতে শুধু পড়েছি। সেখানে দাঁড়িয়ে যখন সেই লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের কথা আমাদের মমতাজ ম্যাডাম বলতে শুরু করলেন, কল্পনায় আমি যেন মুহূর্তে ফিরে গেলাম অতীতের সেই সমৃদ্ধ যুগে।

আমি উপলব্ধি করলাম, আসলে শুধু বই পড়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা কখনো সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে শিক্ষাসফরে যাওয়া উচিত। এতে জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক যেমন গড়ে উঠতে পারে, তেমনি বইতে পড়া ইতিহাস সম্বন্ধেও আমাদের অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়।

বাস্তব শিক্ষার জন্য আসলে শিক্ষাসফরের কোনো বিকল্প নেই। তাই জীবনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে শিক্ষাসফরের খুবই প্রয়োজন। এতে আনন্দও হয়, আবার বাস্তবতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা ও বোঝার সুযোগ ঘটে।

আজ আর নয়। ভালো থেকো।

ইতি-
তোমার বন্ধু
চয়ন

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

❑ আবেদনপত্র

১. মনে করো তোমার নাম শাকিল। হঠাৎ করে তোমার বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তোমার লেখাপড়া বন্ধ হতে বসেছে। এ অবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে সাহায্য চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একখানি আবেদনপত্র লেখো। [সি. বো. ১৩, রা. বো ১৪, চ. বো. ১৪]

বরাবর,
প্রধান শিক্ষক,
রাধানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গাজীপুর।

বিষয় : বিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই, আমি আপনার বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির একজন ছাত্র। গত তিন বছর যাবৎ আমি এ স্কুলে পড়ালেখা করছি। পরীক্ষায় সব সময়ই আমি প্রথম হয়ে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছি। নবম শ্রেণিতেও আমার রোল নম্বর ০১। আমার বাবা একজন দরিদ্র কৃষক। পরিবারের ভরণপোষণ ছাড়াও আমাদের তিন ভাইবোনের লেখাপড়ার খরচ চালাতে তিনি হিমশিম খান। তবুও তিনি এ যাবৎ বিদ্যালয়ের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করে আমাদের পড়ালেখার খরচ চালিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করে আমার লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

অতএব মহোদয়, আমার আবেদন মানবিকভাবে বিবেচনা করে আমাকে ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যদানে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
শাকিল চৌধুরী
রোল নং– ০১, নবম শ্রেণি, মানবিক বিভাগ।

২. শিক্ষাসফরের গুরুত্ব উল্লেখ করে তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে একটি আবেদনপত্র লেখো। [ঢা. বো. ১৫, দি. বো. ১৫, সি. বো. ১২]

বরাবর,
প্রধান শিক্ষক,
সরারচর শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

বিষয় : শিক্ষাসফরে প্রেরণের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। প্রতিবছর এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফরে গিয়ে থাকে। কিন্তু এ বছর এখনো এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। আমরা শিক্ষাসফরে যেতে চাই। ছাত্রজীবনে শিক্ষাসফরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যেকোনো ভ্রমণেই দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোভাবে জানার সুযোগ হয়। শিক্ষাসফরের ফলে ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আরো সমৃদ্ধ হয়।

আমরা এবার শিক্ষাসফরে ময়মনসিংহে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করছি। ময়মনসিংহ একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শহর। এর মুক্তাগাছা থানা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে খুব অগ্রগামী ছিল। সেখানে প্রাচীন জমিদারবাড়ি আছে। ময়মনসিংহ শহরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন। সে স্মৃতিচিহ্নও দেখা যাবে। তাছাড়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আনন্দমোহন কলেজ, জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা ইত্যাদিও আমাদের আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে। এসব স্থান ও স্থাপনা দর্শন করে আমরা বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হব।

একদিনের এই সফরের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমরা বহন করব। আমাদের সঙ্গে দুজন সিনিয়র শিক্ষক যেতে রাজি হয়েছেন। আপনার সম্মতি পেলে শিক্ষাসফরে যাওয়ার দিন ধার্য করে আমরা আমাদের অভিভাবকদের অনুমতি গ্রহণ করব।

অতএব, মহোদয়ের কাছে বিনীত আবেদন, আমাদের শিক্ষাসফরে যাওয়ার সদয় অনুমতি দিয়ে এবং ময়মনসিংহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা লাভের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

বিনীত–
নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পক্ষে
দ্বীন ইসলাম
তারিখ : ১১. ০৮. ২০১৬

৩. মনে করো, তোমার বাবা একটি সরকারি ব্যাংকে চাকরি করেন। সম্প্রতি তোমার বাবার বদলি হয়েছে। তাই তোমাকেও তাঁর সাথে চলে যেতে হবে। এজন্য তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ছাড়পত্র চেয়ে আবেদন করো। [ঢা. বো. ১৪]

বরাবর,
প্রধান শিক্ষক,
রাঙামাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
রাঙামাটি।

বিষয় : বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির একজন ছাত্র। আমার বাবা একজন সরকারি ব্যাংক কর্মকর্তা। সম্প্রতি তাঁকে কক্সবাজার জেলা শহরে বদলি করা হয়েছে। তাই পরিবারের সবার সঙ্গে আমাকেও কক্সবাজার যেতে হচ্ছে। সেখানে নতুন করে ভর্তির জন্য এই বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বিদ্যালয় ত্যাগের ছাড়পত্র দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক,
তাহসিন আহমেদ
রোল নং – ১২, ৯ম শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ
রাঙামাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রাঙামাটি।
তারিখ : ১৪. ০৬. ২০১৬

৪. ধরো, তুমি এ.কে. উচ্চ বিদ্যালয়, দনিয়া, ঢাকার নবম শ্রেণির ছাত্র। তোমাদের স্কুলে একটি 'বিজ্ঞান ক্লাব' গঠনের অনুমতি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একখানা আবেদনপত্র লেখো।

১৮/০৭/২০১৬

বরাবর,
প্রধান শিক্ষক,
এ.কে. উচ্চ বিদ্যালয়, দনিয়া, ঢাকা।

বিষয় : 'বিজ্ঞান ক্লাব' গঠনের অনুমতির জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী। বেশ কিছুদিন থেকে আমরা স্কুলে বিজ্ঞানচর্চার জন্য একটি বিজ্ঞান ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা হলে বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা, তথ্য আদান-প্রদান, পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব

হবে। বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করে আমরা নতুন নতুন বিজ্ঞান প্রজেক্ট তৈরিতেও সফলতা অর্জন করব। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠবে।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা, আমাদের বিদ্যালয়ে একটি 'বিজ্ঞান ক্লাব' গঠনের অনুমতি ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে বাধিত করবেন।

নিবেদক–
নবম শ্রেণির শিৰার্থীদের পৰে
আবদুস সালাম
এ. কে. উচ্চ বিদ্যালয়, দনিয়া, ঢাকা।

৫. মনে করো, তোমার নাম সেলিম চৌধুরী। তোমার বিদ্যালয়ের নাম জয়পুর সরোজিনী উচ্চ বিদ্যালয়। অসুস্থতার জন্য তুমি তিন দিন বিদ্যালয়ে যেতে পারনি। অনুপস্থিতির ছুটি মঞ্জুরের জন্য প্রধান শিৰকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো।

২৪/০৪/২০১৬

বরাবর
প্রধান শিৰক
জয়পুর সরোজিনী উচ্চ বিদ্যালয়
ছাগলনাইয়া, ফেনী।

বিষয় : অনুপস্থিতির ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে আমি গত ২১/০৪/২০১৫ থেকে ২৩/০৪/২০১৫ এ তিন দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারিনি।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উক্ত তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
সেলিম চৌধুরী
শ্রেণি– ৯ম, শাখা– মানবিক
রোল– ৭

৬. মনে করো, তুমি রোকাইয়া শশী। আগামী ২৫শে জুন তোমার বড় বোনের বিয়ে। এ উপলৰে চার দিনের অগ্রিম ছুটি চেয়ে তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিৰকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো।

২১/০৬/২০১৬

বরাবর
প্রধান শিৰক
ছয়সূতী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।

বিষয় : অগ্রিম ছুটির জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আগামী ২৫শে জুন আমার বড় বোনের শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমাকে বাড়িতে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। তাই আমার ২২শে জুন থেকে ২৫শে জুন পর্যন্ত মোট ৪ দিনের ছুটি অত্যন্ত প্রয়োজন।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উক্ত ৪ দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
আপনার অনুগত ছাত্রী
রোকাইয়া শশী
৯ম শ্রেণি, শাখা– বিজ্ঞান
রোল–০১

৭. মনে করো, তোমার নাম সিরাজ আহমেদ। তোমার বিদ্যালয়ের নাম গাজীরখামার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ চেয়ে প্রধান শিৰকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো। [য. বো. ১৫, ঢা. বো. ১৩, ব. বো. ১১, দি. বো. ১০]

০২/ ০৩/২০১৬

বরাবর
প্রধান শিৰক
গাজীরখামার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
গাজীরখামার, শেরপুর।

বিষয় : বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির বিজ্ঞান শাখার একজন নিয়মিত ছাত্র। প্রথম শ্রেণি হতেই আমি আপনার বিদ্যালয়ে পড়ছি এবং বরাবরই প্রথম হয়ে আসছি। আমার ছোট বোনও এই বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে। আমার মা দীর্ঘদিন থেকে শারীরিকভাবে অসুস্থ। তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রতি মাসেই বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়। আমার বাবা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। বাবার সামান্য আয়ে আমাদের যাবতীয় খরচ চালানো খুবই কষ্টকর। এ অবস্থায় তাঁর পৰে আমাদের দুই ভাইবোনের লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমার ভবিষ্যতের বিষয়টি মানবিকভাবে বিবেচনা করে আমাকে আপনার বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করার সুযোগ দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
সিরাজ আহমেদ
৯ম শ্রেণি, শাখা–বিজ্ঞান
রোল–০১

৮. মনে করো, তুমি মুহম্মদনগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির ছাত্র। বিদ্যালয়ে আসার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছ। এ অবস্থায় তৃতীয় ঘণ্টার পর ছুটি চেয়ে প্রধান শিৰকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো। তোমার নাম মো. হাসান।

১৭/০৫/২০১৬

বরাবর
প্রধান শিৰক
মুহম্মদনগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়
মুহম্মদনগর, সিলেট।

বিষয় : তৃতীয় ঘণ্টার পর ছুটির জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আজ বিদ্যালয়ে আসার পর থেকে আমার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। এ কারণে আমি ক্লাসগুলোতে মনোযোগ দিতে পারছি না।

অতএব, দয়া করে আমাকে তৃতীয় ঘণ্টার পর ছুটি দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত
মো. হাসান
৯ম শ্রেণি, শাখা– বিজ্ঞান
রোল–১০

৯. মনে করো, তোমার নাম আবেদ মেহেদী। জরুরি প্রয়োজনে গত মাসে তোমার বাবা খুলনা গিয়েছিলেন। যে কারণে তুমি যথাসময়ে বেতন ও পরীক্ষার ফি পরিশোধ করতে পার নি। এ অবস্থায় বিলম্বে বেতন ও ফি প্রদানের ক্ষেত্রে জরিমানা মওকুফের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো। [সি. বো. ১৪]

০৯/০৮/২০১৬
বরাবর
প্রধান শিক্ষক
মাছিমপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়
বাগহাটা, নরসিংদী।

বিষয় : জরিমানা মওকুফের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমার বাবা জরুরি প্রয়োজনে গত মাসে খুলনা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরতে তাঁর প্রায় এক সপ্তাহ সময় লেগে গিয়েছিল। যে কারণে আমি যথাসময়ে বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ফি পরিশোধ করতে পারিনি।

অতএব, বিনীত আবেদন, অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যাটির বিষয় বিবেচনা করে জরিমানা মওকুফ করে আমাকে বকেয়া বেতন ও ফি পরিশোধের সুযোগ দিতে আপনার মর্জি হয়।

বিনীত
আবেদ মেহেদী
৯ম শ্রেণি, শাখা– ব্যবসায় শিক্ষা
রোল–০৬

১০. মনে করো, তোমার নাম আবীর রায়হান। তুমি নবম শ্রেণিতে পড়। বিদ্যালয়ে একটি নলকূপ স্থাপনের আবেদন জানিয়ে প্রধান শিক্ষক বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখো।

তারিখ : ১৪/০৬/২০১৬
বরাবর
প্রধান শিক্ষক
আলমনগর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
আলমনগর, নাটোর।

বিষয় : নলকূপ স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের বিদ্যালয়ে প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। অনেক দূর–দূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা এখানে লেখাপড়া করতে আসে। তাই পানীয়জলের বিষয়টি ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয়জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। একমাত্র নলকূপটিও অনেক দিন থেকে নষ্ট। দোকান থেকে বোতলজাত পানীয়জল কেনার মতো সামর্থ্য সবার নেই। ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে কলের অনিরাপদ জল পান করছে। এর ফলে তারা ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েডসহ নানা রকম অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে। এতে ক্লাসে অনুপস্থিতির হার বাড়ছে। পড়াশোনাসহ শিক্ষা সহায়ক কর্মকাণ্ডে ছাত্র–ছাত্রীরা পিছিয়ে পড়ছে। তাই বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

অতএব, বিনীত নিবেদন, বিদ্যালয়ে শিগগিরই অন্তত একটি নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করে আমাদের বাধিত করবেন।

নিবেদক
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে
আবীর রায়হান
নবম শ্রেণি
রোল নম্বর– ৭

১১. মনে করো, তোমার নাম ইকবাল হাসান। ফুটবল খেলা দেখার জন্য ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষক বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখো।

তারিখ : ১২ই মার্চ, ২০১৬
বরাবর,
প্রধান শিক্ষক
ব্রাইট কিডস্ একাডেমি
লালবাগ, ঢাকা।

বিষয় : ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার জন্য সাময়িক ছুটির আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আগামীকাল সুজানগর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্বাধীনতা দিবস ফুটবল কাপের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। খেলাটিতে আমাদের স্কুল সুজানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মুখোমুখি হবে। মাঠে আমাদের উপস্থিতি আমাদের খেলোয়াড়দের মনোবল বাড়াবে। তাই তাদের অনুপ্রেরণা জোগাতে আমরা সবাই খেলাটি দেখতে অত্যন্ত আগ্রহী।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা, আগামীকাল দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ পিরিয়ড পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ রেখে আমাদের খেলাটি দেখার সুযোগ দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে
ইকবাল হাসান
শ্রেণি : ৯ম; শাখা– বিজ্ঞান
রোল নং– ০২।

১২. প্রশংসাপত্র চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন পত্র লেখো।

[সি. বো. ১৫, ঢা. বো. ১৪]

তারিখ : ২৫/০৮/২০১৫

বরাবর,
প্রধান শিক্ষক,

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল
বেইলি রোড, ঢাকা।

বিষয় : প্রশংসাপত্রের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে,

আমি এই বিদ্যালয়ে গত ছয় বছর নিয়মিত ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা করেছি। ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় আমি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৫.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হই।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমি বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে আমার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। অল্পকিছু দিনের ভেতরেই একাদশ শ্রেণির ভর্তির কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। তাই আমার একটি প্রশংসাপত্র প্রয়োজন।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আমার চারিত্রিক ও শিক্ষাবিষয়ক প্রশংসাপত্র প্রদান করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত
লিজা জাফরিন নাহার
দশম শ্রেণি

১৩. ধরো, তোমার নাম ইকরাম। তোমার এলাকায় পাঠাগার স্থাপনের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট আবেদনপত্র লেখো।

বরাবর
উপজেলা চেয়ারম্যান
নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ
নওগাঁ।

বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

মহোদয়,
সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের নিয়ামতপুর উপজেলাটি একটি জনবহুল এলাকা। হাই স্কুল ও প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ এখানকার জনসংখ্যা প্রায় হাজারের ওপরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখানে কোনো পাঠাগার নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানচর্চা, মানসগঠন ও সৃজনশীল চেতনা বিকাশে একটি পাঠাগার খুবই জরুরি। এ ছাড়া এলাকায় দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানে একটি পাঠাগার হলে তরুণরা তাদের অলস সময়কে জ্ঞানচর্চার মতো প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করতে পারবে।
অতএব, পলাশবাড়ি উপজেলার সব বয়সের জনসাধারণের উপকারের কথা বিবেচনা করে অতিসত্বর এখানে একটি পাঠাগার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
পলাশবাড়ি উপজেলার জনসাধারণের পক্ষে
ইশতিয়াক আহমেদ
তারিখ : ২রা জুন ২০১৬।

১৪. তোমার এলাকায় ভয়াবহ টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের সাহায্যার্থে জেলা প্রশাসকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো। [চ. বো. ০৮, সি. বো. ১১]

মাননীয়
জেলা প্রশাসক
মানিকগঞ্জ।

বিষয় : ভয়াবহ টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্ত সাটুরিয়ার জনসাধারণের জন্য ত্রাণসামগ্রীর আবেদন।

জনাব,
যথাবিহিত সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন গত ১৫ জুলাই এক ভয়াবহ টর্নেডোতে সাটুরিয়া উপজেলার ৬টি গ্রামসহ বিস্তীর্ণ এলাকা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। টর্নেডোর তাণ্ডবে অন্তত ২০ ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে। মারা গেছে বহু গবাদি পশু। সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে শত শত মানুষ। স্বজনহারাদের কান্না আজও থামেনি। অনাহারে অর্ধাহারে বহু মানুষ খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে। গ্রামগুলোতে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও বাসস্থানের সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চিকিৎসার অভাবে তাদের অনেকের জীবন সংকটাপন্ন। এমতাবস্থায় উপদ্রুত এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণসামগ্রী প্রদানের জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।
অতএব, বিনীত আরজ সাটুরিয়া উপজেলার টর্নেডো-উপদ্রুত এলাকার মানুষের অসহায় অবস্থা বিবেচনা করে দ্রুত ত্রাণসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
সাটুরিয়া এলাকাবাসীর পক্ষে
হাসান ফারুক
বরাইদ, সাটুরিয়া।

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

❑ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র

১. বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখো। [চ. বো. ১৪, ১০; কু. বো. ০৯; সি. বো. ১২]

তারিখ : ১৫-০৩-২০১৬
বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ
পান্থপথ, ঢাকা।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক 'আলোকিত বাংলাদেশ'-এ নিম্নোক্ত পত্রটি প্রকাশ করে বৃক্ষরোপণের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের অনুরোধ করছি।

বিনীত
নাইমুল ইসলাম

ধামরাই, ঢাকা।

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন করবন

যেকোনো দেশের জন্যই বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। একটি দেশের আয়তনের এক-চতুর্থাংশ বনভূমি থাকা বাঞ্ছনীয়। এই বনভূমিই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। পরিবেশ দূষণের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে। দেশের সামগ্রিক জলবায়ুর ওপর রয়েছে বনভূমির যথেষ্ট প্রভাব। বৃক্ষ আমাদের জীবনরক্ষাকারী অক্সিজেন সরবরাহ করে। এটি একদিকে জ্বালানি কাঠের চাহিদা মেটায় অন্যদিকে জলবায়ুর সমতা রক্ষা করে। গাছপালা থেকে আহরিত কাঠের ব্যবহার হয়। আসবাবপত্র, যানবাহন, বাড়িঘর নির্মাণ এমনকি বস্ত্র ও কাগজ তৈরিতে। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত বাড়ির আনাচ-কানাচে রাস্তার দুই ধারে পুকুর পাড়ে, নদীতীরে সর্বত্র বৃক্ষরোপণ করা। আমাদের দেশে যেটুকু বনভূমি রয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত অপ্রতুল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে আশঙ্কাজনকভাবে। নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন চলছে দেশজুড়ে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছি আমরা। পরিবেশ দূষণের কারণে অসহনীয় হয়ে উঠেছে শহরাঞ্চলের পরিবেশ। দেশের জলবায়ুতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ব্যাপক ভিত্তিতে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমেই কেবল এ সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। পরিবেশের উন্নয়নের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতেও বিশেষ অবদান রাখবে। বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে সফল করা তাই সময়ের অপরিহার্য দাবি।

নাইমুল ইসলাম
ধামরাই, ঢাকা।

২. সড়ক দুর্ঘটনা রোধের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখো। [কু. বো. ১৫]

১০ই নভেম্বর, ২০১৬
সম্পাদক,
দৈনিক ইনকিলাব
ইনকিলাব ভবন
২/১, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশের জন্য 'সড়ক দুর্ঘটনা রোধের উপায়' শিরোনামের একটি চিঠি পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহ করে তা প্রকাশের সুযোগ করে দিলে বাধিত হব।

বিনীত
বেনজীর আহমদ
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ

সড়ক দুর্ঘটনা রোধের উপায়

'একটা দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না'- এ সেরাগানটি নির্মম বাস্তবতানির্ভর ও সর্বজনবিদিত। সড়ক দুর্ঘটনা বর্তমানে আমাদের দেশের একটি জাতীয় সমস্যা। মুহূর্তের মধ্যে তা ছিনিয়ে নিচ্ছে মানুষের অমূল্য জীবন, ভেঙে দিচ্ছে অসংখ্য সাজানো সংসার। পঙ্গু ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে অনেক মানুষ। সম্পদের ক্ষতিও কম হচ্ছে না। তাই আজ সর্বমহল থেকে দাবি উঠেছে, 'নিরাপদ সড়ক চাই'। তা সত্ত্বেও দিন দিন প্রতিযোগিতা করে এ দেশে সড়ক দুর্ঘটনার হার বেড়ে যাচ্ছে। এতে কত মূল্যবান প্রাণ অকালে ঝরে পড়ছে, কত পরিবার পথে বসেছে, সেই অশ্রুসজল করুণ মুখের হিসাব কেউ রাখে না। পিতার কাঁধে পুত্রের লাশ অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের সামনে পিতার রক্তাক্ত নিথর দেহ- এই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। অথচ এসব দুর্ঘটনার পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চালক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা দায়ী। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। প্রতিটি বাসস্টেশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ বা তদারককারী মোতায়েন করে চালক ও হেলপারদের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে হবে। বাসচালক ও বাসমালিকদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান করতে হবে। এ ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ও নিরাপদ যানবাহন চলাচলের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

(১) বেশিরভাগ দুর্ঘটনাই ঘটে অদক্ষ, অযোগ্য ও লাইসেন্সবিহীন চালকের কারণে। তাই লাইসেন্স প্রদানের আগে চালকের দক্ষতা ও যোগ্যতা ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করতে হবে। লাইসেন্সবিহীন কেউ যেন গাড়ি চালাতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। (২) ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন প্রায়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। তাই রাস্তায় বের করার আগে যান্ত্রিক কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। প্রতিটি গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট আছে কী না তাও দেখতে হবে। (৩) ট্রাফিক আইন ভঙ্গের কারণে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। তাই এ আইনের প্রতি যাতে সবাই শ্রদ্ধাশীল থাকে সেজন্য একে আরো শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করতে হবে। (৪) ওভারটেকিংয়ের কারণে প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটে। তাই বিধিবহির্ভূত ওভারটেকিংয়ের অসম প্রতিযোগিতা থেকে চালককে বিরত থাকতে হবে। (৫) অতিরিক্ত মাল ও যাত্রীবোঝাই সড়ক দুর্ঘটনার জন্য অনেকাংশে দায়ী। অতিরিক্ত মাল ও যাত্রী বহন কঠোর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে। (৬) মহাসড়কের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তা অধিকতর প্রশস্ত করা প্রয়োজন। (৭) রাস্তায় ডিভাইডার প্রস্তুত করা অত্যন্ত জরুরি। (৮) গাড়িচালকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আশা করি, উপর্যুক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

নিবেদক
বেনজীর আহমদ
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৩. তোমার এলাকার বন্যার্তদের সাহায্যের আবেদন জানিয়ে/ত্রাণ বিতরণের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকায় প্রকাশের লক্ষ্যে সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি লেখো। [ঢা. বো. ১৪, ব. বো. ১৪, সি. বো. ১৪, কু. বো. ১৪]

১৫ নভেম্বর, ২০১৬
মাননীয়
সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক
কাওরান বাজার, ঢাকা

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় 'বন্যার্তদের জন্য সাহায্য চাই' শিরোনামে একটি চিঠি 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার ও সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আমার এই বক্তব্য প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

বিনীত
মিজানুর রহমান
আরিচা, মানিকগঞ্জ।

শিবালয় (মানিকগঞ্জ) অঞ্চলের বন্যার্তদের জন্য মানবিক সাহায্যের আবেদন

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলা এবারও সর্বনাশা বন্যার করাল গ্রাস থেকে রৰা পায়নি। এবারের বন্যা স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা। বন্যার পানিতে ভেসে গেছে এই এলাকার সমস্ত অবকাঠামো। প্রবল বর্ষণ আর পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে সম্পূর্ণ উপজেলা আজ বন্যাকবলিত। নদীর পানি এখনও বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যাকবলিত গ্রামগুলোর অধিকাংশ বাড়িঘর পানিতে ডুবে গেছে। ভেসে গেছে কৃষকদের গরব-বাছুর, পুকুরের মাছ। জমির ফসলও সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে। পানিবন্দি হাজার হাজার মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছে। চারদিকে পানি অথচ বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব। বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে এলাকায় দেখা দিয়েছে ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, ইত্যাদি পানিবাহিত রোগ। থানা প্রশাসন ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো খাদ্য-বস্ত্রের যতটুকু জোগান দিতে পারছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। অবিলম্বে খাদ্য, পানীয় জল এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা না করলে দুর্গতদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে না।

তাই, এ ব্যাপারে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপৰের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বিভিন্ন সাহায্যদাতা সংস্থা ও সমাজের দানশীল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি।

৪. তোমার এলাকায় একটি রাস্তা সংস্কার সম্বন্ধে কর্তৃপৰের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রের প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখো।

তারিখ : ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
বরাবর,
সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক
৪০ কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১২১৫।

জনাব
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি ছাপিয়ে এলাকাবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

ধন্যাবাদান্তে,
মো. রোকনুজ্জামান
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

দৌলতপুর-ভেড়ামারা সড়কের আশু সংস্কার চাই

কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর এবং ভেড়ামারা উপজেলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী প্রধান সড়ক হলো দৌলতপুর-ভেড়ামারা সড়ক। প্রতিদিন শত শত বাস, ট্রাক এই সড়ক দিয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু সড়কটি দীর্ঘদিন যাবত অযত্নের শিকার। সড়ক বিভাগের অবহেলার দরবণ এই পাকা সড়কটি এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে মেরামত করা হয়নি। এই সড়কের বেশ কিছু অংশে এখনও কার্পেটিং করা হয়নি। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাসহ কুষ্টিয়ার দুটি উপজেলার হাজার হাজার মানুষের জন্য এই একটাই প্রধান সড়ক। এই সড়ক ব্যবহার করেই তাদের রাজধানী ঢাকায় যেতে হয়। অতএব, রাস্তাটির গুরবত্বকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। এ বছর বন্যার কারণে সড়কটি বেশি ৰতিগ্রস্ত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাস্তাটি যদি দ্রবত মেরামত করা না হয়, তাহলে একদিকে যেমন সরকারের অর্থনৈতিক ৰতি হবে, অপরদিকে এই এলাকার জনসাধারণের কষ্টের সীমা থাকবে না। তাই যথাশীঘ্র সম্ভব রাস্তাটি মেরামতের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপৰের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এলাকাবাসীর পৰে,
মো. রোকনুজ্জামান

[এখানে ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

৫. তোমার এলাকায় মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূষণের প্রতিকার চেয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র রচনা করো।

তারিখ : ৯ই এপ্রিল, ২০১৬
বরাবর,
সম্পাদক
দৈনিক প্রথম আলো
১০০, কাজী নজরবল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।

জনাব,
আপনার সম্পাদিত ও বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় নিম্নোক্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
মো. সেলিম রেজা
ভবানীপুর, মেহেরপুর।

আর্সেনিক সমস্যার সমাধান চাই

বর্তমান সময়ে সারাদেশে আর্সেনিক সমস্যার ভয়াবহতা প্রকাশ পেয়েছে। আর্সেনিকের এই ভয়াবহতার শিকার মেহেরপুর জেলাও। এ জেলার ভবানীপুর ও এর আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রাম আর্সেনিক বিষের মারাত্মক শিকার। দীর্ঘদিন ধরে মাত্রাধিক আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের ফলে এ এলাকার বহুলোক আর্সেনিকজনিত নানা সমস্যার সম্মুখীন। অনেকের গায়ে-পিঠে, হাত-পায়ের তালুতে বিশেষ ধরনের চর্মরোগ দেখা দিয়েছে। নির্দিষ্ট মাত্রার আর্সেনিক পানিতে মিশ্রিত থাকা আবশ্যক কিন্তু মাত্রাধিক আর্সেনিকযুক্ত পানি পান যে জীবনের জন্য হুমকিস্বরূ প তা এই গ্রামের অশিৰিত সাধারণ জনগণের অনেকেই জানে না। ফলে তারা প্রতিনিয়তই বিষমিশ্রিত পানি পান করছে। তাদেরকে আর্সেনিক সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করা অতি জরবরি। এছাড়া এলাকার যেসব নলকূপের পানিতে মাত্রাধিক আর্সেনিক আছে সেগুলো চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলোর পানি পান থেকে গ্রামবাসীকে বিরত রাখতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারি দায়িত্ব বলে এলাকাবাসী মনে করে। পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানির সুবন্দোবস্ত করা এবং বিশুদ্ধ পানি পানের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টিও অতি জরবরি। তাই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদৰেপ নেওয়ার জন্য সংশিৰষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিবেদক
ভবানীপুর এলাকাবাসীর পৰে

মো. সেলিম রেজা

[এখানে ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

৬. তোমার এলাকার বিশুদ্ধ পানির অভাব সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট একটি পত্র রচনা করো।

তারিখ : ২০শে মে ২০১৬
বরাবর,
সম্পাদক
দৈনিক মানবজমিন
৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক মানবজমিন' পত্রিকায় অনুগ্রহপূর্বক আমার নিম্নলিখিত পত্রটি চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশের মাধ্যমে এলাকার অধিবাসীদের দুঃখ-কষ্টের করুণ চিত্র তুলে ধরলে কৃতার্থ হব।

বিনীত নিবেদক
কামাল হোসেন
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা চাই

কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার অন্তর্গত চরদিয়াড়ি গ্রামের দারিদ্র্য-পীড়িত অধিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরে নিদারুণ পানিকষ্ট ভোগ করে আসছে। বিশুদ্ধ পানি পাওয়ার মতো কোনো নলকূপ এই গ্রামে নেই। গ্রামে রয়েছে অতি পুরাতন তিনটি পাতকূপ, দুটি পুরাতন পুকুর ও ছোট একটি খাল। পানির এ সীমিত উৎস থেকে গ্রামবাসী কোনোরকমে দৈনন্দিন কাজ ও পানীয় জলের অভাব মিটিয়ে থাকে। পুকুরগুলো অতি পুরাতন এবং সংস্কারের অভাবে শ্যাওলা জাতীয় জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। খালটিতে একমাত্র বর্ষা মৌসুম ছাড়া অন্য সময় মোটেই পানি থাকে না। শুকনো মৌসুমে তাই নিদারুণ পানিকষ্ট দেখা যায়। যে কয়টি পাতকূপ আছে তা গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারে না। মানুষ বাধ্য হয়ে পুকুরের জীবাণুযুক্ত পানি পান করে। ফলে প্রায়ই গ্রামবাসীকে কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হতে হয়, অনেকে অকালে মৃত্যুবরণ করে। অতএব আমাদের এ মারাত্মক সমস্যাটি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে অনতিবিলম্বে গ্রামে কয়েকটি নলকূপ স্থাপন করার জন্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
বিনীত নিবেদক
গ্রামবাসীর পক্ষে
কামাল হোসেন

[এখানে ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

৭. তোমার এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখো।

তারিখ : ১৪ই এপ্রিল ২০১৬
বরাবর,
সম্পাদক
সকালের খবর
পুরানা পল্টন, ঢাকা।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।
বিনীত
অবনী রাহনুম
খিলগাঁও, ঢাকা।

লোডশেডিং বন্ধে ব্যবস্থা নিন

আমরা রাজধানী ঢাকার অন্তর্গত খিলগাঁও এলাকার অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে চরম লোডশেডিং-এর শিকার। আমরা জানি, সারাদেশে এখন বিদ্যুৎ ঘাটতি চলছে এবং এও জানি দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত লোডশেডিং চলছে। তবে আমাদের এই খিলগাঁও এলাকার মতো এরকম লোডশেডিং এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে এরকম অব্যবস্থা বাংলাদেশের আর কোনো স্থানে আছে বলে আমাদের জানা নেই। বিদ্যুৎকর্মীরা এই এলাকার হাজার হাজার মানুষকে যেন জিম্মি করে রেখেছে। এখানে নিয়মিতভাবে প্রতিদিনই তিন চারবার করে লোডশেডিং হচ্ছে। একে তো গরমের দিন, তার ওপর বিদ্যুতের এই অনিয়মের ফলে পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। দুপুরে যখন প্রচণ্ড গরম থাকে তখন দু-আড়াই ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। আবার রাতে কয়েকবার করে বিদ্যুৎ চলে যায়। টেলিভিশনে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, নাট্যানুষ্ঠান বা বিনোদনমূলক কোনো অনুষ্ঠান আমরা একদিনও ঠিকমতো দেখতে পারি না। তাছাড়া রাতে দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার খুবই বিঘ্ন ঘটছে। কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আকুল আবেদন আমাদের এই অশেষ ভোগান্তি দূর করার জন্য অতিসত্বর এ এলাকার লোডশেডিং বন্ধ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করুন।

বিনীত
এলাকাবাসীর পক্ষে
অবনী রাহনুম
খিলগাঁও, ঢাকা।

[এখানে ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

৮. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখো।

তারিখ : ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০১৬
বরাবর,
সম্পাদক
দৈনিক নয়াদিগন্ত
ইডেন কমপ্লেক্স, মতিঝিল, ঢাকা।
জনাব,
আপনার সম্পাদিত ও বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় নিম্নোক্ত পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
আতিকুর রহমান রিংকু
নাগরপুর, টাঙ্গাইল।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ প্রসঙ্গে

কৃষিনির্ভর অর্থনীতির বাংলাদেশের শতকরা ৬০ জন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে একদিকে জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রও সীমিত হয়ে পড়ছে। এদেশের শিক্ষিত মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বেকার। এরূ প পরিস্থিতিতে জনজীবনে

যখন চলছে টানাপোড়েন, ঠিক তখনই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বেড়ে চলেছে। চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, জ্বালানি তেল, পিঁয়াজ, রসুন, আদা, মাছ, মাংস, চিনি, শিশুখাদ্য ইত্যাদির দাম রাতারাতি প্রায় বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। এরূ প পরিস্থিতিতে নিম্ন আয়ের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। প্রয়োজনানুসারে তারা জিনিসপত্র কিনতে পারছে না। এ অবস্থা চলতে থাকলে যেকোনো সময় গণবিদ্রোহের ঘটনা ঘটে যেতে পারে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে দেশে বাজার নিয়ন্ত্রকারী কোনো কর্তৃপৰ নেই, নেই এ বিষয়ে সরকারের কোনো বিশেষ নজর। ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কাছে অসহায় হয়ে পড়ছে নগরজীবন। এ অবস্থার আশু প্রতিকার প্রয়োজন। এ জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলো হলো– ১. বাজার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপৰকে সক্রিয় করা, সেই সাথে সরেজমিনে তদন্তের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ খুঁজে বের করা; ২. এ অবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদের বিরবদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা; ৩. আন্তর্জাতিক বাজারে যে সকল দ্রব্যের মূল্য বেড়ে গেছে সেসব দ্রব্যের ৰেত্রে সরকারের বিশেষ ভর্তুকি প্রদান করা; ৪. আমদানি কর প্রত্যাহার করা। আশা করা যায়– এ ব্যাপারগুলোতে নজর দিলে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকবে।

নিবেদক
আতিকুর রহমান রিংকু
নাগরপুর, টাঙ্গাইল।

[এখানে ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

৯. শহরে যানজট নিরসনের জন্য যথাযথ কর্তৃপৰের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখো।

তারিখ : ১৭ই মে ২০১৬
বরাবর,
সম্পাদক
দৈনিক প্রথম আলো
১০০ কাজী নজরবল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা–১২১৫।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় নিম্নলিখিত জনগুরবত্বসম্পন্ন পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।
নিবেদক
বাদল রায়
গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

অসহনীয় যানজটে স্থবির নগরজীবন

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। দেশের সমস্ত কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র। নানা প্রয়োজনে দেশের সকল প্রান্তের মানুষ ঢাকা আসে। অফিস–আদালতের কাজ, ভ্রমণসহ নানা প্রয়োজনের কেন্দ্রস্থল ঢাকা। অথচ দেশের ব্যস্ততম এ শহরটি যানজটের কবলে পড়ে নাকাল। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তায় তীব্র ট্রাফিক জ্যাম লৰ করা যায়। দুঃসহ যানজটের কবলে পড়ে মানুষকে যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানবাহনের মধ্যে আটকে থাকতে হয় তখন ঢাকা সম্পর্কে মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্ম হয়। ফার্মগেট থেকে গুলিস্তান যেতে যেখানে বড়জোর পনেরো মিনিট সময় দরকার, সেখানে যানজটের কারণে কখনো কখনো আড়াই ঘণ্টা লেগে যায়। শহরের গুরবত্বপূর্ণ সবগুলো সড়কেই একই চিত্র। এভাবেই মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান সময়। যেখানে দিনে পাঁচটি কাজ করা সম্ভব যানজটের কারণে হয়তো দুটি কাজ করা যায়। এ অবস্থায় দেশ অর্থনৈতিকভাবে চরম ৰতির সম্মুখীন হচ্ছে। ৰতির সম্মুখীন হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এ দুরবস্থা নিরসনকল্পে যথাযথ কর্তৃপৰের নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১. অবৈধ স্থাপনা ও ফুটপাত দখলকারীদের উচ্ছেদ করা;
২. রাস্তাসমূহ প্রয়োজনের অনুপাতে প্রশস্ত করা;
৩. যানবাহন চালকদের ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলতে বাধ্য করা;
৪. পাতাল রেলের ব্যবস্থা করা। এজন্য প্রয়োজনে উন্নত দেশের সাহায্য গ্রহণ করা;
৫. নগরীর চারদিক দিয়ে বিকল্প রেল স্থাপন করা;
৬. ফ্লাইওভারগুলোর নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করা।

উপরোলিৱখিত ব্যবস্থসমূহ গ্রহণ করলে যানজটের তীব্রতা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

নিবেদক
বাদল রায়
গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

[এখানে ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

১০. 'ইভ টিজিং'–এর বিরবদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লৰ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখো।

তারিখ : ১০ই জানুয়ারি ২০১৬
বরাবর,
সম্পাদক
দৈনিক ইনকিলাব
রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা।

জনাব,
সম্মান জানবেন। আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশের জন্য "ইভ টিজিং প্রতিরাধে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন" শিরোনামে একটি চিঠি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এই গুরবত্বপূর্ণ বিষয়ে সর্বসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের লৰ্যে আমার চিঠিটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

বিনীত
মারবফা শারমিন
কুমিলরা।

'ইভ টিজিং' প্রতিরোধে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন

বর্তমানে 'ইভ টিজিং' বহুল আলোচিত ও ভীতি জাগানিয়া একটি শব্দ। এটি একটি মানসিক ও সামাজিক সমস্যা। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের সমাজে উত্যক্তকারীদের জ্বালাতনে নারীর জীবন অতিষ্ঠ। বিশেষত উচ্ছৃঙ্খল ও বখাটে ছেলে/যুবকদের বিকৃত মানসিকতা এবং নৈতিক চরিত্রের অবনতি, মূল্যবোধের অভাব, আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এর প্রধান কারণ। বর্তমানে ইভটিজিং এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে, এর কারণে শুধু নারীরাই প্রাণ দিচ্ছে না, প্রতিবাদকারীরাও এখন নিরাপদ নয়। ইভ টিজিংয়ের শিকার হয়ে এ পর্যন্ত অনেক নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।। বর্তমানে দেশে ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সী ৯০% নারী ঘরে এবং ঘরের বাইরে ইভ টিজিংয়ের শিকার হচ্ছেন। ফলে নারীদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যহত হচ্ছে। তাই আর দেরি না করে ইভ টিজিং–এর বিরবদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য কঠোর আইন ও শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ লৰ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে জনগণের সৃষ্ট দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। পুলিশকে গণমানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে

এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে। তবে, শুধু কঠোর আইন করেই ইভ টিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন। ইভ টিজিং নামক সামাজিক ব্যাধিকে সামগ্রিকভাবে নারী নির্যাতন অথবা যুব সমাজের ভয়াবহ অধঃপতন– যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এই ব্যাধি হতে সমাজকে মুক্ত করতে না পারলে মানবিক অগ্রগতির পথ বাধাগ্রস্ত হতে থাকবে। তাই পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ তৈরি করতে হবে। তৈরি করতে হবে ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। যে মেয়েটি ইভ টিজিং–এর শিকার–পরিবার থেকে তার প্রতি সহানুভূতি, সাহস ও আশ্বাস দেওয়া বিশেষ গুরবত্বপূর্ণ। লৰ রাখতে হবে মেয়েটি যেন তার মনোবল হারিয়ে না ফেলে। নারীকে মানুষ হিসেবে সম্মান করার বিষয়টির শিৰা পুত্র–সন্তানদের পরিবার থেকেই দিতে হবে। আসুন, সবাই সম্মিলিতভাবে এই সন্ত্রাসের বিরবদ্ধে রবখে দাঁড়াই।

মারবফা শারমিন
কুমিলরা

[এখানে ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

১১. তোমার এলাকায় ডেঙ্গু মশার উপদ্রব নিবারণের জন্যে/ ডেঙ্গুজ্বরের প্রতিকারের আবেদন জানিয়ে কর্তৃপৰের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখো।

তারিখ : ২০শে জুন ২০১৬
বরাবর,
সম্পাদক
দৈনিক প্রথম আলো
১০০ কাজী নজরবল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা–১২১৫।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত পত্রটি ছাপিয়ে যথাযথ কর্তৃপৰের দৃষ্টি আকর্ষণে সহায়তা করলে কৃতার্থ হব।

বিনীত
সালেহা বানু
লালবাগ, ঢাকা।

ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন

রাজধানী ঢাকার লালবাগ একটি জনবহুল এলাকা। এলাকার জরাজীর্ণ রাস্তাগুলোর মোড়ের নোংরা অবৈধ ডাস্টবিন ও বন্ধ ড্রেনগুলোতে প্রতিনিয়ত জন্ম নেয় অসংখ্য মশা। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসী মশার উৎপাতে অতিষ্ঠ। এ বিষয়ে বার বার কর্তৃপৰের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোনো ফল হয়নি। সম্প্রতি স্থানীয় বেশ কয়েকজন ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় এলাকায় ডেঙ্গু আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ডেঙ্গুজ্বর একটি ভাইরাসজনিত মশাবাহিত রোগ। স্বল্প পরিমাণ পরিষ্কার পানিতে এ রোগের বাহক এডিস মশা ডিম পাড়ে। বিভিন্ন বাড়িতে থাকা ফুলের টব, যত্রতত্র ফেলা নারকেলের মালা, ভাঙা কলস, পরিত্যক্ত কৌটা প্রভৃতিতে কারণেই এই এলাকায় এডিস মশার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এগুলোতে থাকা স্থির পানিই এডিসের প্রজননের উত্তম জায়গা। এডিস মশার কামড়ে প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসতাপালে ভর্তি হচ্ছে। ইতোমধ্যে আক্রান্তদের দুজন মৃত্যুবরণও করেছে। তাই ডেঙ্গু আতঙ্কে এলাকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায়, ডেঙ্গুজ্বর প্রতিকারের লৰ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং এডিস মশা বিনাশমূলক প্রয়োজনীয় পদৰেপ গ্রহণ করে জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে যথাযথ কর্তৃপৰের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিবেদক
সালেহা চৌধুরী
লালবাগ, ঢাকা।

[এখানে ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

❑ ব্যবসাসংক্রান্ত পত্র

১. বিদ্যালয়ের ক্রীড়াসামগ্রী ক্রয়ের জন্য মূল্যতালিকা চেয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে পত্র লেখো।

তারিখ : ২০.০৮.২০১৬
ম্যানেজার,
স্পোর্টস বাজার
শপ নং–২০, স্টেডিয়াম মার্কেট
গুলিস্তান, ঢাকা–১০০০

জনাব,
প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলাদেশ আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপৰ বেশ কিছু ক্রীড়াসামগ্রী ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক নিচের তালিকাভুক্ত সামগ্রীর মূল্য তালিকা পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত
বাংলাদেশ আইডিয়াল স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের পৰে
কবির হাসান
খিলগাঁও, ঢাকা

ক্রীড়াসামগ্রীর তালিকা

১. ফুটবল – ৩টি
২. ভলিবল – ২টি
৩. ভলিবল নেট – ১টি
৪. ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট – ১০টি
৫. ব্যাডমিন্টন কর্ক – ২ ডজন
৬. ব্যাডমিন্টন নেট – ১টি
৭. ক্রিকেট ব্যাট – ৪টি
৮. ক্রিকেট বল – ১০টি
৯. ক্রিকেট স্ট্যাম্প – ২টি

২. ভিপিপি যোগে বই পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট পত্র লেখো।

১৮ই মার্চ ২০১৬
বরাবর,
ম্যানেজার
পাঠশালা প্রকাশন
২৬, আলী রেজা মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা–১০০০

জনাব,

শ্রদ্ধা জানবেন। আপনাদের প্রকাশিত কিছু বই আমার জরুরি প্রয়োজন। তাই নিম্নলিখিত বইগুলো যত দ্রুত সম্ভব ভিপিপি যোগে পাঠিয়ে বাধিত করবেন। বইপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই মূল্য পরিশোধ করা হবে।

অতএব, বইগুলো নিম্নলিখিত ঠিকানায় দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ রইল।

আপনার বিশ্বস্ত
কমলিকা চৌধুরী
নবম শ্রেণি (মানবিক), রোল নং–০৫
হামসাদী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

বইয়ের তালিকা

১. পাঠশালা মাধ্যমিক সৃজনশীল বাংলা – ২০১৬
২. পাঠশালা মাধ্যমিক ইংরেজি – ২০১৬
৩. পাঠশালা জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা সহায়িকা–২০১৬
৪. পাঠশালা জেএসসি বহুনির্বাচনি টেস্ট পেপারস–২০১৬

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

❑ মানপত্র/অভিনন্দন পত্র

১. তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের/শিক্ষকের অবসর গ্রহণ/বিদায় উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা করো।

[চ. বো. ১২, কু. বো. ১৩, য. বো. ১৪, ব. বো. ১৪]

আলফাডাঙ্গা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক
শিক্ষক **আকবর খান স্যার**–এর অবসর গ্রহণ/ বিদায়ে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে মান্যবর,

ব্যথাতুর হৃদয়ে সালাম ও অশ্রুসজল প্রীতি গ্রহণ করবন। এ মুহূর্তে কোনোভাবেই কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি না মনকে বোঝানোর, বিশ্বাস করতে পারছি না আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি। শিক্ষকতার মহান ব্রত নিয়ে আপনি এসেছিলেন এ ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠে। সুদীর্ঘ সময় এর কর্ণধার হিসেবে সগৌরবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আজ বেজে উঠেছে বিদায়ের বেদনার সুর। আমাদের অবুঝ মনের করুণ কান্না আজ সকল বাঁধ ভেঙে বন্যাহীন হয়ে উঠেছে। চোখের জলে সব ঝাপসা মনে হচ্ছে। আমাদের ব্যথাহত অন্তরে কেবলই জেগে উঠছে বিষাদের বাণী–

এ অনন্ত চরাচরে
সবচেয়ে পুরাতন কথা
সবচেয়ে গভীর ক্রন্দন
"যেতে নাহি দিব' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।"

হে শিক্ষাগুরু!

আপনার বিদায় সংবাদ আমাদের হৃদয়ে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। আপনার স্নেহমাখা হাসিমুখ আমরা আর দেখতে পাব না। আপনার মিষ্টি কথা আমরা আর শুনতে পাব না– এ কথা ভেবে আমাদের মন ব্যথায় কুঁকড়ে উঠছে। আপনাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য স্মৃতি এ মুহূর্তে আমাদের অন্তরে ভেসে উঠছে। আমাদের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মনে কেবলই রয়ে রয়ে বাজছে বিদায়ের করুণ সানাই। আপনার পানে চেয়ে মনে হচ্ছে–

"ঐ ব্যথাতুরা আঁখি কাঁদো কাঁদো মুখ,
দেখি আর শুধু হু হু করে বুক।"

হে মহান কর্মবীর,

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা আপনার মতো একজন কর্মঠ, উদারচিত্ত, সুদক্ষ ও প্রজ্ঞাবান শিক্ষকের পদপ্রান্তে বসে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছি। আপনার কাছ থেকে আমরা কোনোদিন কোনো কিছুর অভাব বোধ করিনি। সবসময় পাখির ছানার মতো আগলে রেখেছেন আমাদেরকে। আমাদের স্মৃতির রাজ্যে আপনি অমর, অক্ষয় ও চিরঞ্জীব! প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনার দেওয়া আলো থেকে আমরা আলো ছড়াব দিক–দিগন্ত।

হে আদর্শ শিক্ষাদাতা

শিক্ষকতার মতো একটি মহান পেশাকে ব্রত হিসেবে নিয়ে যেভাবে আপনি সারা জীবন দেশ ও দশের সেবা করেছেন, সেজন্য আমরা গর্বিত। আমরা আজীবন মনে করব আপনি আমাদেরই লোক। আমরা এ কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করব যে, আপনি কথাবার্তায়, কাজে–কর্মে, মেধা ও মননে ছিলেন একজন আধুনিক লোক। আমাদের এই ঘুণেধরা শিক্ষাব্যবস্থায় আপনার মতো আদর্শ শিক্ষকের বড় প্রয়োজন। আমাদের কষ্ট এই যে, আমরা একজন গুণী লোককে হারালাম।

হে আলোর দিশারি!

আপনার বিদায় বেলায় আমাদের মানসপটে অসংখ্য স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে। মনে পড়ে, কত সময় আপনার সাথে অন্যায় আচরণ করেছি, আপনাকে দুঃখ দিয়েছি। আশা করি আপনি আপনার মহান ঔদার্য দ্বারা সেগুলো ক্ষমা করবেন। আর আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন যাতে ভবিষ্যতে আমরা আপনার নির্দেশিত পথে চলতে পারি।

পরিশেষে, পরম করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা করছি আপনার ভবিষ্যৎ জীবন সুখী ও সুন্দর হোক।

আপনার গুণমুগ্ধ,
আলফাডাঙ্গা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।
তারিখ : ১৫ জুন, ২০১৬

২. তোমাদের বিদ্যালয়ের নতুন প্রধান শিক্ষকের যোগদান উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা করো। [ঢা. বো. ১৩, ০৯]

মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের নবাগত প্রধান শিক্ষক জনাব মাহমুদুল হক সাহেবের যোগদান উপলক্ষে–

॥ শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥

হে বরেণ্য শিক্ষক,

নিসর্গের আঙিনাজুড়ে আজ নতুন সাজ। প্রবহমান বাতাস তাই সুরভিত, চারদিক কল–কাকলিতে মুখর। খুশির ঝরনাধারায় স্নাত এদিন এক শুভ সূচনার বার্তা বয়ে এনেছে। এই বিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসেবে আপনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আমাদের আনন্দিত হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করবন।

হে নবাগত শিক্ষাগুরু!

আপনার মতো একজন শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্য আমরা পেতে যাচ্ছি এ আনন্দে আমরা উদ্বেলিত। আপনার মহান শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত হব, আপনার মহিমায় মহিমান্বিত হব, আপনার আলোকোজ্জ্বল জ্ঞানের প্রদীপে আলোকিত হব। আমরা পথ চলব আপনার শেখানো আদর্শকে বুকে ধরে। আপনার প্রেরণা আমাদের জোগাবে নতুন উৎসাহ।

হে জ্ঞানতাপস

আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। আপনার মতো একজন মহান শিক্ষাগুরুর পদপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভের সুযোগ পেতে চলেছি– এ আমাদের পরম

সৌভাগ্য। আপনার আগমনে এ বিদ্যাপীঠের বিশাল শূন্যতা পূরণ হলো। আজ আমরা ধন্য ও গর্বিত। আপনি আমাদের হৃদয়ের জঞ্জাল দূর করে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে দেবেন। আমরা আজ আপনাকে আশ্রয় ও ছায়ারূপে পেয়েছি। আপনার মূল্যবান শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের নতুন পৃথিবীর সন্ধান দেবে। আপনার আগমনে আমাদের একমাত্র উপঢৌকন শ্রদ্ধা ছাড়া কিছুই দিতে পারলাম না। এটুকুই আপনি সাদরে গ্রহণ করবেন।

হে কর্মচঞ্চল বীর!

ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যালয়ের আমরা হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী তাকিয়ে আছি আপনারই মুখপানে। আপনার যোগ্য নেতৃত্ব দেবে আমাদেরকে আলোর পথের ঠিকানা। আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার মুখ উজ্জ্বল করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব এবং বিদ্যালয়ের জন্য সুনাম বয়ে আনব।

হে পরম সুহৃদ,

আপনি আমাদের শিক্ষাগুরু, আমরা আপনার শিষ্য। তারুণ্যের প্রগলভতা, বয়সের চাপল্য কখনও আপনার বিরক্তির কারণ হতে পারে। আপনার উদার হৃদয়ের সীমাহীন স্নেহ আমাদের চাঞ্চল্যকে সংযত করে যথার্থ পথের সন্ধান দিয়ে সাফল্যের পথে পরিচালিত করুক। তারুণ্যের মাঝে নিহিত শক্তির উন্মেষ ঘটুক আপনার স্নেহস্পর্শে। এ প্রতিষ্ঠানে আপনার অবস্থান সুন্দর হোক, সার্থক হোক– এ আমাদের হৃদয়ের একান্ত কামনা।

পরিশেষে পরম করুণাময় মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

বিনয়াবনত

মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

১১ ডিসেম্বর, ২০১৬

৩. বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা উপলক্ষে একখানি অভিনন্দন–পত্র রচনা করো।

দেশবরেণ্য মুক্তিযোদ্ধাদের .... আগমন উপলক্ষে

অভিনন্দন

হে দেশের সূর্যসন্তান,

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের কিংবদন্তির মহানায়ক তোমরা। তোমাদের কীর্তি কখনো ভোলার নয়। এদেশবাসী সোনার হরফে লিখে রাখবে তোমাদের নাম। আজ তোমাদের আগমনে এই এলাকার সর্বত্র জেগেছে নব প্রাণের স্পন্দন। আজ আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়তনে গভীর আনন্দে আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

হে বীর সেনানীরা!

তোমরা ইতিহাসস্রষ্টা। তোমাদের সুদক্ষ রণকৌশল, চেতনাশক্তি, সাহসী ভূমিকা আর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব জাতিকে দিয়েছে মুক্তির স্বাদ। দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার প্রত্যয়ে তোমাদের এমন বীরত্বপূর্ণ ভূমিকায় আমরা গর্বিত।

হে মহান দেশপ্রেমিকেরা!

দেশাত্মবোধের মহান প্রেরণাকে বুকে ধারণ করে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে মুক্তির সংগ্রামে। দেশ এবং জাতির প্রতি তোমাদের এই আমরা আত্মত্যাগ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। এ দেশের প্রতিটি মানুষের মনে তোমাদের ত্যাগের স্মৃতি রইবে অম্লান।

হে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরেরা!

বাংলার মুক্তিসংগ্রামে সমগ্র প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে মৃত্যুকে পদদলিত করে যুদ্ধ করেছ তোমরা। পাক–হানাদারদের সুদক্ষ বাহিনীর মুখোমুখি হতেও পিছপা হওনি তোমরা। মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও এগিয়ে গিয়েছিলে সেদিন। ফিরে এসেছ মৃত্যুঞ্জয়ীর বেশে। তোমাদের এই অবদান চির–ভাস্বর হয়ে থাকবে জাতির মানসভূমে। তোমরা আমাদের চেতনা, তোমরা আমাদের সঞ্জীবনী সত্তা।

হে সুমহান নেতৃবৃন্দ!

তোমাদের আগমন আমাদের এতটাই বিমোহিত করেছে, যা বোঝানোর কিংবা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। তোমাদের কী দিয়ে বরণ করে নেব সেটাও যে ভুলে গেছি আজ। আজ এমন দিনে, এমন একটি ক্ষণে তোমাদের প্রতি রইল আমাদের অন্তহীন ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার্ঘ্য। তোমাদের আগমন আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

পরিশেষে, মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে বিনীত নিবেদন করছি তিনি যেন তোমাদের সুদীর্ঘ জীবন দান করেন। তোমাদের অনাগত দিনগুলো যেন সুখের হয় সে প্রত্যাশাই করব আজীবন। খোদা হাফেজ।

বিনয়াবনত–

তোমাদের গুণমুগ্ধ

তারাগুনিয়ার সর্বস্তরের জনতা

তারিখ : ৩০শে মে, ২০১৬।

৪. তোমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা করো।

অথবা, তোমার বিদ্যালয়ে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা করো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

জনাব **নুরুল ইসলাম নাহিদ**–এর শুভাগমন উপলক্ষে

॥ শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥

হে বরেণ্য!

আপনার পদধূলি পেয়ে আমাদের এলাকা আজ উজ্জীবিত। আপনাকে একনজর দেখার জন্য প্রত্যন্ত জনপদ থেকে ছুটে এসেছে হাজার হাজার মানুষ। আপনার মূল্যবান বাণী শোনার জন্য চাতকের মতো উন্মুখ শত–সহস্র জনতা। আপনি আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে শিক্ষানুরাগী!

আমাদের এ দরিদ্র দেশের বেশিরভাগ মানুষ এখনো শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এসব নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার যে কঠিন দায়িত্ব আপনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন, সেজন্য আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই। আমরা আশা করি আপনার যোগ্য নেতৃত্বই এ জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করবে। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, জ্ঞানের যে মশাল আপনি জ্বালিয়েছেন, তার আলোতে সমগ্র বাংলাদেশ আলোকিত হবে।

হে দেশপ্রেমিক,

আপনি শিক্ষাক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তা অনস্বীকার্য। আপনার নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর সাধনায় শিক্ষাব্যবস্থায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আপনার কাজের সুরভি আজ ছড়িয়ে পড়েছে দেশ–দেশান্তরে। দেশবাসী আজ আপনার কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

হে আলোর দিশারি,

আপনি আমাদের পরম আপনজন বলে আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। নানা সমস্যার যাঁতাকলে পিষ্ট আমাদের এ বিদ্যালয়টি। শিক্ষাব্যবস্থার সর্বত্র উন্নয়নের ছোঁয়া ও আপনার প্রশংসনীয় উদ্যোগের কথা শুনে আজ আমরা আশাবাদী হয়ে উঠেছি। তাই এই বিদ্যালয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানকল্পে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

- সারা বিশ্ব বিজ্ঞানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এ বিদ্যালয়ে কোনো বিজ্ঞানাগার নেই। তাই এতে আপনার আন্তরিক হস্তক্ষেপ কামনা করছি।
- খেলাধুলা ও পড়াশোনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, খেলাধুলার জন্য এ বিদ্যালয়ে নিজস্ব কোনো মাঠ না থাকায় আমরা খেলাধুলা করার কোনো সুযোগ পাচ্ছি না। তা একটি মাঠ নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।
- আমাদের বিদ্যালয়ে প্রায় এক হাজার ছাত্র–ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। কিন্তু এ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত বই না থাকায় ছাত্র–ছাত্রীদের পড়াশোনা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে দৃষ্টি রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।
- শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও সুকুমার বৃত্তি লালনের জন্য বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম প্রয়োজন। কিন্তু এ বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যচর্চার জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাব রয়েছে। তাই প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্যে অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সমস্ত বিষয় আপনার সদয় বিবেচনা লাভ করবে এবং অবিলম্বে সমস্যাসমূহের সমাধান করে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। পরিশেষে পরম করুণাময় মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

বিনয়াবনত

পাটুয়াকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

০২/০৫/২০১৬।

৫. তোমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একজন প্রখ্যাত লেখক বা কবির শুভাগমন উপলক্ষে একটি অভিনন্দনপত্র রচনা করো।

কবি আল মাহমুদের শুভাগমন উপলক্ষে অভিনন্দনপত্র

হে কবি!

সভ্যতার সকল প্রকার প্রাণহীন কৃত্রিমতা হতে বহু দূরে অবস্থিত এই পল্লির আহ্বানে তুমি সাড়া দিয়েছ। আশা করি, তোমার কাব্য প্রেরণার মূলে এটি হয়তো খানিকটা রস সিঞ্চন করবে। কারণ, তুমি শহরের কবি নও, তুমি প্রকৃতপক্ষে পল্লির অসংখ্য মানুষের কবি, তোমাকে আমাদের হৃদয় নিংড়ানো অভিবাদন জানাই।

হে মহাজ্ঞানী!

কাব্য ও কবিতার ভেতর দিয়ে তোমার সাথে আমাদের যে পরিচয় ঘটিয়েছিল, তা আজ আরও নিবিড় ও মধুর হলো। এরপরে তোমাকে হয়তো নিজেদের মধ্যে এমন করে পাব না, কিন্তু তোমার কবিতা আমাদের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ, আরও মাধুর্যমণ্ডিত করবে। তোমার কবিতার জাদুস্পর্শে যে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে, যে আম্রমুকুলকে ঘিরে মৌমাছি গুঞ্জন করে উঠবে, চৈত্র–সন্ধ্যাকে মুখরিত করে যে কোকিল ডেকে উঠবে, সে ফুল, সে আম্রমুকুল, সে কোকিলকে তো আমরা প্রত্যক্ষ করব আমাদেরই চারিপাশে। তখন নতুন করে ধরণীর সাথে আমাদের যে পরিচয় ঘটবে সেই নতুন পরিচয়ের অপরিসীম আনন্দের কথা কল্পনা করে আজ তোমাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে পল্লির শ্রীহীন অবস্থা নিদারুণ হয়ে উঠেছে। এই নিষ্ফলতার মধ্যে তুমি স্মরণ করিয়ে দিয়েছ, পল্লিগুলো জীর্ণ পাতার মতো প্রাণহীন আবর্জনা নয়, জাতীয় জীবনের দিক হতে এদের একটি বিশেষ মূল্য আছে। নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিলাম, তোমার অমৃতময় করস্পর্শে আমরা নিজেদের ফিরে পেয়েছি। আমাদের সম্মুখে তুমি অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছ। আমাদের অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা তুমি গ্রহণ কর।

হে সংগ্রামী কবি!

তোমার সারাটা জীবন সংগ্রামের এক উজ্জ্বল খতিয়ান। অন্যায়, অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে তোমার দৃপ্ত পদচারণ এখনও আমাদের আন্দোলিত করে। আধুনিক প্রগতিশীল সমাজ এবং অসাম্প্রদায়িক কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে তুমি যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছো তা জাতি চিরদিন স্মরণ করবে। তোমার মুখ থেকে নিঃসৃত বাণী এখনো জাতিকে দিচ্ছে পথের দিশা। এ জাতি কোনো দিন তোমাকে ভুলবে না।

হে দরদি বন্ধু!

আজ আমাদের আয়োজনে অনেক ত্রুটি রয়ে গেল, কিন্তু আমরা জানি আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলো তুমি উপেক্ষা করবে। তুমি বাইরের আয়োজনকে বাদ দিয়ে আমাদের অন্তরের ভাষাতীত প্রীতি গ্রহণ করবে। এখানে আসার কষ্ট ও অসুবিধা হাসিমুখে সহ্য করে তুমি নিজের উদারতারই পরিচয় দিয়েছ।

সৃষ্টিকর্তার নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি, দীর্ঘ জীবন লাভ করে সুস্থ দেহে তোমার কবি–প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লাভ হোক; জাতি ও দেশ তোমার অপূর্ব অবদানে শক্তিশালী হয়ে উঠুক। তোমার চলার পথ আরো মসৃণ হোক।

ইতি

গুণমুগ্ধ

ফুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীবৃন্দ

থানা– উলরাপাড়া

জেলা– সিরাজগঞ্জ।

৬. এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা করো।
[ঢা. বো. ১২]

ফিলিপনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের

বিদায় উপলক্ষে মানপত্র

বিদায়ী বন্ধুরা,

যে পথ একদিন তোমাদের নিয়ে এসেছিল এই অজ্ঞানে সে পথই আবার তোমাদের দিয়েছে ডাক। একদিকে চলার নেশা আর একদিকে পিছুটান! বেহাগ রাগিণীতে বাজছে বিদায়ের সুর। সে সুর এখন ধ্বনিত হচ্ছে এই বিস্তৃত প্রাঙ্গণে উপস্থিত প্রতিটি প্রাণে।

সম্মুখ পথের পথিকেরা,

এখানে তোমাদের কেটেছে স্মৃতিমধুর প্রীতিময় অনেকগুলো দিন। নিরলস শ্রম, কঠোর অধ্যবসায় ও আন্তরিক আগ্রহে নিজেদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ার সাধনায় তোমরা ছিলে সচেষ্ট। তোমাদের প্রাণোচ্ছল সাহচর্য আর শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের প্রীতিস্নিগ্ধ শিক্ষায় বিদ্যালয়ের দিনগুলো হয়েছে ঐতিহ্যময়। ভাই–বোনের মধুর স্নেহডোরে বেঁধেছিলে আমাদের। আজ ভবিষ্যতের সিঁড়িতে তোমরা যখন প্রজ্ঞার ছায়া ফেলতে যাচ্ছো তখন বলি, – এই বিদ্যালয়ের স্মৃতিময় দিনগুলো তোমরা যেন ভুলে না যাও। যেন না ভোল প্রিয় শিক্ষক–শিক্ষিকাদের ঐকান্তিক অবদানের কথা। এই বিদ্যানিকেতনের অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য যেন হয় তোমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রেরণা।

সূর্যশিখা ভাইবোনেরা,

লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের দেশ আজ স্বাধীন। দারিদ্র্য, অশিৰা, সংকীর্ণতা, পশ্চাৎপদতার আঁধার এখনও দেশ থেকে ঘোচেনি। নতুন শতাব্দীর অগ্রপথিক তোমরা। বিশ্বায়নের নবদিগন্তে এদেশে নব নব অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জনে তোমরা আমাদের প্রেরণা হবে এই প্রত্যাশা নিয়ে কামনা করব : মহৎ আদর্শে নতুন দেশ ও নতুন বিশ্ব গড়ার সাধনায় তোমরা সফল হও।

তোমরা দেশের হও, দশের হও, বিশ্বের হও। তোমাদের চিন্তা ও কর্ম হোক– দেশব্রতী কর্মীর, সৃষ্টিশীল কারিগরের, মানবমুক্তির সৈনিকের।

তোমরা সার্থক হও। তোমাদের সাধনা হোক দেশ ও জাতির ঐতিহ্য, গর্ব ও ইতিহাস।

তোমাদের সাথি

ছাত্র–ছাত্রীবৃন্দ

ফিলিপনগর উচ্চ বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

২৫শে জানুয়ারি, ২০১৬।

❑ নিমন্ত্রণপত্র

১. তোমার স্কুলে 'নজরুল জন্মজয়ন্তী' উদ্‌যাপন উপলৰে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা করো।

সুধী,

আগামী ১১ই ভাদ্র, ১৪২২ / ২৯শে আগস্ট, ২০১৬, শনিবার বিকাল চারটায় বিদ্রোহী ও আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৬তম জন্মজয়ন্তী উপলৰে হরিপুর উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন বরেণ্য কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক। সভাপতিত্ব করবেন প্রধান শিৰক সরোজ কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

বিনীত–

তারিখ : ২৫.০৮.২০১৬ ফরিদ আহমদ সলিল

আহ্বায়ক

নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন পরিষদ

হরিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা।

অনুষ্ঠানসূচি

০৪. ০৫ : অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ

০৪. ১৫ : বিশেষ আলোচনা

০৫. ০০ : প্রধান অতিথির ভাষণ

০৫. ৩০ : সভাপতির ভাষণ

০৬. ০০ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

২. ধরো, তোমাদের পাড়ায় "মৈত্রী সংঘ" নামে একটি ক্লাব আছে। ক্লাবের পৰ থেকে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলৰে একটি নিমন্ত্রণপত্র রচনা করো।

প্রিয় সুধী,

শুভ 'নববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলৰ্যে আগামী ১লা বৈশাখ, ১৪২৩ /১৪ই এপ্রিল, ২০১৬, মঙ্গলবার সকাল ০৭টায় 'মৈত্রী সংঘের' পৰ থেকে এক বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।

বিনীত–

তারিখ : ১০.০৪.২০১৫ অরিন্দম খালেক

সাংস্কৃতিক সম্পাদক

আঞ্চলিক মৈত্রী সংঘ, সিলেট।

অনুষ্ঠানসূচি

০৬.৩০ : মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি

০৭.৩০ : সংঘ-প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা শুরু; এলাকা পরিভ্রমণ

০৯.০০ : সংঘের মিলনায়তনে প্রীতিভোজ

১০.০০ : মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১২.০০ : সমাপ্তি।

৫. প্রতিবেদন

প্রতিবেদন : প্রতিবেদন বলতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানভিত্তিক বিবরণী বোঝায়। কোনো ঘটনা, তথ্য বা বক্তব্য সম্পর্কে সুচিন্তিত বক্তব্য প্রদানই প্রতিবেদন। প্রতিবেদন কথাটি ইংরেজি রিপোর্ট কথাটির বাংলা পারিভাষিক শব্দ। সাধারণত কোনো বিষয়ের তথ্য–উপাত্ত, সিদ্ধান্ত, ফলাফল ইত্যাদি খুঁটিনাটি অনুসন্ধানের পর বিবরণী তৈরি করে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোনো কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য : প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করা। এর বক্তব্য হবে নিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য অনুসারী। এতে জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা থাকবে। প্রতিবেদনে কোনো বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন কাজের সমন্বয় সাধন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

প্রতিবেদনের শ্রেণিবিভাগ :

প্রতিবেদনকে নির্দিষ্টভাবে শ্রেণিবিভাগ করা সম্ভব নয়, কেননা বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুযায়ী প্রতিবেদনও নানা প্রকার হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রেৰাপটে প্রতিবেদনকে নানা নামে ও বিশেষণে অভিহিত করা হয়। তবে মোটাদাগে প্রতিবেদনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. **সংবাদ প্রতিবেদন :** সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো ঘটনাসম্পর্কিত প্রতিবেদনকে সংবাদ প্রতিবেদন বলে। নিজস্ব সংবাদদাতা বা প্রতিবেদক এবং বিভিন্ন দেশি–বিদেশি সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে এসব সংবাদ সংগ্রহ করা হয়।

২. **দাপ্তরিক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন :** দাপ্তরিক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন এমন এক ধরনের বিবরণ যাতে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ঘটনা, স্থান, অবস্থা প্রভৃতি বিষয় যাচাই করে সে–সম্পর্কিত তথ্য, তত্ত্ব, উপাত্ত তুলে ধরা হয়। দাপ্তরিক প্রতিবেদন দুই ধরনের হয়। যেমন : (ক) তদন্ত প্রতিবেদন : এটি কোনো ঘটনা, দুর্ঘটনা, গোলযোগ, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ তদন্ত সাপেৰে প্রকাশ করা হয়। (খ) কারিগরি প্রতিবেদন : এটি সাধারণত উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয়, প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা, জনস্বার্থে অবদান, অর্থনৈতিক লাভালাভ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনের উপযোগিতা :

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রতিবেদনের সীমা–পরিসীমা যেমন তেমনি এর উপযোগিতা ও গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ বা বিবরণের জন্য প্রতিবেদনের কোনো বিকল্প নেই। প্রতিবেদনে কোনো বিশেষ ঘটনা বা বিষয়কে সরেজমিনে তদন্ত করে পরীৰা ও

পর্যবেক্ষলব্ধ ফলাফল প্রকাশ করা হয় বলে, তা থেকে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি তথ্য অবগত হওয়া যায়। কর্তৃপক্ষও সহজে সেই প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিরূপণ, সমন্বয়সাধন ইত্যাদি কাজে সহায়তা পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা, নীতি নির্ধারণে প্রতিবেদন সহায়ক হয়।

একটি সাধারণ প্রতিবেদনের কাঠামো বা অংশবিভাজন

একটি প্রতিবেদনকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

১. শিরোনাম ২. সূচনা অংশ ৩. বিষয়বস্তু ৪. প্রতিবেদকের নাম–ঠিকানা, স্বাক্ষর ও অন্যান্য বিষয়।

১. **শিরোনাম :** প্রতিবেদনের শিরোনাম আকর্ষণীয় হতে হবে। প্রতিবেদনের যেটা সারাংশ, কিংবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা প্রতিবেদনের যেটা জরুরি অংশ সেটাই শিরোনাম হবে। শিরোনাম যথাসম্ভব ছোট রাখা আবশ্যক।

২. **সূচনা অংশ :** প্রতিবেদনের যেটা একেবারে সূচনাংশ তা প্রতিবেদনের বাকি অংশের তুলনায় গুরুত্ব বেশি। তার কারণ, এটির দ্বারা আকৃষ্ট হলে তবেই একজন পাঠক গোটা খবরটি পড়তে উৎসাহী হবেন। সূচনা অংশ এমনভাবে লেখা উচিত যেন প্রতিবেদনের বাদ বাকি অংশ সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত হয়।

৩. **বিষয়বস্তু :** এ অংশে প্রতিবেদনের শিরোনাম অনুযায়ী বিষয়বস্তুর তথ্যনির্ভর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা থাকবে। অর্থাৎ 'কে, কী, কেন, কবে ও কোথায়, এসব প্রশ্নের মাধ্যমে প্রতিবেদনের মূল বিষয়গুলো খুঁজে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রেখে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ছাঁটাই করতে হবে এবং তথ্যনির্ভর সংবাদ উপস্থাপন করতে হবে।

৪. **প্রতিবেদকের নাম–ঠিকানা, স্বাক্ষর ও অন্যান্য বিষয় :** এ অংশে প্রতিবেদকের নাম–ঠিকানা, স্বাক্ষর, প্রতিবেদন তৈরির সময়, সংযুক্তি (কোনো প্রকার ছবি বা ডকুমেন্ট ইত্যাদি), তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রতিবেদন রচনায় অনুসরণীয় বৈশিষ্ট্য

১। **সুনির্দিষ্ট কাঠামো :** কোনো প্রতিবেদন প্রণয়নকালে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসারে করতে হয়। এতে থাকবে একটি শিরোনাম, প্রাপকের নাম–ঠিকানা, আলোচ্য বিষয়ের সূচিপত্র, বিষয়বস্তু, তথ্যপঞ্জি, স্বাক্ষর, তারিখ ইত্যাদি।

২। **সঠিক তথ্য :** প্রতিবেদন রচিত হবে সঠিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। তথ্যানুসন্ধানই হলো প্রতিবেদকের প্রধান কাজ। সেজন্য তথ্যের যথার্থতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৩। **সম্পূর্ণতা :** প্রতিবেদনে যেসব তথ্য পরিবেশিত হবে তা হতে হবে নির্ভুল ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

৪। **স্পষ্টতা :** প্রতিবেদনের বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্টতা থাকবে যাতে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ সহজ হয়।

৫। **সংক্ষিপ্ততা :** প্রতিবেদন হতে হবে বাহুল্যবর্জিত। বক্তব্য হবে সুনির্বাচিত এবং কোনো অনাবশ্যক বক্তব্য সংযোজিত হতে পারবে না।

৬। **সুন্দর উপস্থাপনা :** প্রতিবেদনের উপস্থাপন হতে হবে আকর্ষণীয়। এর বক্তব্য যেন সহজ–সরল ভাষায় প্রকাশ পায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৭। **সুপারিশ :** প্রতিবেদনের উপসংহারে সুপারিশ সংযোজন করতে হবে, যাতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

১. তোমার এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর :

জুরাইন এলাকার আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির করুণ চিত্র

বিশেষ প্রতিবেদক : জুরাইন ঢাকার একটি স্বনামধন্য এলাকা। এখানে প্রায় ৩০ হাজার লোক বাস করে। অভিজাত এলাকা হওয়ায় এখানে বসতি গড়ার প্রতি অনেকেরই আগ্রহ রয়েছে। মানুষের চাহিদার দিকে খেয়াল রেখে এখানে নতুন নতুন আবাসন প্রকল্পও গড়ে উঠছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমানে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। গত দুই মাসে জরিপ করে দেখা যায়, এখানে ইতোমধ্যে প্রায় ৪টি ধর্ষণ, ২টি শিশু নির্যাতন এবং ১৫টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, টাকা ইত্যাদি মূল্যবান সম্পদ হারানো এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এলাকায় ক্ষমতাবান রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দৌরাত্ম্য চোখে পড়ার মতো। অবৈধভাবে জমি দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ইত্যাদি ঘটনারও তথ্য পাওয়া যায়। এসব ব্যাপারে জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকে। পুলিশের কাছে সহায়তা চাইলেও কার্যকরী সহায়তা পাওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

ধর্ষণের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে অনেক পিতা–মাতাই মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে তারা অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। এর পাশাপাশি যে কয়েকটি শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে তাও অত্যন্ত দুঃখজনক। বাসার গৃহপরিচারিকার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেও নির্যাতনকারীরা অর্থের জোরে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। এতে করে এলাকায় অনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও বাড়তে পারে বলে মত দিয়েছেন সুশীল সমাজ।

অনতিবিলম্বে যদি জুরাইন এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনা যায় তবে এলাকাবাসীকে চরম পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে সরকার এবং সাধারণ জনগণের একত্রিত অংশগ্রহণ আবশ্যক। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই উক্ত এলাকার সকল অনিয়ম ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

প্রতিবেদক

শরিফুন নাহার

জুরাইন, ঢাকা।

১৩/৫/২০১৬

[পত্রিকার ঠিকানাসংবলিত খাম আঁকতে হবে]

২. কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আয়োজিত মহান একুশে ফেব্রুয়ারি–২০১৫–এর উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর :

মাননীয়

প্রধান শিক্ষক,

কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

টিকাটুলি, ঢাকা।

বিষয় : বিদ্যালয় আয়োজিত মহান একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানমালা বিষয়ে প্রতিবেদন।

জনাবা,

কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করলাম।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি–২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। প্রভাতফেরি,

পুষ্পস্তবক অর্পণ, কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, নৃত্য, আলোচনাসভা ইত্যাদি আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়। প্রধান শিক্ষিকা জোবায়দা আকতারের নেতৃত্বে ভোর ৬টায় ব্যানার-ফেস্টুনসংবলিত প্রভাতফেরি বিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী শহিদ মুরাদ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এরপর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্থাপিত শহিদ মিনারে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। সকলেই সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।'

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ভাষা দিবসের ওপর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকমণ্ডলী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা সভাস্থলে আসন গ্রহণ করেন। একের পর এক শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করে কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্য। তারপর শুরু হয় আলোচনা সভা। প্রধান শিক্ষিকার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন ৭৫ নং ওয়ার্ড ডিসিসি কমিশনার জয়নুল হক মঞ্জু, সমাজসেবী সাব্বির আহমেদ আরিফ ও মোজাম্মেল হক মুক্তা। প্রধান অতিথি চিত্রাঙ্কনে বিজয়ীদের হতে পুরস্কার তুলে দেন। পরে সভাপতি দিনব্যাপী আয়োজনে উপস্থিতি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানটি বাংলা ভাষা ও শহিদদের প্রতি আমাদের মাঝে গভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে।

প্রতিবেদক

মাধবী আকতার

দশম শ্রেণি

বিজ্ঞান শাখা, রোল-১১

২৪/০২/২০১৬

[এখানে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাসংবলিত খাম আঁকতে হবে]

৩. তোমার বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর :

বরাবর,

সভাপতি

পরিচালনা পর্ষদ

ঘিওর ডিএন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ।

বিষয় : বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে প্রতিবেদন।

জনাব,

ঘিওর ডিএন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতির বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে নিম্নোক্ত প্রতিবেদন আপনার সমীপে উপস্থাপন করলাম।

শিক্ষার পরিবেশ নেই ঘিওর ডিএন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে

ঘিওর উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঘিওর ডিএন উচ্চ বিদ্যালয়টি উপজেলার শীর্ষস্থানীয় একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অর্ধশতাধিক বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি এলাকার শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখে আসছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কিছু অব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্তহীনতায় বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ও লেখাপড়ার মান দিন দিন নিম্নমুখী হচ্ছে। সমস্যাগুলো নিচে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো :

১. **সময় ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম :** বিদ্যালয়ে বেশ কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা দেরিতে উপস্থিত হন। নির্দিষ্ট সময়ে তাদের অনুপস্থিতির ফলে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে হইচই ও হট্টগোল করতে থাকে। ফলে শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। অভিভাবকরা এ নিয়ে অভিযোগ করলেও কোনো ফল হয়নি।

২. **অনুপযোগী শ্রেণিকক্ষ :** শ্রেণিকক্ষগুলো প্রতিদিন যথাযথভাবে পরিষ্কার করা হয় না। বেশ কয়েকটি শ্রেণিকক্ষের হোয়াইট বোর্ড ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে পাঠদান কার্যক্রম মারাত্মভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ভাঙা বেঞ্চগুলোর দ্রুত মেরামত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

৩. **অব্যবস্থাপনাপূর্ণ পাঠাগার :** অব্যবস্থাপনায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে বিদ্যালয়ের পাঠাগার কক্ষ। বইয়ের সংখ্যা অপ্রতুল। ইস্যুকৃত বইগুলো ফেরতের যথাযথ উদ্যোগ না নেওয়ার ফলে দিন দিন বইয়ের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এসব কারণেই জরুরি ভিত্তিতে পাঠাগার ব্যবস্থাপনায় যথাযথ শৃঙ্খলা আনা একান্ত প্রয়োজন।

৪. **সুযোগ-সুবিধাহীন বিজ্ঞানাগার :** বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই। ফলে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা দায়সারাভাবে ব্যবহারিক ক্লাস সম্পন্ন করে। একটু নজর দিলেই যেখানে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব। সেখানে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। হাতে-কলমে শেখার পরিবর্তে তা হচ্ছে সাধারণ পাঠদানের মতো করেই। রসায়ন, পদার্থ ও জীববিজ্ঞানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা থেকে যাচ্ছে অপূর্ণাঙ্গ। এ অবস্থা থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করা প্রয়োজন।

৫. **প্রশাসনিক কজে বিশৃঙ্খলা :** শিক্ষার্থীদের ভর্তি, বেতন গ্রহণ, ছাড়পত্র প্রদান, প্রশংসাপত্র ইস্যু, রেজিস্ট্রেশনসহ বিভিন্ন বিষয়ে সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ সহাযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন বেশ কিছু অভিভাবক।

৬. **জাতীয় দিবস পালনে অনীহা :** বর্তমানে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় দিবস পালনের কোনো কর্মসূচি নেওয়া হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে জাতীয় চেতনাবোধ জাগ্রত হচ্ছে না। কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে যথাযথভাবে ধারণ করার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে জাতীয় দিবসসমূহ পালন করার যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

ঐতিহ্যবাহী ঘিওর ডিএন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে উল্লিখিত বিষয়গুলোতে কর্তৃপক্ষের মনযোগ দেওয়া এখন সময়ের দাবি।

প্রতিবেদক

মিথুন কামাল, প্রতিবেদক–

নবম শ্রেণি, মানবিক শাখা

রোল নং-১৫

১৮/১০/২০১৬।

[এখানে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাসংবলিত খাম আঁকতে হবে]

৪. তোমার স্কুলে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রচনা করো। [দি. বো. ১৫]

উত্তর :

তারিখ : ২০/০৩/২০১৬

বরাবর

প্রধান শিক্ষক,

মনোহরদি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

মনোহরদি, নরসিংদী

বিষয় : স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান-সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

জনাব,

আপনার আদেশক্রমে স্কুলে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলৰে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য পেশ করছি।

মনোহরদি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ই মার্চ মনোহরদি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ক্রীড়া শিৰক সোবহান চৌধুরীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুন্দরভাবে পরিচালিত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। অন্যবারের তুলনায় এবার এই স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয় যেমন ছিল অনেক, তেমনি ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ, যে জন্য সব শিৰার্থীই কমবেশি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল।

সকাল নয়টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের সম্মানিত প্রধান শিৰক। প্রধান অতিথি ছিলেন দেশবরেণ্য ক্রীড়াবিদ জোবায়রা রহমান লিনু। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষিত হয়।

এবারের প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো ছিল বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিশটিরও বেশি বিষয়ে শিৰার্থীরা অংশগ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রকমের দৌড়, দীর্ঘলাফ, উচ্চলাফ, বর্শা নিৰেপ, চাকতি নিৰেপ, লৌহগোলক নিৰেপ, প্রতিবন্ধক দৌড়, দ্রুত হাঁটা, সাইকেল দৌড় ইত্যাদি ছিল অন্যতম। পুরুষ অতিথিদের জন্য ছিল 'অন্ধের হাঁড়ি ভাঙা খেলা' এবং আমন্ত্রিত মহিলাদের জন্য ছিল 'মিউজিক্যাল চেয়ার'। এ খেলা দুটি খুবই উপভোগ্য হয়েছে। শিৰকগণের জন্য ছিল উল্টো দৌড়। শিৰিকাগণের জন্য ছিল 'সুঁইয়ে সুতা গাঁথা'। সবশেষে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ এবং শিৰকগণের মধ্যে 'রশি টানাটানি' হয়। এ খেলাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হয়। দর্শকদের মাঝে এটি ভিন্ন মাত্রার আনন্দ দেয়।

প্রতিযোগিতা শেষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেক বিজয়ীকে একটি করে ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রাজা মিয়া চারটি ইভেন্টে প্রথম হয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর সম্মান অর্জন করে। মেয়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর কৃতিত্ব অর্জন করে দশম শ্রেণির ছাত্রী সুরাইয়া খাতুন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলৰে এবার বিদ্যালয়ের বিশাল মাঠ যেভাবে সাজানো হয়েছিল তা সবার দৃষ্টি কেড়েছে। তাছাড়া এবারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনও ছিল অত্যন্ত চমৎকার। ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন, পায়রা ওড়ানো, মশাল প্রজ্বলন, প্রতিযোগীদের কুচকাওয়াজ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। 'যেমন খুশি তেমন সাজো' এই খেলায় যারা অংশ নিয়েছে তারাও অত্যন্ত রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছে। এছাড়া অনুষ্ঠানের ধারাবর্ণনা ছিল চমৎকার।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে ছাত্র-ছাত্রী, শিৰক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ সকলেই আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি শিৰার্থীদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য রেখেছেন তা অবশ্যই তাদেরকে উৎসাহ, আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

এ কথা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে, এবারের ক্রীড়ানুষ্ঠান স্কুলে সুনাম বৃদ্ধি করেছে এবং সহশিৰা কার্যক্রমের চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করতে সৰম হয়েছে।

বিনীত প্রতিবেদক
কামরুল আহসান
দশম শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ
রোল নং- ১৫

[এখানে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাসংবলিত খাম আঁকতে হবে]

৫. দুর্নীতি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর :

তারিখ : ২৬শে আগস্ট, ২০১৫
বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক
কারওয়ান বাজার,
ঢাকা-১২০৫।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার 'চিঠিপত্র' কলামে প্রকাশের জন্য 'দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চাই' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন পাঠাচ্ছি। সাম্প্রতিক সময়ের গুরুত্ববহ এ বিষয়টির উপযোগিতা বিচার করে আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করবেন বলে আশা করছি।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চাই

দুর্নীতি যেকোনো দেশ ও জাতির উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা। শাসনব্যবস্থাকে ক্রমশ দুর্বল করে দেয় দুর্নীতি। দুরারোগ্যে ব্যাধির মতো দুর্নীতি ধীরে ধীরে গ্রাস করে নেয় সবকিছু। দেশের সকল স্তরে এর ভয়াবহ প্রভাব পড়ে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। প্রতিটি মানুষ দুর্নীতির চক্রে পড়ে নাকাল হয়। উচ্চস্তরের কর্তাব্যক্তিরা দুর্নীতিকে আশ্রয় করে নিশ্চিত জীবনযাপনের প্রয়াস চালায়। কিন্তু তাদের বিলাসিতার চরম মূল্য দিতে হয় সাধারণ মানুষকে। মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করে না। নীরব দর্শকের মতো তারা চুপ করে সহ্য করে যায় শোষণ ও নিপীড়ন। প্রকাশ্যে হোক কিংবা অপ্রকাশ্যে বাড়তি উপার্জনের আশায় প্রায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীই দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। মেধার চেয়ে বর্তমানে অর্থই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে সব ৰেত্রে। কালো টাকার দৌরাত্ম্যে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। দুর্নীতির এমন নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করছে। আমাদের জাতীয় অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে দুর্নীতির কারণে। আমাদের নিশ্চুপ ও নীরব অবস্থান দুর্নীতিকে প্রতিনিয়ত প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতিবাজরা তাই সমাজকে কলুষিত করেই চলেছে।

দুর্নীতি দমনে নিচে উল্লিখিত পদৰেপগুলো জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করা দরকার–

১. দুর্নীতির সথে জড়িত সকল প্রাসঙ্গিক ইস্যু মূল্যায়ন এবং দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য দৰ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ নাগরিকদের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। টাস্কফোর্স দুর্নীতি দমনের একটি বিশদ কর্মসূচি সুপারিশ করবে।

২. দুর্নীতি দমনে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বেশি প্রয়োজন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা থাকতে হবে। তাদের সৎ ও আদর্শবান হতে হবে। দুর্নীতিবাজদের দল থেকে বের করতে হবে। সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে হবে। প্রশাসনে রাজনৈতিক হস্তৰেপ বন্ধ করতে হবে।

৩. দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। এর জন্য দরকার স্বাধীন বিচার বিভাগ। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং কেউ আইনের

ঊর্ধ্বে নয়– সমাজে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হলে, আইনের যথাযথ প্রয়োগ হলে দুর্নীতির পরিমাণ কমে যাবে।

৪. বেসরকারি, সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য বাজারের সাথে সমন্বয় রেখে সুষম বেতন কাঠামো এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে হবে।

৫. দুর্নীতি রোধে স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দুর্নীতি ও নানা অনিয়মের তথ্য অনুসন্ধান এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে গণমাধ্যম দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকার ভূমিকা রাখতে পারে।

৬. দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক ও নৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মানুষের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। কেননা নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারে না। আর এসব দিক বিবেচনায় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সকলের দৃঢ় অবস্থানই পারে বর্তমান দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে। দুর্নীতির চক্রকে ভাঙতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাই সকলকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক–
কাজী মামুনুর রশীদ
কামতা, ফেনী।

[এখানে পত্রিকার ঠিকানাসংবলিত খাম আঁকতে হবে]

৬. বৃক্ষরোপণ অভিযান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

[রা. বো. ১৫, ব. বো. ১৫]

অথবা

বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব বর্ণনা করে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর :

সবুজের অভিযানে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদক : সম্প্রতি কুড়িগ্রাম জেলায় সরকারি উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হলো বৃক্ষরোপণ অভিযান। জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করানোর জন্য এ উদ্যোগ যথেষ্ট ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখেছে।

মাননীয় এমপি মহোদয়ের হাতে বৃক্ষরোপণ অভিযানের সূচনা হয়। তিনি প্রথমে একটি নিমগাছের চারা রোপণ করেন। এরপর একে একে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা একটি করে গাছের চারা রোপণ করেন। তাঁরা এলাকাবাসীকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করতে মূল্যবান বক্তব্য দেন।

একটি দেশের মূল ভূখণ্ডের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে বনভূমি আছে মাত্র ১৭ ভাগ। বনভূমির পরিমাণের এ স্বল্পতা আমাদের পরিবেশের জন্য বিরাট হুমকি। বৃক্ষরাজি নির্বিচারে ধ্বংস করার ফলে বাংলাদেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হেনেছে। জলবায়ু ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে চরমভাবাপন্ন পরিণতির দিকে। তাই একটি বৃক্ষ কাটলে তার বদলে অন্তত পাঁচটি বৃক্ষ রোপণ করা উচিত।

'ক' জেলা প্রশাসন কর্মকর্তাদের গৃহীত এ বৃক্ষরোপণের এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল। এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁদের বক্তব্য সবাইকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে বলে আমার বিশ্বাস। সবশেষে তাঁরা এলাকাবাসীর মাঝে বিনামূল্যে চারা বিতরণ করে আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত করেন।

প্রতিবেদক
আজিজুল বাশার
চিলমারি, কুড়িগ্রাম
৫/৮/২০১৬।

[এখানে পত্রিকার ঠিকানাসংবলিত খাম আঁকতে হবে]

৭. তোমার স্কুলে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

[সি. বো. ১৫]

উত্তর :

১৬ই এপ্রিল, ২০১৬
বরাবর
প্রধান শিক্ষক
রনছ রুহিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়
কাটাখালি, মুন্সীগঞ্জ।

বিষয় : পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন সম্পর্কে প্রতিবেদন।

জনাব,

সম্প্রতি রনছ রুহিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন সম্পর্কে আদেশপাপ্ত হয়ে নিম্নলিখিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপিত

পহেলা বৈশাখ বাঙালির কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যবহুল একটি দিন। প্রতিবছরেই এ দিনটি অত্যন্ত উৎসাহ–উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একযোগে পালন করে থাকে বাংলা নববর্ষ। পুরাতন বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে সাদরে বরণ করে নেওয়া হয় বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে। রনছ রুহিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতিবছর নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। নববর্ষের দিন সকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উদ্যোগে ছাত্র–ছাত্রীরা নববর্ষের র‍্যালি নিয়ে বের হয়। এ র‍্যালিটি বিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এরপর র‍্যালি নিয়ে সবাই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় এবং নববর্ষের ঐতিহ্যবাহী খাবার পান্তা–ইলিশ খায়। বিদ্যালয়ের সৌজন্যে এ ছাড়াও নানা মুখরোচক খাবারের আয়োজন করা হয়। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর্ব শুরু হয়। যারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবে তারা আগেই প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মঞ্জুরুল ইসলাম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা পারভীন নাহার। তিনি প্রথমেই তাঁর সুন্দর বাচনভঙ্গি দিয়ে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা করেন। এরপর বাংলা নববর্ষের সেই অমর সংগীত "এসো হে বৈশাখ, এসো এসো"– গানটি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা। নাচ, গান, অভিনয়, কৌতুক, আবৃত্তি সব মিলিয়ে দারুণ উপভোগ্য ছিল অনুষ্ঠানটি। প্রত্যেকের উপস্থাপনাই খুব সুন্দর ছিল। অনুষ্ঠান শেষ হয় দুপর ২টার দিকে। শিক্ষকদের সহায়তায় মাঠে নানা ধরনের স্টল সাজিয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। স্টলগুলোতে গ্রামীণ ঐতিহ্য ধারণকারী বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য প্রদর্শিত হয়। প্রধান অতিথি ঘুরে ঘুরে স্টলগুলো দেখেন। সন্ধ্যা ছয়টায় দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ছাত্র–ছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকগণও এই আয়োজনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ উৎসবমুখর একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সব মিলিয়ে অত্যন্ত আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে রনছ রুহিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হলো।

নিবেদক

সালমা খাতুন
বাণিজ্য বিভাগ
রোল নং–০৫।

[এখানে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাসংবলিত খাম আঁকতে হবে]

৮. তোমার স্কুলে বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদ্‌যাপন সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রচনা করো। [রা. বো. ১৫, চ. বো. ১৫]

উত্তর :

১৬ই এপ্রিল, ২০১৬
বরাবর
প্রধান শিক্ষক,
গাছুয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
মুলাদী, বরিশাল।

বিষয় : বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ সম্পর্কে প্রতিবেদন।

জনাব,
সম্প্রতি গাছুয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদ্‌যাপন সম্পর্কে আদেশপাপ্ত হয়ে নিম্নলিখিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদ্‌যাপিত

গাছুয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়েছে। সাত দিন ধরে চলে এ অনুষ্ঠান। এবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশ নিয়েছে শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানের বিষয় ও সময়সূচি ছিল নিম্নরূ প :

তারিখ	সময়	বিষয়
০৪/০১/২০১৬	১০:০০ – ১২:০০টা ১২:০০ – ২:০০টা	রবীন্দ্রসংগীত নজরুলসংগীত
০৫/০১/২০১৬	১০:০০ – ১২:০০টা ১২:০০ – ২:০০টা	নৃত্য কবিতা আবৃত্তি
০৬/০১/২০১৬	১০:০০ – ১২:০০টা ১২:০০ – ২:০০টা	অভিনয় উপস্থিত বক্তৃতা
০৭/০১/২০১৬	১০:০০ – ১২:০০টা	কৌতুক দেশাত্মবোধক গান
০৮/০১/২০১৬	১০:০০ – ১২:০০টা ১২:০০ – ২:০০টা	চিত্রাঙ্কন হাতের লেখা
০৯/০১/২০১৬	১০:০০ – ১:০০টা	অঙ্ক প্রতিযোগিতা
১০/০১/২০১৬	১০:০০ – ১:০০টা	গল্প লেখা প্রতিযোগিতা

সাত দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। শিক্ষার্থীদের প্রতিভা দেখে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হন। প্রতিটি শাখায় তিনজন করে সেরা প্রতিযোগীকে নির্বাচিত করা হয়। বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হলেও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আগামী মাসে উদ্‌যাপন করার ঘোষণা দেন প্রধান শিক্ষক। তিনি জানান, উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়। এ ঘোষণায় শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সুশৃঙ্খলভাবে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদ্‌যাপন করে শিক্ষক–শিক্ষিকাগণ এবং শিক্ষার্থীরা বেশ খুশি। সর্বোপরি প্রতিটি পর্বই ছিল বেশ উপভোগ্য। শিক্ষার্থীদের সাবলীল উপস্থাপনা সত্যিই বেশ প্রশংসনীয় ছিল।

প্রতিবেদক
শিমুল অধিকারী
নবম শ্রেণি
মানবিক বিভাগ।

[এখানে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাসংবলিত খাম আঁকতে হবে]

৯. তোমার এলাকায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বইমেলা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর :

টাঙ্গাইলে বইমেলা অনুষ্ঠিত

টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মো. নজরুল ইসলাম। মেলায় ছোটবড় প্রায় ১০০টি স্টল ছিল। বাংলা একাডেমিসহ দেশের খ্যাতনামা বেশ কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশ নেয়। ফলে দর্শক সমাগম হয় প্রচুর। বইয়ের ব্যাপারে বয়স্কদের তুলনায় তরুণদের আগ্রহই বেশি লক্ষ করা যায়। এতে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের বই বেশি বিক্রি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে আল মাহমুদ ও শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ। নতুন লেখকদের বইও কিছু কিছু বিক্রি হয়েছে। বইমেলাকে কেন্দ্র করে জেলার সাহিত্যমোদী মানুষের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

বইমেলার শেষদিনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় শিল্পীদের কণ্ঠে মনোমুগ্ধকর দেশাত্মবোধক, লোক, রবীন্দ্র ও নজরুলসংগীত পরিবেশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মো আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আশরাফ সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক এম এ মুহিত, করটিয়া সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. কামালুদ্দীন চৌধুরী প্রমুখ। বক্তারা তাঁদের বক্তৃতায় বই পড়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। জ্ঞানভিত্তিক আলোকিত সমাজ নির্মাণের আহ্বান জানান। শ্রেষ্ঠ স্টল হিসেবে পুরস্কৃত হয় ঐতিহ্য প্রকাশনী। স্টলের সুন্দর ডেকোরেশনের জন্য পুরস্কৃত হয় পাঠশালা প্রকাশন। মেলাকে কেন্দ্র করে তরুণ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠান ও মেলার শৃঙ্খলা রক্ষায় তারা ছিল খুবই তৎপর। অতিথিরা মেলার সুন্দর আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রতিবেদক
আরেফিন চৌধুরী
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
১০/০২/২০১৬।

[এখানে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাসংবলিত খাম আঁকতে হবে]

১০. এলাকার গ্রন্থাগারের দুরবস্থা তুলে ধরে একটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখো। [কু. বো. ১৫]

উত্তর :

খুলনা বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারের বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিবেদক : খুলনা বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার ভবনটি সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ ও এর ভেতরে স্যাঁতসেঁতে হয়ে পড়েছে। ফলে এ গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বইগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থাগার সূত্র জানায়, ১৯৬৪ সালে একটি দোতলা ভবনে গ্রন্থাগারটির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিএল কলেজ, খুলনা মহিলা কলেজ, আযম খান সরকারি কমার্স কলেজ,

এমএম সিটি কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ নিয়মিত গ্রন্থাগারটিতে আসছেন। গ্রন্থাগারটির আওতায় দশটি জেলা সরকারি গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে অবকাঠামো এবং জনবল সংকটসহ নানা সমস্যার শিকার গ্রন্থাগারটি। এখানে ১৮ জনের জনবল কাঠামো রয়েছে। কিন্তু কর্মরত আছেন ১৪ জন। লাইব্রেরিয়ানের একটি পদ, রিডিং হল সহকারীর একটি পদ এবং নৈশপ্রহরী ও মালীর একটি করে পদ শূন্য রয়েছে। একটিমাত্র ফটোস্ট্যাট মেশিন, সেটিও অকেজো পড়ে রয়েছে। সরেজমিনে গিয়ে ভবনটির মেঝে ও দেয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে দেখা গেছে। গ্রন্থাগারের মধ্যে রাখা বইগুলোর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ধুলা জমে রয়েছে বইগুলোর ওপর। অধিকাংশ চেয়ার-টেবিল ফাঁকা পড়ে থাকতে দেখা যায়। দোতলায় গিয়ে দেখা যায়, সেখানে নতুন বইয়ের স্তূপ। কিন্তু ক্যাটালগ তৈরি না হওয়ায় সব বই পাঠকের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। কয়েকজন কর্মচারী নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, গ্রন্থাগারের মূল সমস্যা জনবল সংকট। ক্যাটালগারের পদ না থাকায় নতুন যে বইগুলো আসে, সেগুলো পাঠকদের জন্য সহজে উন্মুক্ত করা সম্ভব হয় না। একাধিক পাঠকের সাথে কথা বললে তাঁরা আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তাঁদের অভিযোগ, আমাদের পৰে সব বই কিনে পড়া সম্ভব নয়। তাই এখানে আসি। কিন্তু বই পড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ যেমন নেই, তেমনি নেই প্রয়োজনীয় অনেক বই। অবিলম্বে গ্রন্থাগারটির সংস্কার দাবি করেন তাঁরা। বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারের উপপরিচালক রেজাউল করীম বলেন, প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে কাজ করতে খুব সমস্যা হয়। আমরা প্রতি মাসের রিপোর্টের সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এসব সমস্যার কথা জানাই। কিন্তু কোনো কাজ হয় না। প্রতিবছর গ্রন্থাগারের সংস্কারকাজের জন্য যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। গণপূর্ত অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে নতুন করে ভবন তৈরি করার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিতে।

বহু বছর ধরে খুলনা শহরবাসীর জ্ঞান তৃষ্ণা মিটিয়ে আসছে খুলনা বিভাগীর গণগ্রন্থাগারটি। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে এটির এখন নাজুক অবস্থা। শীঘ্রই এর দিকে নজর না দিলে জ্ঞানার্জনের এ তীর্থস্থানটি সম্পূর্ণরূ পে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

প্রতিবেদক

সমীর বড়ুয়া

খুলশী, খুলনা।

[এখানে পত্রিকার ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

১১. কবি নজরবলের জন্মবার্ষিকী উদযাপনের ওপর একটি প্রতিবেদন লেখো।

উত্তর :

ত্রিশালে নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা

ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সোমবার কবির কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত ত্রিশালের দরিরামপুর নজরুল মঞ্চে কবির ১১৪তম জন্মবার্ষিকীর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। ত্রিশাল ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক পরিবেশন করে। ত্রিশাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া নজরুল একাডেমি মাঠে নজরবল বইমেলার আয়োজন করা হয়। এতে ছিল সব শ্রেণির মানুষের উপচেপড়া ভিড়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মুস্তাকিম বিল্লাহ ফারুকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে নজরুল স্মারক বক্তব্য প্রদান করেন নজরুল বিশেষজ্ঞ ড. হায়াৎ মামুদ। আলোচনায় অংশ নেন কবি আসাদ চৌধুরী এবং নজরবল গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক জনাব মো. আনিসুর রহমান। অতিথিগণ নজরবলের শিল্প-সাহিত্যের গতিপথ ও চমৎকারিত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। নজরবলের রচনাসম্ভার কীভাবে বাংলা সাহিত্যিকে সমৃদ্ধ করেছে সেটিও তুলে ধরেন বক্তারা। আলোচনা সভার শেষে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নজরবলের কবিতা ও সংগীত পরিবেশন করে।

নজরবল বইমেলাকে ঘিরে স্থানীয় জনগণের বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপন লৰ করা গেছে। বইয়ের ক্রেতাও ছিল প্রচুর। নজরবলের কাব্যগ্রন্থগুলো ক্রয়ের প্রতিই বেশি আগ্রহ ছিল মানুষের।

প্রতিবেদক

মো. হাসানুজ্জামান খান

ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ

২৬-০৫-২০১৬।

[এখানে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

১২. বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলৰে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

[য. বো. ১৫]

উত্তর :

বিজয় দিবসের আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছিল জাতি

বিজয় দিবসে বাংলাদেশ এবার যেন মেতে উঠেছিল মহাউৎসবে। রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে আতশবাজি ফুটিয়ে, কামান দাগিয়ে, হুইসেল বাজিয়ে বরণ করা হয় বিজয় দিবসকে। পাড়ায় পাড়ায় মাইকে বেজে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের গান।

১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলৰে সারা দেশে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থা নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান, পথনাটকসহ মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামের দিনগুলো নিয়ে নানা আলেখ্য ও বর্ণনামূলক অনুষ্ঠান। বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয় মুক্তিযুদ্ধের গান, নাটক ও কবিতা। ঢাকা শহরে নেমেছিল জনতার ঢল। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, রমনার বটমূল, টিএসসি, বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি ও আশপাশের এলাকা সব বয়সী মানুষের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে।

১৫ই ডিসেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে টিএসসিতে আতশবাজি পুড়িয়ে আর ৪৪টি ফানুস উড়িয়ে বিজয় দিবসকে স্বাগত জানানো হয়। তারপর কিছুৰণ চলে মনোমুগ্ধকর লেজার লাইট শো। এর পরপরই শুরব হয় দেশাত্মবোধক গান আর আবৃত্তি অনুষ্ঠান। পুরো এলাকা মেতে ওঠে বিজয় উৎসবে।

এবার বিজয় দিবস উপলৰে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট অনেকগুলো মঞ্চ তৈরি করে। দেশের কৃতী সন্তানদের নামে নামকরণ করা হয় সেসব মঞ্চ। যেমন নরেন বিশ্বাস আবৃত্তি মঞ্চ, শওকত ওসমান নাট্যমঞ্চ ইত্যাদি। এসব মঞ্চে এক যোগে প্রচারিত হয় সংগীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি, চরমপত্র পাঠ, কবিকণ্ঠে কবিতা, বাউল গান ইত্যাদি।

বিজয় দিবসের ভোরবেলা সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপ্রতি ও প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে একাত্তরের শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তারপর দলে দলে বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ মানুষ সেখানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

বিকেল থেকে উৎসব হয়ে ওঠে আরও উৎসাহ ও আনন্দমুখর। সন্ধ্যার পর মনোরম আলোকমালায় সেজে ওঠে ঢাকা নগরী। মানুষজন মনের আনন্দে

শহরজুড়ে ঘুরে বেড়ায়। বিজয়ের উৎসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয় গোটা জাতি।

প্রতিবেদক
আশরাফ হোসেন
রামপুরা, ঢাকা
১৭/১২/২০১৬।

[এখানে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাসংবলিত খাম আঁকতে হবে]

১৩. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।
অথবা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখো। ঢা. বো. ১৫, কু. বো. ১৫, দি. বো. ১৫]

উত্তর :

দফায় দফায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি : জনগণের নাভিশ্বাস

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাজধানীসহ সমগ্র দেশজুড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর প্রতিনিয়ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটেই চলছে। এ যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সরকার, প্রশাসন কারোরই এদিকে খেয়াল নেই। সাধারণ জনগণ নির্দিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রেণির হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

সরেজমিনে রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য কেজিতে পাঁচ থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। কাঁচাবাজারে সবজির পর্যাপ্ত জোগান থাকা সত্ত্বেও দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। শীত শেষে সবজির দাম ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। করলা ৪৫–৫৫ টাকা, ঢেড়শ ৬০–৭০, লাউ ৩০–৪০, আলু ২৫–৩০, বরবটি ৫৫–৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। উৎপাদক পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি দ্রব্যই কৃষকের বিক্রীত মূল্যের ৪/৫ গুণ অধিক মূল্যে ভোক্তাসাধারণ ক্রয় করছে। এ ব্যাপারে খুচরা বিক্রেতাদের সাথে কথা বললে তাঁরা জানান, তাঁদের চড়া দামে পাইকারদের কাছ থেকে পণ্য কিনতে হচ্ছে। পাইকাররা দাম বৃদ্ধির জন্য সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিজনিত পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি, বিভিন্ন পয়েন্টে অবৈধভাবে চাঁদা আদায়, যানজটের কারণে দ্রুত পচনশীল সবজি নষ্ট হওয়া ইত্যাদিকে দায়ী করেন।

মুদি–মনোহারি দ্রব্যের দোকানে গিয়ে দেখা যায় তেল, আটা, ময়দা ইত্যাদির দাম প্রতি কেজিতে এক মাসের ব্যবধানে বেড়েছে পনেরো হতে বিশ টাকা পর্যন্ত। সয়াবিন তেল ১১০–১২০ টাকা, চিনি ৫০–৬০, মসুর ডাল ১২০–১৩০, আটা ৩৫–৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মোটা চালের দাম কিছুটা কমলেও বেড়েছে চিকন চালের দাম। গুড়, গুঁড়োদুধ ও শিশুখাদ্যের দাম গত এক মাসের ব্যবধানে গড়ে ১০ শতাংশ বেড়েছে। ডিম, মুরগি, মাছের দামও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। মুদি–মনোহারি দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীরা সরকারের যথাযথ তদারকির অভাব, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে ঊর্ধ্বগতি, ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন ইত্যাদি কারণ উলেরখ করেন।

কয়েকজন ক্রেতার সাথে কথা বলে দেখা যায়, বর্তমান বাজার পরিস্থিতি সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ বেড়েছে। একজন ভ্যানচালক ক্ষোভের সঙ্গে জানান তার সারা দিনের আয়ে পরিবারের জন্য দুবেলা দু'মুঠো ভাতের জোগাড় হচ্ছে না। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়াচ্ছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে টিসিবি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংশিরষ্ট কর্তাব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকে সরাসরি দায়ী করেন। টিসিবির পরিচালক জানান, দ্রুত টিসিবির মাধ্যমে তেল, চিনি, ডাল প্রভৃতি ভোগ্যপণ্য আমদানি করে রাজধানীসহ সকল বিভাগীয় শহরে ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থা স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে সরকার। এছাড়া আসন্ন ধান–চাল সংগ্রহের মৌসুমে স্থানীয় কৃষকদের নিকট হতে ধান সংগ্রহের মাধ্যমে খাদ্য মজুদ বৃদ্ধিতে সরকার চেষ্টা করছে বলে জানান। তিনি আরও বলেন, সরকার শীঘ্রই বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা পুনরায় চালু করবে।

এ অবস্থায় সরকারকে জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে। পরিবহন চাঁদাবাজি বন্ধ, বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা চালু, জেলা শহরগুলোতে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমানো, অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, বাজারে পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার জনগণকে বর্তমান অবস্থা থেকে কিছুটা মুক্তি দিতে পারে। এ সমস্যা সমাধানে সরকার, ব্যবসায়ী, জনগণসহ সংশিরষ্ট সবাইকে সচেতন ও আন্তরিক হতে হবে।

[এখানে পত্রিকার ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

১৪. 'যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা'– এই শিরোনামে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর :

ভয়াবহ যানজট জীবনের স্বাভাবিক গতিকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে

যানজটের কারণে ঢাকা শহরে স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যানজট শুধু আমাদের অমূল্য সময়ই কেড়ে নিচ্ছে না, নাগরিক জীবনেও ডেকে আনছে নানা দুর্ভোগ। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্র–শিক্ষক, কর্মকর্তা–কর্মচারী, শ্রমিক, পথচারী সবাই আজ সর্বগ্রাসী যানজটের শিকার। এখন নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর কোনো নিশ্চয়তা নেই।

যানজটের কারণে গতি থমকে থাকলেও সময় থমকে থাকে না। কর্মস্থলে সময়মতো পৌঁছতে না পারার কারণে কাজের কাজ কিছুই হয় না। দশ মিনিটের রাস্তা পেরোতে লাগে এক ঘণ্টা। সকাল–বিকাল–সন্ধ্যা, যখন–তখন, যেখানে–সেখানে যানজট। রাজপথ, গলিপথ, ফুটপাত কোথাও স্বস্তি নেই। সর্বত্র ভিড় আর ভিড়, গাড়ির ভিড়, মানুষের ভিড়। যানজটের ভিড়ে একবার আটকে গেলে কখন তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তা বলা মুশকিল। রোগীসহ অ্যাম্বুলেন্স যখন যানজটে আটকিয়ে পড়ে তখন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এমনকি পথিমধ্যে যানজটের কারণে রোগীর মৃত্যুও ঘটে। বর্তমানে নাগরিকের অপরিসীম ক্ষতি, ক্ষোভ ও বিরক্তির একটা বড় কারণ এ যানজট। এতে প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে অগণিত শ্রমঘণ্টা। এর অর্থমূল্য নির্ণয় করা গেলে দেখা যেত প্রতিদিন কী বিশাল অঙ্কের অর্থের অপচয় হচ্ছে যানজটের কারণে। যানজট মোকাবিলা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল করার জন্য বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। কিন্তু এতেও সমস্যার তেমন কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না।

সীমিত রাস্তাঘাটের তুলনায় যানবাহনের সংখ্যাধিক্যই যানজটের প্রধান কারণ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত ও ভারসাম্যহীন নগরায়ন, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ নানা কারণে যানজট ও রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশের সড়ক ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ সড়কগুলোর কার্যকর পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রয়েছে। আবাসন সংকট ও নগরায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়ন হচ্ছে না। অপরিকল্পিতভাবে ওয়াসা, ডেসা, গ্যাস, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেসরকারি সংস্থা বিজ্ঞাপন বিলবোর্ডসহ নানা কারণে প্রায়ই জনবহুল রাস্তাসহ আবাসিক রাস্তাতেও খোঁড়াখুঁড়ি করে। খোঁড়াখুঁড়ির পর পুনরায় রাস্তা মেরামত হয় না সময়মতো। রাস্তায় ওভারব্রিজের স্বল্পতা, ট্রাফিক আইন না মানা এবং রাস্তা পারাপারে নিয়ম মেনে না চলা, আধাপাকা ও কাঁচা রাস্তায় অতিরিক্ত মাল ও যাত্রীবোঝাই যানবাহন চলাচল করা, যত্রতত্র গাড়ি পার্ক করা ইত্যাদির কারণে

যানজট বেড়েই চলেছে। জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য ২৫% ফুটপাত থাকার কথা, কিন্তু তা নেই। আবার যেটুকু আছে তার অধিকাংশ স্থান কলকারখানা, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ফেরিওয়ালাদের দখলে। রাস্তার অনেকাংশে যত্রতত্র বাসস্ট্যান্ড, ট্রাকস্ট্যান্ড ও টেম্পোস্ট্যান্ড দখল করে রেখেছে। এসব কারণে রাস্তা সংকীর্ণ ও অরৰিত হয়ে পড়ছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট।

যানজট কমানোর জন্য কতকগুলো পদৰেপ নেওয়া যেতে পারে। যেমন–
১। অবৈধ রিকশার দৌরাত্ম্য কমানো হবে; ২। যত্রতত্র গড়ে ওঠা বাজার, মার্কেট, বিপণিবিতান উচ্ছেদ করা; ৩। যত্রতত্র যানবাহন থামিয়ে লোক ওঠা–নামা না করা; ৪। অবৈধ পার্কিং বন্ধ করা; ৫। ফুটপাতগুলোকে হকারমুক্ত করা; ৬। বেশিরভাগ রাস্তাকে ওয়ানওয়ে করা ও ক্রসিং কমিয়ে দেওয়া; ৭। রাজধানীতে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির প্রতিযোগিতা বন্ধ করা; ৮। শহরের ব্যস্ত এলাকায় বাস টার্মিনাল উঠিয়ে দেওয়া; ৯। রাজধানীর অভ্যন্তরে শিল্প–কারখানাগুলোকে শহরের বাইরে নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা; ১০। শহর থেকে কিছু হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস–আদালত শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া; ১১। নির্মাণাধীন ফ্লাইওভার ও মেট্রোরেলের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সর্বোপরি যানজট নিরসনের অন্যতম কৌশল হিসেবে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করতে হবে।
নাগরিক জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীল ও গতিশীল করে তুলতে যানজট সমস্যার সমাধান অবশ্যই করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সকলের সদিচ্ছা ও সময়োপযোগী সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা ও তার দ্রুত বাস্তবায়ন।

প্রতিবেদক
কামরুল ইসলাম
মগবাজার, ঢাকা
০৭/০৫/২০১৬।

[এখানে পত্রিকার ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

১৫. তোমার দেখা একটি সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখো।

[সি. বো. ১৫]

উত্তর :

করটিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন নিহত

টাঙ্গাইল সংবাদদাতা ॥ গতকাল শুক্রবার ভোরে ঢাকা–টাঙ্গাইল মহাসড়কের করটিয়ায় মুখোমুখি দুটি বাস দুর্ঘটনায় ১০ জন নিহত ও অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়।
শুক্রবার সকালে বগুড়া থেকে ছেড়ে আসা এস.আর. ট্র্যাভেলস (বগুড়া ক–২৯২৪) বাসটির সঙ্গে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা অপর একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধে। এতে এস.আর. ট্র্যাভেলস বাসের ৬ জন যাত্রী ও অন্য বাসটির ৪ জন যাত্রী নিহত হয়। আহত যাত্রীদের প্রথমে স্থানীয় করটিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে কিছুসংখ্যক যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুমূর্ষু ১২ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
নিহতদের মাঝে এখন পর্যন্ত চারজনের পরিচয় জানা গেছে। এরা হচ্ছে ১। আবদুর রহিম তালুকদার (গ্রাম : বেরের বাড়ি, উপজেলা : ধুনট, জেলা : বগুড়া) ২। কলিম খান (গ্রাম : সোনাতলা, উপজেলা : সোনাতলা, জেলা–বগুড়া) ৩। মরিয়ম বিবি (মালতিনগর, বগুড়া শহর) ৪। বশির মিয়া (২৭, আর.কে মিশন রোড, ঢাকা)। হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, আহত যাত্রীদের জন্য জরুরি রক্তের প্রয়োজন। আগ্রহী রক্তদাতাগণকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে রক্ত দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। প্রত্যৰদর্শীরা জানায়, দুর্ঘটনার ফলে উভয় দিকের যানচলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। দুই ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। ঐ দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তবে আহত একজন যাত্রী জানিয়েছে বগুড়া থেকে আসা বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারালে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।
পুলিশ কর্মকর্তাগণ দুর্ঘটনার স্থানটি পরিদর্শন করেছেন। দুর্ঘটনার কারণ উদ্‌ঘাটনে তদন্ত করা হবে বলে জানান এক কর্মকর্তা। পুলিশ এস.আর. ট্র্যাভেলস বাসটির হেলপারকে আটক করেছে।

প্রতিবেদক
হাবিবুর রহমান
করটিয়া, টাঙ্গাইল
১৮/০৪/২০১৬।

[এখানে পত্রিকার ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

১৬. নগর উন্নয়ন বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর :

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন দ্রুত নগর উন্নয়ন

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজজীবন মূলত কৃষিভিত্তিক। তবে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু নগরগুলোই। গ্রামগুলোকেও তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের সুফল লাভের জন্য নির্ভর করতে হয় নগরগুলোর ওপর। বর্তমান বিশ্বসভ্যতা প্রধানত নগরভিত্তিক। তাই নগর উন্নয়ন ও নাগরিকসেবার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী না হয়ে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব নয়।

ভারসাম্যহীন নগরায়ন

বাংলাদেশের নগরায়নে ভারসাম্যহীনতার লৰণ সুস্পষ্ট। কারণ স্বাধীন–উত্তর সময়ে নগরায়ন ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুত হারে। ১৯৭১ সালে দেশের নগর জনসংখ্যা ছিল ৫ মিলিয়ন আর ২০১০ সালে নগর জনসংখ্যা প্রায় ৫০ মিলিয়ন। প্রতি ১২ বছরে নগরের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নগর উন্নয়ন ঘটেনি। বরং পরিকল্পনার অভাবে বা এর দুর্বলতার কারণে অথবা সুচিন্তিতভাবে উন্নয়ন বিনিয়োগ ব্যবস্থা না হওয়ায় দেশে ভারসাম্যহীন নগরায়ন ঘটছে। ফলে আমরা দেখি ঢাকা শহরে মাত্রাতিরিক্ত বিনিয়োগ আর ঢাকার বাইরে গুটিকয়েক বড় শহরের নগর উন্নয়ন।

নগরভিত্তিক সমস্যা

নগরভিত্তিক সমস্যাসমূহ মেগাসিটি ঢাকা থেকে শুরু করে যেকোনো ছোট শহর পর্যন্ত দৃশ্যমান। প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টাই এক একটি চ্যালেঞ্জ। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে :

- আইনশৃঙ্খলা সমস্যা।
- বিভিন্ন সরকারি সেবা–পরিসেবার অপ্রতুলতা।
- পরিবহন অপর্যাপ্ততা ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে পরিবহন ও যানজট সমস্যা, সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি।
- শিৰা, স্বাস্থ্য ও বিনোদনসেবার অপ্রতুলতা এবং বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা।
- আবাসন সংকট।
- পরিবেশ দূষণ।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যা ও অগ্নিকাণ্ড।

- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের সমস্যা।
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, বিশেষ করে নারী ও শিশু নির্যাতন ইত্যাদি।

সমস্যা সমাধানের কৌশল

❒ নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি জাতীয় নগরায়ন নীতিমালা প্রণয়ন। যার মূল লক্ষ্য হবে নগর–দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নগর–দরিদ্রদের জীবন মান উন্নতকরণ।

❒ রাজধানী ঢাকা, বন্দরনগরী চট্টগ্রাম অভিমুখী জনস্রোত হ্রাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। এজন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ–সুবিধাসহ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন জরুরি। এক্ষেত্রে জেলা শহর, মাঝারি শহর, উপজেলা শহর, এমনকি ছোট শহরেও সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

❒ প্রয়োজন দক্ষতার সঙ্গে নগর পরিচালনা করা। নগর পরিচালনা বলতে বোঝায় একটি নগরের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিদ্যমান সমস্যাবলির সমাধানের জন্য সুচিন্তিত ও সুসমন্বিত ব্যবস্থাপনা। নগর পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব স্থানীয় পৌর সরকারের (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) ওপর বর্তায়। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের উন্নয়ন ও কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট স্বচ্ছতা নেই। এছাড়াও রয়েছে অনেক আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। নগর উন্নয়ন ও নাগরিক সেবার মান উন্নত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে।

প্রতিবেদক

ইসরাত জাহান

ছোটরা, কুমিল্লা

১১/০২/২০১৬।

[এখানে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

১৭. খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো ও তার প্রতিকার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর :

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো ও তার প্রতিকার

'খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল' বিষয়টি মানুষের জন্য এক আতঙ্কের নাম। প্রায় প্রতিদিনই এ নিয়ে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। মাছ, মাংস, চিনি, লবণ, চাল, আটা, দুধ, ঘি, মিষ্টি, ওষুধ– ভেজাল সর্বত্রই। এমনকি মিনারেল ওয়াটার নামে বোতলবন্দি 'বিশুদ্ধ' পানিতেও ভেজাল। উদ্বেগের বিষয় হলো– হচ্ছে এসব নকল ও ভেজাল খাদ্যসামগ্রীই বিশুদ্ধ বা খাঁটি লেবেল লাগিয়ে অনায়াসে বিক্রি হচ্ছে।

ভেজালের বর্তমান চিত্র

বর্তমানে দেশে ভেজালের দৌরাত্ম্যের কথা আমরা সবাই কমবেশি জানি। কিন্তু ভয়ের কথা হলো ভেজালের আওতার মধ্যে প্রতিনিয়তই নিত্যনতুন দ্রব্য যুক্ত হচ্ছে। আমরা প্রতিনিয়ত বাজার থেকে কিনে যেসব খাদ্যদ্রব্য খেয়ে থাকি, এদের মধ্যে কত শতাংশ ভেজাল তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। তবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের এক সূত্র থেকে জানা যায়, রাজধানীতে বিক্রিত খাদ্যসামগ্রীর শতকরা সত্তর ভাগ ভেজালযুক্ত। অন্যদিকে ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ–এর সূত্র মতে, দেশের পঞ্চাশ শতাংশ খাদ্যদ্রব্যই ভেজাল মিশ্রিত করে বিক্রি করা হয়। ভেজাল দেওয়ার প্রক্রিয়ায় খাদ্যশস্যে বহির্জাত পদার্থ সরাসরি যোগ করা হয়, যেমন : ওজন বৃদ্ধির জন্য বালি বা কাঁকর, ভালো শস্যের সঙ্গে কীটপতঙ্গ আক্রান্ত বা বিনষ্ট শস্য মেশানো ইত্যাদি। অনেক সময় মজুদ খাদ্যশস্যের ওজন বাড়ানোর জন্য কেউ কেউ তাতে পানি ছিটায়। ঘিয়ের সঙ্গে পশুচর্বি দিয়ে ভেজাল করা হয়। তিল বা নারিকেল তেলের সঙ্গে বাদাম তেল বা তুলাবীজের তেল মেশানো হয়। সয়াবিন তেলের সঙ্গে পামতেলের ভেজাল করা হয়। অনেক সময় দুধে পানি মিশিয়ে ভেজাল দুধ বাজারজাত করা হয়। বিভিন্ন ফলের রসের নামে কৃত্রিম ও নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যবহার করে নকল রস তৈরি হয়ে থাকে। বর্তমানে মিনারেল ওয়াটার নামে বাজারে যে পানির ব্যবসা চলছে তাতে গুণ ও মানের নিশ্চয়তা অতি সামান্য বা অনেক ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে।

ভেজাল মেশানোর কারণ

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোর প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের লোভ। নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের অভাবে ব্যবসায়ীরা লোভে পড়ে নানা রকম দুর্নীতি ও অসৎ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। ভোগবাদী প্রবণতা এবং রাতারাতি ধনী হওয়ার প্রবণতা থেকেও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশিয়ে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা করছে। প্রশাসনিক নিয়মকানুনের দুর্বলতার কারণে এবং কঠিন দণ্ডবিধি বা শক্ত কোনো আইন কার্যকর না থাকায় একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী নিন্দনীয় এ কাজটির সঙ্গে অবলীলায় জড়িয়ে পড়ছে।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল রোধের উপায়

দেশের সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : 'জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে।' বাজার যেখানে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ সেখানে জনগণের 'পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন' করতে হলেও রাষ্ট্রকে অবশ্যই সর্বাগ্রে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য এবং এসবের জোগানদাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। জনগণকেও এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো ও তার প্রতিকার সম্পর্কে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে–

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ নামে একটি আইন করা হয়েছে। আইনটির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত হবে। খাদ্যনমুনা পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেক জেলায় এবং সম্ভব হলে বড় বড় বাজারগুলোতে পরীক্ষাগার স্থাপন করতে হবে। বিএসটিআইকে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। ভেজালবিরোধী ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং বাজার তদারকির জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং পণ্যের প্যাকেটের গায়ে কোম্পানির লাইসেন্স নম্বর, ট্রেড মার্ক, পণ্যের উৎপাদন সময়সহ এমন সব কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে ক্রেতাসাধারণ সহজেই খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল বুঝতে পারে। ভেজালের প্রতিকারের লক্ষ্যে ক্রেতাস্বার্থ আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। প্রচারমাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের নানা রকম প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। সমাজে ভেজালকারীকে চিহ্নিত করে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। ব্যবসায়ীদের খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের ভয়াবহ দিক সম্পর্কে জানিয়ে তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে।

আশা করা যায়, উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহের আলোকে সরকারের সদিচ্ছা এবং আইন প্রয়োগকারীদের সততা অটুট থাকলে খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের পরিমাণ কমবে।

প্রতিবেদক

নিগার সুলতানা

সাত্তারখান, চট্টগ্রাম।

[এখানে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

১৮. যুব সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর :

ধ্বংসের মুখে জাতির ভবিষ্যৎ কাণ্ডারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক : যারা বয়সে নবীন, যাদের আত্মবিশ্বাস রয়েছে অগাধ, যারা অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ায় না, যারা পুরাতনকে ভেঙে নতুন কিছু গড়তে চায় তারাই যুবক। তারা স্থবির নয়, তারা চঞ্চল। তারা পরাজয় মানতে নারাজ। তারা দেশ ও জাতির গৌরব। এ তরুণরাই যদি বিপরীতমুখী রূ প ধারণ করে অন্যায়ের দিকে পা বাড়ায় তাহলে জাতি অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। যুবসমাজের এ অবস্থাকেই বলা হয় অবক্ষয়। আমাদের যুবসমাজ নানা অবক্ষয়ের শিকার। বেকারত্ব, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক কুপ্রভাব, অপসংস্কৃতি, অর্থনৈতিক দৈন্য ইত্যাদি যুবসমাজকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে। ফলে তারা সুস্থ জীবন থেকে আলাদা হয়ে ঝুঁকে পড়ছে অবক্ষয়ের গহীন আবর্তে। অবক্ষয়ের কারণগুলো নিম্নরূ প :

জীবনের আদর্শ ও মূল্যবোধের অভাব : আমাদের যুবসমাজের সামনে জীবন্ত আদর্শের একান্ত অভাব। বড়দের মাঝে তারা আদর্শবান ব্যক্তিত্ব খুব কমই খুঁজে পাচ্ছে– যাদের কাছ থেকে তারা সৎ পথের অনুপ্রেরণা পাবে। বরং দেখতে পাচ্ছে রাজনীতির নামে মিথ্যাচার, সমাজসেবার নামে স্বেচ্ছাচার, আদর্শের নামে প্রতারণা। মূলত সর্বত্র আজ যে মূল্যবোধের অভাব দেখা দিয়েছে, তার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে বর্তমান যুবসমাজ।

অপসংস্কৃতির প্রভাব : যুবসমাজের ওপর সিনেমা, টিভি, বিভিন্ন প্রকার সংবাদপত্র, এসবের কুপ্রভাব অত্যন্ত বেশি। অধিকাংশ সিনেমার কাহিনি, নাচ–গান, পোশাক–পরিচ্ছদ ইত্যাদি এমনভাবে সন্নিবেশিত যে তাতে যুবকেরা অতি সস্তায় ও সহজে আমোদ–প্রমোদের উপকরণ খুঁজে পায়। তারা অনেক সময় এসব উদ্ভট ও অবাস্তব কাহিনিকে বাস্তব জীবন বলে চালিয়ে দিতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করে বসে। অপসংস্কৃতি গ্রাস করছে যুবসমাজকে। বর্তমানে খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ এসব কার্যকলাপের মূলে রয়েছে অপসংস্কৃতির প্রভাব।

মাদকদ্রব্যের ভূমিকা : কোনো দেশের যুবসম্প্রদায় মাদকাসক্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে সে দেশের নৈতিক চরিত্রের অনিবার্য অধঃপতন। গাঁজা, ভাং, আফিম, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, কোকেন, হাসিস, মারিজুয়ানা ইত্যাদি নানা ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য আজ সর্বত্র সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। উঠতি বয়সের তরুণ–তরুণীরা এর অবাধ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক দলের প্রভাব : রাজনৈতিক দলের অসৎ নেতারা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার মানসে যুবসমাজকে অনেক সময় কুপথে পরিচালিত করে। মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যুবকদের ক্ষমতা ও অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ক্যাডার তৈরি করে নানা অপকর্মে লিপ্ত করে। যার পরিণাম যুবসমাজের অধঃপতন।

বেকারত্ব : বেকারত্ব যুবসমাজের বিপথগামিতার অন্যতম প্রধান কারণ। লেখাপড়া শেষে যখন তারা কোনো কাজ পায় না, তখন অসৎ উপায়ে উপার্জনের জন্য রাস্তায় নামে। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, অপহরণ ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এভাবে বেকার যুবসমাজ জীবন সম্পর্কে হতাশায় ভোগে এবং নানা অপরাধে লিপ্ত হয়।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস : শিক্ষায় অব্যবস্থার নানা অসঙ্গতিও যুবকদের অনেক সময় বিপথগামী করে। ভর্তি সমস্যা, পুস্তক সমস্যা, আবাসিক সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, ফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব, যখন তখন ধর্মঘট, দলবাজি–এসব ঘটনা তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারণ খুবই ব্যাপার। তরুণদের মানসিকতা নষ্ট করে দেয়। গুটিকয়েক সন্ত্রাসী সমগ্র ছাত্রসমাজকে জিম্মি করে রেখেছে। আর এর শিকার হচ্ছে আমাদের গোটা যুবসমাজ।

তরুণরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের বিপথগামিতা অবশ্যই রোধ করতে হবে। যুবসমাজকে সুপথে ফিরিয়ে আনা, আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের ভার সচেতন মহলের সবাইকে নিতে হবে। প্রচার মাধ্যমগুলো; বিশেষ করে টিভি, সিনেমা, পত্র–পত্রিকাগুলোকে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। যুবসমাজের জন্য খেলাধুলা ও শরীর চর্চার ব্যবস্থা নিতে হবে। বেকারত্ব দূর করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সব প্রকার মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

প্রতিবেদক
কামরুল হাসান
হবিগঞ্জ, সিলেট।

[এখানে পত্রিকার ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

১৯. তোমার বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য বিজ্ঞান মেলার ওপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করো।

উত্তর :

১২/০৩/২০১৬
বরাবর
প্রধান শিক্ষক
টিকাটুলি মডেল হাই স্কুল
টিকাটুলি, ঢাকা।

বিষয় : বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন সম্পর্কে প্রতিবেদন।

জনাব,
আপনার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে টিকাটুলি মডেল হাই স্কুলে অনুষ্ঠিতব্য বিজ্ঞান মেলার আয়োজন সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য নিচে উপস্থাপন করা হলো।

বিপুল উৎসাহ–উদ্দীপনায় চলছে বিজ্ঞান মেলা আয়োজনের প্রস্তুতি

প্রতি বছরের মতো এবারও টিকাটুলি মডেল হাই স্কুলে আয়োজিত হতে যাচ্ছে দিনব্যাপী বিজ্ঞান মেলা। এবার এ মেলার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে মার্চ মাসের ২০ তারিখ। মোট ২৩টি স্কুল এ মেলায় অংশ নিতে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে রাজধানী ঢাকা ছাড়াও ঢাকার বাইরের কয়েকটি নামকরা স্কুলও রয়েছে। আয়োজনটিকে সর্বাঙ্গীণভাবে সফল করে তোলার জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রধান হিসেবে রয়েছেন আইসিটি বিষয়ের সিনিয়র শিক্ষক মাহফুজুর রহমান স্যার। গত সোমবার কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে স্কুলের অডিটোরিয়ামে একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ নানা বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। আয়োজনটি সফল করার ব্যাপারে কার কী ভূমিকা থাকবে তা–ও সভায় নির্ধারণ করা হয়।

এদিকে স্কুলের পক্ষ থেকে এ মেলায় অংশ নিতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে লক্ষ করা গিয়েছে বেশ উৎসাহ। সবাই নিজ নিজ প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। গত বছরের মতো এবারও প্রথম পুরস্কারটি জিতে নিতে তারা বদ্ধ পরিকর। শিক্ষকগণ তাদের কর্মকাণ্ডে আন্তরিকভাবে সহায়তা করছেন।

মেলার দিন বিদ্যালয় ভবন ও প্রাঙ্গণটিকে বর্ণিল সাজে সাজানো হবে। অংশগ্রহণকারী বিচারকগণ ও আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য থাকবে খাওয়া–দাওয়ার ব্যবস্থা। তাছাড়া মেলার প্রারম্ভে ছোট পরিসরে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেরও আয়োজন থাকবে। এই সবকিছুর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবারের বিজ্ঞান মেলার আয়োজন খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে।

প্রতিবেদক

জিনিয়া সুলতানা
নবম শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা
রোল নং–১

২০. মাদকাসক্তি যুবসমাজের অবৰয়ের অন্যতম একটি প্রধান কারণ, এ বিষয়ে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর :

নিজস্ব প্রতিবেদক : উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের তরৰণ সমাজের একটি বিরাট অংশ ভয়াবহ মাদকাসক্তির শিকার। বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পরিমাণ ও ব্যবহারকারীর সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণামতে এ দেশের ১৭ ভাগ লোক মাদকাসক্ত। এ দেশে অবৈধভাবে প্রচুর পরিমাণে মাদক বিক্রি হয় এবং মাদকদ্রব্যের এই সহজলভ্যতাই আমাদের দেশে দিন দিন মাদকগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

মাদকাসক্ত ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে। কখনো খারাপ লোকের প্ররোচনা, হতাশা, নৈরাশ্য অথবা নিছক কৌতূহলবশত কেউ একবার মাদক গ্রহণ শুরব করলে সে আর এই নেশা থেকে ফিরে আসতে পারে না। দিনের পর দিন তার এ নেশা আরো বাড়তে থাকে। অনেকেই ভাবে মাদক গ্রহণের মাধ্যমে তারা দুঃখকে ভুলে থাকার শক্তি পায়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। মাদক মানুষের মানসিক সুস্থতাকে নষ্ট করে তাকে মানসিকভাবে আরো দুর্বল করে তোলে। মাদক গ্রহণের ফলে মানুষের আচরণেও অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি অত্যন্ত সহজেই অনৈতিক ও বেআইনি কাজে জড়িয়ে পড়ে। মাদকের টাকা জোগাড় করার জন্য পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি করে, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অসৎ পথ অবলম্বন করে। মাদকাসক্তরা পরিবার এবং সমাজে ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন জটিল ও দুরারোগ্য রোগব্যাধি দেহকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটে ও কর্মৰমতা লোপ পায়।

মাদকাসক্তির সর্বনাশা ছোবল দেশের তরৰণ সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজের জন্য মাদকাসক্তি নির্মূল করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত ও সামাজিক সচেতনতা ও দৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তবেই আমরা পেতে পারি একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ।

প্রতিবেদক
আরেফিন
চরফ্যাশন, ভোলা।

[এখানে পত্রিকার ঠিকানা সংবলিত খাম আঁকতে হবে]

১. সারাংশ ও সারমর্ম

কোনো পদ্য বা গদ্যের মূলভাব বা বক্তব্যকে সংৰিপ্ত আকারে প্রকাশ করার নামই সারমর্ম বা সারাংশ। সাধারণত পদ্যের ভাব সংৰেপে প্রকাশকে সারমর্ম এবং গদ্যের বক্তব্য সংৰেপে প্রকাশ করাকে সারাংশ বলে। সারমর্ম বা সারাংশ লেখার সময় :

১. যে পাঠটুকুর সারমর্ম বা সারাংশ রচনা করতে হবে, সেটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।
২. বাড়তি বিষয় বর্জন করতে হবে। কখনো কোনো পাঠের মূল ভাব উপমা রূ পকের আড়ালে থাকতে পারে, তা বুঝে মূল ভাব লিখতে হবে।
৩. সারাংশ বা সারমর্মে উপমা, রূ পক–এসব বাদ দিয়ে লিখতে হবে।
৪. প্রত্যৰ উক্তি বর্জন করে পরোৰ উক্তিতে লিখতে হবে।
৫. মূল অংশে উদ্ধৃতি থাকলে প্রয়োজনে সেই উদ্ধৃতির ভাবটুকু উদ্ধৃতি ছাড়া লিখতে হবে।
৬. বাহুল্য বর্জনপূর্বক মূলভাব সংৰেপে লিখতে হবে।
৭. মূল বক্তব্যটি নিজের ভাষায় সাজিয়ে সহজ ও সাবলীল করে লিখতে হয়।

❑ সারাংশ

১

ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাই হলো জ্ঞানীর কাজ। পিঁপড়ে–মৌমাছি পর্যন্ত যখন ভবিষ্যতের জন্য ব্যতিব্যস্ত তখন মানুষের কথা বলাই বাহুল্য। ফকির–সন্ন্যাসী যে ঘর–বাড়ি ছেড়ে আহার–নিদ্রা ভুলে পাহাড়–জঙ্গলে চোখ বুঁজে বসে থাকে, সেটা যদি নিতান্ত গঞ্জিকার কৃপায় না হয়, তবে বলতে হবে ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে। সমস্ত জীব–জন্তুর দুটো চোখ সামনে থাকবার মানে হল ভবিষ্যতের দিকে যেন নজর থাকে। অতীতের ভাবনা ভেবে লাভ নেই। পণ্ডিতেরা ত বলে গেছেন, 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। আর বর্তমান সে–ত নেই বললেই চলে। এই যেটা বর্তমান সেই–এই কথা বলতে বলতে অতীত হয়ে গেল। কাজেই তরঙ্গ গোনা আর বর্তমানের চিন্তা করা, সমানই অনর্থক। ভবিষ্যৎটা হল আসল জিনিস। সেটা কখনও শেষ হয় না। তাই ভবিষ্যতের মানব কেমন হবে, সেটা একবার ভেবে দেখা উচিত।

সারাংশ : বিচৰণ মানুষ কেবল ভবিষ্যৎ নিয়েই ভাবিত হন। অতীত গত হয়েছে বলে গুরবত্বহীন, আর বর্তমানও এত ৰণস্থায়ী যে তাও গুরবত্ব পেতে পারে না। বস্তুত ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করার জন্য ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে ভাবনা–চিন্তাই দূরদর্শিতার লৰণ।

২

শিৰা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিৰিত লোকমাত্রই স্বশিৰিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই, এমনকি এৰেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখানে থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে যার সুদে তারা বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণসাপেৰ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারে ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিৰকের সার্থকতা শিৰাদান করায় নয়, ছাত্রকে তা অর্জন করতে সৰম করায়। শিৰক ছাত্রকে শিৰার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধি–বৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার জ্ঞানপিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর কিছু পারেন না।

সারাংশ : সুশিৰিত ব্যক্তিমাত্রই স্বয়ংশিৰিত। অপরের নিকট থেকে শিৰা গ্রহণের ভাবনা মস্ত বড় ভুল। আমরা শিৰকের কাজ ছাত্রকে লেখাপড়ার কাজে সাহায্য করা, তার হৃদয়ে জ্ঞানের পিপাসা বৃদ্ধি করা এবং কৌতূহল সৃষ্টি করা। মানুষমাত্রই নিজে নিজের শিৰক। জ্ঞানের ব্যাপারে শিৰক সহায়ক মাত্র।

৩

অতীতকে ভুলে যাও। অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আগামীকালের বোঝা

অতীতের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎকেও অতীতের মত দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ কাল বলে কিছু নেই। মানুষের মুক্তির দিন তো আজই। আজই ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুশ্চিন্তায় ও স্নায়বিক দুর্বলতায়। অতএব, অতীতের এবং ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও– আর শুরু কর দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে। [ঢা. বো. ১১, ব. বো. ১৩]

সারাংশ : অতীতের ব্যর্থতার জন্য আফসোস করে বর্তমানকে নষ্ট করা উচিত নয়। বরং বর্তমানকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত সবচেয়ে বেশি। কারণ, আজকের সাধনাই সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে বিনির্মাণ করবে। কারণ হতাশা জীবন শক্তিকে নিঃশেষিত করে।

৪

এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে, সেখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ তুমিই কেবল একলা থামবে, আর কেউ থামবে না। জগৎ প্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি না চলতে পার তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপর এসে আঘাত করবে, একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে কিংবা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিরাম চল এবং জীবনচর্চা কর, নয় বিশ্রাম কর এবং বিলুপ্ত হও, – পৃথিবীর এই রকম নিয়ম। [কু. বো. ০৮]

সারাংশ : গতিময়তাই জীবন। গতির নিরন্তর ছন্দে প্রতিনিয়ত চলেছে জীবনপ্রবাহ। এই অবিরাম চলার মধ্যে যে গতি হারায় সেই হয়ে পড়ে নিশ্চল এবং মৃত। তাই জীবনের জন্য প্রয়োজন নিরন্তর চলমানতা। তা না হলে স্থবিরতা ও হতাশা গ্রাস করবে।

৫

রূ পার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায় আর ক'টি লোক। শতকরা নিরানব্বইটি মানুষকেই চেষ্টা করতে হয়, জয় করে জিততে হয় তার ভাগ্যকে। বাঁচে সেই যে লড়াই করে প্রতিকূলতার সঙ্গে। পলাতকের স্থান জগতে নেই। সমস্ত কিছুর জন্যই চেষ্টা দরকার। চেষ্টা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। সুখ চেষ্টারই ফল–দেবতার দান নয়। তা জয় করে নিতে হয়, আপনা আপনি পাওয়া যায় না। সুখের জন্য দু'রকম চেষ্টা দরকার, বাইরের আর ভিতরের। ভিতরের চেষ্টার মধ্যে বৈরাগ্য একটি। বৈরাগ্যও চেষ্টার ফল, তা অমনি পাওয়া যায় না। কিন্তু বাইরের চেষ্টার মধ্যে বৈরাগ্যের স্থান নেই।

সারাংশ : প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করেই সৌভাগ্যকে ছিনিয়ে আনতে হয়। সৌভাগ্যবান সেই যে চেষ্টা করে, সংগ্রাম করে। যে চেষ্টা করে, সংগ্রাম করে সেই টিকে থাকে। বাঁচার অধিকার অর্জন করতে পারলেই সুখপাখি তার হাতে এসে ধরা দেয়। দুই ধরনের চেষ্টার মধ্যে বৈরাগ্য অন্যতম। বৈরাগ্যের জন্যও চেষ্টা দরকার।

৬

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ডভাবে শুধু আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই, এবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়। উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজে পেলে আমাদের আত্মবিনাশ যে অনিবার্য তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

[চ. বো. ১৫, সি. বো. ১৫, কু. বো. ১২]

সারাংশ : আজকের দুনিয়ায় লক্ষ্যহীন নেশার মতো মানুষ কেবল ধন–সম্পদ বাড়ানোর প্রতিযোগিতা করছে। এই যে অর্থ ও সম্পদের দিকে মানুষের নেশা, সে–নেশা তার আত্মবিকাশের পথ সংকীর্ণ করবে। কাজেই আত্মবিনাশের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ওপরে ওঠার সিঁড়ির সন্ধান পাওয়া প্রয়োজন। মনুষ্যত্ব ব্যাপক হারে লোপ পেতে থাকলে আমাদের ধ্বংস সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

৭

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্যের কারণ– মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বুকে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে; পশুবল ও অর্থবল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়নে সক্ষম।

[চ. বো. ১২]

সারাংশ : জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও মনুষ্যত্বের বলে মানুষ সৃষ্টির সেরা। পেশিশক্তি ও বিত্তের দাপট মানুষকে বড় করে তোলে না। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। এ ধরনের মানুষের অবদানেই অর্জিত হয় জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতি।

৮

তুমি জীবনকে সার্থক সুন্দর করতে চাও? ভাল কথা, কিন্তু সেজন্য তোমাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হবে। সব তুচ্ছ করে যদি তুমি লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হতে পার, তবে তোমার জীবন সুন্দর হবে। আরও আছে। তোমার ভিতর এক 'আমি' আছে সে বড় দুরন্ত। তার স্বভাব পশুর মত বর্বর ও উচ্ছৃঙ্খল। সে কেবল ভোগবিলাস চায়। সে বড় লোভী। এই 'আমি' –কে জয় করতে হবে। তবেই তোমার জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

[য. বো. ১৪; দি. বো. ১৪, ১০]

সারাংশ : জীবনকে সার্থকতায় মণ্ডিত করতে হলে মৃত্যুপণ করে সাধনা করতে হবে; যদি লক্ষ অভ্রান্ত থাকে তা হলে ব্যর্থ মনোরথ হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তোমাদের ভেতরের উচ্ছৃঙ্খল 'আমি'কে সংযত করে অকুতোভয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারলে জীবন অবশ্যই সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠবে।

৯

মানুষের সুন্দর মুখ দেখে আনন্দিত হয়ো না। স্বভাবে যে সুন্দর নয়, দেখতে সুন্দর হলেও তার স্বভাব, তার স্পর্শ, তার রীতিনীতিকে ঘৃণা করে। দুঃস্বভাবের মানুষ মানুষের হৃদয়ে জ্বালা ও বেদনা দেয়, তার সুন্দর মুখে মনুষ্য তৃপ্তি পায় না। অবোধ লোকেরাই মানুষের রূ প দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার ফল ভোগ করে। মানুষ নিজ স্বভাবে সুন্দর না হলেও সে স্বভাবের সৌন্দর্যকে ভালোবাসে। স্বভাব গঠনে কঠিন পরিশ্রম ও সাধনা চাই নইলে শয়তানকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। যে স্বভাব গঠনের চেষ্টা করে, চিন্তা করে, সে এবাদত বা উপাসনা করে।

[কু. বো. ১১]

সারাংশ : স্বভাবে সুন্দর না হলে মানুষ সত্যিকারের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। শারীরিক সৌন্দর্য দেখে শুধু বোকা লোকেরা ঠকে। অসুন্দর স্বভাবের মানুষও সুন্দর স্বভাবের মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্বভাব গঠন সাধনার ব্যাপার; এই সাধনায় যে ব্যক্তি লিপ্ত সেই প্রকৃতপক্ষে আলল্লাহতায়ালার এবাদত বা উপাসনা করে।

১০

কিসে হয় মর্যাদা? দামি কাপড়, গাড়ি–ঘোড়া, না ঠাকুর–দাদার কালের উপাধিতে? না, মর্যাদা এসব জিনিসে নেই। আমি দেখতে চাই তোমার ভিতর, তোমার বাহির, তোমার অন্তর। আমি জানতে চাই, তুমি চরিত্রবান কি–না, তুমি সত্যের উপাসক কি–না। তোমার মাথা দিয়ে কুসুমের গন্ধ বেরবয়, তোমায় দেখলে দাস–দাসী দৌড়ে আসে, প্রজারা তোমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়, তুমি মানুষের ঘাড়ে চড়ে হাওয়া খাও, মানুষকে দিয়ে জুতা খোলাও, তুমি দিনের আলোতে মানুষের টাকা আত্মসাৎ করো। বাপ–মা, শ্বশুর–শাশুড়ি তোমায় আদর করেন, আমি তোমায় অবজ্ঞা বলবো, যাও।

সারাংশ : যারা সত্যের উপাসক, চরিত্রবান ও মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন তারাই জীবনে সত্যিকার মর্যাদা লাভ করে। অর্থবিত্ত, বাড়ি, গাড়ি বংশ গৌরবের ওপর মর্যাদা নির্ভর করে না। মানুষের মর্যাদা নির্ভর করে মহৎ মানবিক গুণাবলির ওপর।

১১

সকল প্রকার কায়িক শ্রম আমাদের দেশে অমর্যাদাকর বলে বিবেচিত হয়ে আসতেছে। শ্রম যে আত্মসম্মানের অণুমাত্র হানিজনক নহে এবং মানুষের শক্তি, সম্মান ও উন্নতির ইহাই প্রকৃষ্ট ভিত্তি, এ বোধ আমাদের মধ্যে এখনও জাগে নাই। জগতের অন্যত্র মানবসমাজ শ্রমসামর্থ্যের উপর নির্ভর করে সৌভাগ্যের সোপানে উঠছে আর আমরা কায়িক শ্রমকে ঘৃণা করে দিন দিন দুর্গতি ও হীনতায় ডুবে যাচ্ছি। যারা শ্রমবিমুখ বা পরিশ্রমে অসমর্থ, জীবন সংগ্রামে তাদের পরাজয় অনিবার্য। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে অযোগ্যের পরিত্রাণ নাই। যারা যোগ্যতম, তাদেরই বাঁচবার অধিকার এবং অযোগ্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং, পরিশ্রমের অমর্যাদা আত্মহত্যারই নামান্তর।

সারাংশ : কায়িক শ্রম আমাদের দেশে আজও মর্যাদা লাভ করেনি। অথচ একে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে পৃথিবীর সভ্য ও উন্নত জাতিগুলো সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করছে। সেক্ষেত্রে কায়িক পরিশ্রমকে ঘৃণা করে আমরা জীবন–সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ছি। শ্রম–বিমুখতার চেয়ে মারাত্মক আর কিছু হতে পারে না। যারা কায়িক পরিশ্রম করাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে থাকে তারা প্রকারান্তরে আত্মহননের দিকেই এগিয়ে চলছে।

১২

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীব–সত্তার ঘরেও সে কাজ করে। ক্ষুৎ পিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলার ভার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায় শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনের দিকও আছে, আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। কী করে, মনের মালিক হয়ে, অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

সারাংশ : জীবসত্তার চাহিদা পূরণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও মানবসত্তার জাগরণ কিংবা মনুষ্যত্ব অর্জন করাই জীবনের আসল লক্ষ্য। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষার কাজই হচ্ছে মানুষের অন্তরে মনুষত্ববোধ জাগ্রত করা, তাকে জীবনের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া।

১৩

জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য হাসি ও আনন্দ। যার প্রত্যেক কাজে আনন্দ স্ফূর্তি তার চেয়ে সুখী আর কেউ নয়। জীবনে যে পুরোপুরি আনন্দ ভোগ করতে জানে আমি তাকে বরণ করি। স্থূল দৈনন্দিন কাজের ভেতর সে এমন একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছে যা তার নিজের জীবনকে সুন্দর ও শোভনীয় করেছে এবং পারিপার্শ্বিক দশজনের জীবনকে উপভোগ্য করে তুলেছে। এই যে এমন একটা জীবনের সন্ধান যার ফলে সংসারকে মরুভূমি বোধ না হয়ে ফুলবাগান বলে মনে হয়। সে সন্ধান সকলের মেলে না। যার মেলে সে পরম ভাগ্যবান। এরূ প লোকের সংখ্যা যেখানে বেশি সেখান থেকে কলুষ বর্বরতা আপনাআপনি দূরে পালায়। সেখানে প্রেম, পবিত্রতা সর্বদা বিরাজ করে।

সারাংশ : হাসি ও আনন্দ মানবজীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় বহন করে। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সকল কর্মে আনন্দঘন পরিবেশ বজায় রাখতে পারলে পারিপার্শ্বিক জীবন হয় সুন্দর ও শোভন। ফলে সমাজজীবন থেকে কদর্যতা দূর হয়ে প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

১৪

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাণ্ডগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে ক্রোধ। যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে, তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানি সর্বদা হাসিমাখা, তুমি দেব ভাবে পরিপূর্ণ মনে কর, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ ধরে না, একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাইও; দেখিবে, সেই স্বর্গের সুষমা আর নাই– নরকাগ্নিতে বিকট রূ প ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কী এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গান করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোন রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না। [য. বো. ১১]

সারাংশ : মানুষের বড় শত্রু ক্রোধ। কারণ ক্রোধ বা রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে নানা অঘটন ঘটিয়ে ফেলে। পৃথিবীতে যত অমানবিক নারকীয় ঘটনা ঘটে তার জন্য মূলত ক্রোধই দায়ী। ক্রোধ মানুষকে নিয়ে যায় পশুর পর্যায়ে।

১৫

শ্রমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ কর। কালি–ধুলার মাঝে রৌদ্র বৃষ্টিতে কাজের ডাকে নেমে যাও। বাবু হয়ে ছায়ায় পাখার তলে থাকবার কোন দরকার নেই। এ হচ্ছে মৃত্যুর আয়োজন। কাজের মধ্যে কুবুদ্ধি, কুমতলব মানবচিত্তে বাসা বাঁধতে পারে না। কাজে শরীরের সামর্থ্য জন্মে। স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ, স্ফূর্তি সকলই লাভ হয়। পরিশ্রমের পর যে অবকাশ লাভ হয় তা পরম আনন্দের অবকাশ। তখন কৃত্রিম আয়োজন করে আনন্দ করবার কোনো প্রয়োজন হয় না। শুধু চিন্তার দ্বারা জগতের হিত সাধন হয় না। শুধু চিন্তা করে মানুষ পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয় না। মানব–সমাজে মানুষের সঙ্গে কাজে, রাস্তায়, কারখানায়, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ নিজেকে পূর্ণ করে। চিন্তা ও পুস্তক মানব মনের পাপড়ি খুলে দেয় মাত্র। বাকি কাজ সাধিত হয় সংসারের কর্মক্ষেত্রে।[ঢ. বো. ০৮]

সারাংশ : সৌভাগ্যের মূলে রয়েছে কঠোর শ্রম। স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ–এ সবের মূলেই আছে শ্রম। পাশাপাশি শ্রমবিমুখ হলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কেবল চিন্তা দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধিত হয় না। চিন্তার সঙ্গে কাজের তথা পরিশ্রমের প্রয়োজন। তাহলে জীবনে আসবে পরিপূর্ণতা, অনিবার্য হয়ে ধরা দেবে সাফল্য।

১৬

জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্যসম্ভার, দালান–কোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবন পণ করে অন্যায়ের বিরবদ্ধে দাঁড়ানোর ৰমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দুর্মূল্য হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতির অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সব রকম মূল্যবোধের বৃহত্তম বাহন ভাষা তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব লেখক আর সাহিত্যিকদের।[য. বো. ১৫, ব. বো. ১৫, সি. বো. ১৪]

সারাংশ : বাইরের শক্তিতে নয় জাতি বড় হয় মনের ঐশ্বর্যে। মনের এই ঐশ্বর্য গড়ে ওঠে জীবনাশ্রয়ী মূল্যবোধে– যার মূলে রয়েছে অন্যায়ের বিরবদ্ধে আপসহীনতা ও নৈতিক চেতনা। জাতিসত্তার ভিত্তিকে দৃঢ় করতে হলে এই মূল্যবোধের প্রসার দরকার। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বত্র তা সঞ্চারিত করার দায়িত্ব লেখক সমাজের।

১৭

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা। বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্প প্রাণ স্থূল বুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর, বিকৃত বুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহঙ্কার। তারই চরণে তারা নিবেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার–এ সবের নিশান উড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানবপ্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতা উপলব্ধিহীন বুলি।

সারাংশ : মানুষকে বড় করে তোলার পাশাপাশি তাকে বিকশিত করাও সমাজের কাজ। কিন্তু স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু লোক সংসার পূর্ণ করে রেখেছে যারা অপরের সার্থকতার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ পায়নি, বরং অহংকার রূ প দেবতার হাতের পুতুল। এ অহংকার ব্যক্তিগত থেকে জাতিগত পর্যায়ে প্রসারিত। তাদের মুখে মানবপ্রেমের কথা ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছুই নয়।

১৮

কোনো সভ্য জাতিকে অসভ্য করবার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে তারা বাঁচে না। দেশকে বা জাতিকে উন্নতি করতে ইচ্ছা করলে সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এটাই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির ভিতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্ট কর, আর কিছুর আবশ্যক নাই। [রা. বো. ১৪]

সারাংশ : মানব–কল্যাণের উৎস হলো সাহিত্য ও সংস্কৃতি আর লেখক ও সাহিত্যিকরা জাতির আত্মা। একটি সভ্য জাতিকে অসভ্য বা ধ্বংস করতে চাইলে সব বই ধ্বংস এবং সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের হত্যা করলেই হলো। এ সাহিত্যিক–সমাজকে ধ্বংস করলেই উন্নত শীর্ষ জাতি ধ্বংস হয়ে পড়েব।

১৯

জাতিকে শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ, ধনসম্পদশালী, উন্নত ও সুখী করতে হলে শিৰা ও জ্ঞান বর্ষার বারিপাতের মত সর্বসাধারণের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করতে হবে। দেশে সরল ও সহজ ভাষায় নানা প্রকারের পুস্তক প্রচার করলে এই কাজ সিদ্ধ হয়। শক্তিশালী দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরবষদের লেখনীর প্রভাবে একটি জাতির মানসিক ও পার্থিব অবস্থার পরিবর্তন অপেৰাকৃত অল্প সময়ে সংসাধিত হয়ে থাকে। দেশের প্রত্যেক মানুষ তার ভুল ও কুসংস্কার, অন্ধতা ও জড়তা, হীনতা ও সংকীর্ণতাকে পরিহার করে একটা বিনয়–মহিমোজ্জ্বল উচ্চ জীবনের ধারণা করতে শেখে, মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম মনে করে, আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন হয় এবং গভীর দৃষ্টি লাভ করে। তারপর বিরাট জাতির বিরাট দেহে বিরাট শক্তি জেগে ওঠে। [কু. বো. ১৫, ব. বো. ১১]

সারাংশ : সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে শিৰার প্রসার ঘটিয়েই কেবল জাতির সঠিক উন্নয়ন সম্ভব। সহজ ও সরল ভাষায় বই লেখা হলে তা জ্ঞান–বিজ্ঞানের পথকে সুগম করতে পারে। এৰেত্রে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহৎ লেখকদের ভূমিকা বিশেষ গুরবত্বপূর্ণ। তাঁদের লেখনী জাতিকে কুসংস্কার থেকে মহৎ জীবনে ব্রতী করে। এভাবেই জাতির মধ্যে আত্মশক্তির জাগরণ ঘটে এবং আলোকিত সমাজ গঠিত হয়।

২০

প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিৰা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন পরীৰা পাসটাই বড় হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। এই কারণেই পরীৰায় পাস করা লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে, কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানীর। যেখানেই পরীৰা পাসের মোহ তরবণ ছাত্র–ছাত্রীদের উৎকণ্ঠিত রাখে সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত জীবনযাপন করে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে অৰয় আসন লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরবণ সমাজকে উন্মুখ করতে হবে। সহজ লাভ আপাতত সুখের হলেও পরিণামে কল্যাণ বহন করে না। পরীৰা পাসের মোহ থেকে মুক্ত না হলে তরবণ সমাজের সামনে কখনই জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত হবে না। [রা. বো. ০৯, ব. বো. ০৯]

সারাংশ : জ্ঞানার্জনের দ্বারাই কেবল একটি জাতি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করতে পারে। ছাত্র–ছাত্রীদের শিৰা যদি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে না হয় পরীৰা পাসের উদ্দেশ্য হয় তবে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে না। আমাদের তরবণ সমাজ পরীৰা পাসের জন্য মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, প্রকৃত জ্ঞানচর্চার প্রতি তাদের অনুরাগ নেই। স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

২১

নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কি থাকিত? একটা ভালো কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না,– সে ভালো কাজের দাম কী? একটা ভালো কিছু লিখিলাম, তাহার নিন্দুক কেহ নাই– ভালো গ্রন্থের পৰে এমন মর্মান্তিক অনাদর কী হইতে পারে? জীবনকে ধর্মচর্চায় উৎসর্গ করিলাম, যদি কোন মন্দ লোক তাহার মধ্যে মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল, তবে সাধুতা যে নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িল। মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে চায়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সঙ্গতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দ দোষীকে সংশোধন করিবার

জন্য আছে তাহা নহে, মহত্ত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ। [ঢা. বো. ১২]

সারাংশ : নিন্দা আছে বলেই পৃথিবীতে জীবন ও কর্মের গৌরব আছে। নিন্দুকেরা যেকোনো কাজের খুঁত ধরে বেড়ায়। এই নিন্দার কাছে যে হার মানে, গৌরবের জয়মাল্য তার জন্য নয়। তাই নিন্দার কাঁটা মাড়িয়েই মহত্ত্বকে গৌরব অর্জন করতে হয়।

২২

সত্য ওজন দরে বা গজের মাপে বিক্রয় করা হয় না, তাহা ছোট হইলেও বড়। পর্বত পরিমাণ খড়–বিচালি স্ফুলিঙ্গ পরিমাণ আগুনের চেয়ে দেখিতেই বড়, কিন্তু আসলে বড় নহে। সমস্ত সেজের মধ্যে যেখানে সলিতার সূচাগ্র পরিমাণ মুখটিতে আলো জ্বলিতেছে সেখানেই সমস্ত সেজটার সার্থকতা। তেলের নিম্নভাগে অনেকখানি জল আছে, তাহার পরিমাণ যতই হইক সেটাকে আসল জিনিস বলিবার কোনো হেতু নাই। সকল সমাজে সমাজ–প্রদীপের আলোটুকু যাঁহারা জ্বালাইয়াছেন, তাঁহারা সংখ্যার হিসাবে নগণ্য, সভ্য হিসাবে তাঁহার সমাজে অগ্রগণ্য। তাঁহারা দগ্ধ হইতেছেন। আপনাকে তাঁহারা নিমিষে ত্যাগ করিতেছেন, তবু তাঁহাদের শিৰা সমাজের সকলের চেয়ে উচ্চ– সমাজে তাঁহারাই সজীব, তাঁহারাই দীপ্যমান। [সি. বো. ১২]

সারাংশ : পরিমাণ দিয়ে সত্যের গুরবত্ব অনুধাবন করা যায় না। সত্য যতই ছোট হোক কিংবা পরিমাণে যতই কম হোক তা আপন মহিমায় ভাস্বর। সমাজজীবনে যাঁরা সত্যের আলো জ্বালেন তাঁরা সংখ্যায় হয়তো খুব বেশি নন। কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগের কারণেই সমাজ এগিয়ে চলেছে।

২৩

সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ করিয়া, একঘরে হইয়া দুই বেলা দুই মুঠো ভাত বেশি করিয়া খাইয়া নিদ্রা দিলেই তো চলিবে না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে দেনা–পাওনা করিয়া তবে আমরা মানুষ হইতে পারিব। যে জাতি তাহা না করিবে, বর্তমান কালে সে টিকিতে পারিবে না। তাই, আমাদের দেশের চাষের ৰেতের উপর সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো ফেলিবার দিন আসিয়াছে। আজ শুধু একলা চাষির চাষ করিবার দিন নাই। আজ হাতার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষির লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়, সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহার সংযোগ হওয়া চাই।

সারাংশ : আধুনিক বিশ্ব জ্ঞান–বিজ্ঞানে ক্রমবিকাশমান। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে যথার্থ জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতিতেও আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। কৃষিৰেত্রে কার্যকর অগ্রগতি এলেই আমাদের সমৃদ্ধি নিশ্চিত হবে।

২৪

একজন মানুষ ভালো কি মন্দ আমরা তা বুঝতে পারি তার ব্যবহার দিয়ে। সে ভদ্র কি অভদ্র তাও বুঝতে পারি তার ব্যবহার দিয়ে। ব্যবহার ভালো হলে লোকে তাকে ভালো বলে। তাকে পছন্দ করে। ব্যবহার খারাপ হলে লোকে তাকে খারাপ বলে। তাকে অপছন্দ করে। তার সঙ্গে মিশতে চায় না। তার সঙ্গে কাজ করতে চায় না। তাকে কাছে ডাকতে চায় না। তোমার ব্যবহার দিয়েই তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয়।

সারাংশ : সুন্দর ব্যবহারের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পরিচয় নিহিত। মানুষের কথাবার্তা, মনোভাব ও আদব-কায়দার মধ্য দিয়েই সুন্দর ব্যবহারের প্রকাশ ঘটে। ভালো ব্যবহার দিয়ে সহজেই অপরের ভালোবাসা পাওয়া যায়।

২৫

সূর্যের আলোতে রাতের অন্ধকার কেটে যায়। শিৰার আলো আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে। আমাদের দৃষ্টিতে চারপাশের জগৎ আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। আমরা জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাই; শিৰার আলো পেয়ে আমাদের ভেতরের মানুষটি জেগে ওঠে। আমরা বড় হতে চাই, বড় হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। আমরা সুন্দর করে বাঁচতে চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। আর সুন্দর করে বাঁচতে হলে চাই জ্ঞান। সেই জ্ঞানকে কাজেও লাগানো চাই। শিৰার ফলে আমাদের ভেতর যে শক্তি লুকানো থাকে তা ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। আমরা মানুষ হয়ে উঠি।

সারাংশ : সূর্যের আলো যেমন অন্ধকার দূর করে, তেমনি শিৰার আলো মনের অন্ধকার দূর করে। শিৰা আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে লুক্কায়িত শক্তির বিকাশে সাহায্য করে। শিৰার ফলে আমরা জ্ঞান ও দৰতা লাভ করে নিজের শক্তিকে কাজে লাগাই। যথার্থ মানুষ হয়ে উঠি।

২৬

সময় ও স্রোত কাহারও অপেৰায় বসিয়া থাকে না, চিরকাল চলিতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় করো, ইহাকে ভয় দেখাও, ভ্রূৰেপও করিবে না। সময় চলিয়া যাইবে, আর ফিরিবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সময় একবার গত হইয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না কেন গত সময় আর ফিরিয়া আসিবে না। [ব. বো. ০৮]

সারাংশ : সময় চিরবহমান। শত চেষ্টা করলেও সময়ের গতিকে কেউ রৰদ্ধ করতে পারে না। চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে লুপ্ত-স্বাস্থ্য বা ধ্বংস হওয়া ধন-সম্পদ পুনরায় উদ্ধার করা যেতে পারে। কিন্তু যে সময় একবার চলে যায় শত চেষ্টায়ও তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

২৭

ছাত্রজীবন আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের সময়। এ সময় যে যেমন বীজ বপন করবে, ভবিষ্যৎ জীবনে সে সেরূ প ফল ভোগ করবে। এ সময় যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন করে যাই, তবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় হবে। আর যদি হেলায় সময় কাটিয়ে দিই, তাহলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে শিৰা জীবন ও জীবিকার পথে কল্যাণকর, যে শিৰা মানুষকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে, তা-ই সর্বোৎকৃষ্ট শিৰা। ছাত্রদের জীবন গঠনে শিৰকসমাজ গুরবত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের জীবন গঠিত হয় এবং উন্মুক্ত হয় মহত্তর সম্ভাবনার পথ। [রা. বো. ১০]

সারাংশ : ছাত্রজীবন মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়। ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য এ সময়ের কর্মকাণ্ডের ওপরই নির্ভর করে। তাই ছাত্রজীবন থেকেই সুন্দর জীবন গঠনের চর্চা শুরব করতে হবে। ছাত্রদের জ্ঞানার্জন ও চরিত্র গঠনে শিৰকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ। তাঁদের সঠিক নির্দেশনা পেলে শিৰার্থীর জীবন বিকশিত হয়।

২৮

অভাব আছে বলিয়াই জগৎ বৈচিত্র্যময়। অভাব না থাকিলে জীব সৃষ্টি বৃথা হইতো। অভাব আছে বলিয়াই অভাব পূরণের জন্য এতো উদ্যম, এতো উদ্যোগ। আমাদের সংসার অভাবৰেত্র বলিয়াই কর্মৰেত্র। অভাব না থাকিলে সকলকেই

স্থাণু, স্থবির হইতে হইতো, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনাময় হইতো। মহাজ্ঞানীরা জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই সে সেবার পাত্র যত্রতত্র সদাকাল ছড়াইয়া রহিয়াছে। যিনি অন্নদান, বস্ত্রদান, জ্ঞানদান, বিদ্যাদান করেন তিনি যেমন জগতের বন্ধু, তেমনি যিনি দুঃখে আমাদের সেবার পাত্রে অজস্র দান করিতেছেন, তিনিও মানবের পরম বন্ধু। দুঃখকে শত্রব মনে করিও না, দুঃখ আমাদের বন্ধু।

সারাংশ : অভাব বা প্রয়োজনের কারণেই মানুষ নানা কিছু সৃষ্টি করে। আর সৃষ্টির প্রেরণাই মানুষের কাজের উৎস। অভাব না থাকলে মানুষ অলস ও উদ্যমহীন হয়ে যেত। দুঃখ আছে বলেই মহামানবগণ সেবার হাত প্রসারিত করেন। দুঃখে যিনি এগিয়ে আসেন, তিনি মানবের পরম বন্ধু। দুঃখের আগুনে পুড়েই মানুষ খাঁটি সোনা হয়। তাই দুঃখকে শত্রব ভাবা ঠিক নয়।

২৯

বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত্র তদপেৰাও অধিকতর মূল্যবান। অতএব কেবল বিদ্বান বলেই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করেও থাকে তথাপি তার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সাপের মস্তকে মণি থাকে। মণি মূল্যবান বটে কিন্তু তাই বলে যেমন মণি লাভের নিমিত্ত বিষধর সাপের সাহচর্য বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সেরূ প বিদ্যা আদরণীয় বিষয় হলেও বিদ্যা লাভের নিমিত্তে দুর্জন বিদ্বানের নিকট গমন করা বিধেয় নয়। কেননা, দুর্জনের সাহচর্যে আপনার নিষ্কলুষ চরিত্রও কলুষিত হতে পারে এবং এরূ পে মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ নষ্ট হতে পারে। [রা. বো. ১২]

সারাংশ : চরিত্র মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। এটি বিদ্যার চেয়েও মূল্যবান। মাথায় মণি থাকলেও সাপ যেমন ভয়ংকর তেমনি চরিত্রহীন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও তার সাহচর্য বর্জনীয়। এতে নিজের চরিত্র কলঙ্কিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৩০

খুব ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যেমন সূর্যকে দেখা যায়, তেমনি ছোট ছোট কাজের ভেতর দিয়েও কোনো ব্যক্তির চরিত্রের পরিচয় ফুটে ওঠে। বস্তুত মর্যাদাপূর্ণভাবে ও সুচারুরূ পে সম্পন্ন ছোট কাজেই চরিত্রের পরিচয়। অন্যের প্রতি আমাদের ব্যবহার কীরূ প তা-ই হচ্ছে আমাদের চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরীৰা। বড়, ছোট ও সমতুল্যের প্রতি সুশোভন ব্যবহার আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন উৎস।

[কু. বো. ১৩, ১০; সি. বো.১০]

সারাংশ : চরিত্রের মধ্য দিয়েই মানুষের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়। ছোট ছোট সৎকাজের ভেতর দিয়ে মানুষের মনের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। ছোট–বড় সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার আমাদের জীবনকে সুন্দর করে।

৩১

অপরের জন্য তুমি প্রাণ দাও, আমি তা বলতে চাইনে। অপরের ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর করো। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বলো। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটু করুণ চাহনি নিৰেপ করো, তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান, মানবতাসম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন, পরের দুঃখকে ঢেকে রাখতে গৌরববোধ করেন।

[রা. বো. ১৩, চ. বো. ১৩]

সারাংশ : মানুষের জন্য অনেক বড় কিছু করতে না পারলেও ছোট ছোট কাজের দ্বারাও আমরা মানুষের উপকারে আসতে পারি। সাধ্যমতো সহায়তা দিয়ে অন্যের মনে আশার সঞ্চার করতে পারি। মানবিক আচরণ দিয়ে অসহায় মানুষকে সান্ড়না দিতে পারি। এভাবেই মহৎ মানুষেরা তাঁদের মহত্ত্বের পরিচয় দেন।

৩২

মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলে থাকেন। কিন্তু জগৎ এমনি ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকলে তার স্থান কোথাও নেই– সমাজে নেই, স্বজাতির নিকট নেই, ভ্রাতা-ভগিনীর নিকট নেই, স্ত্রীর নিকট নেই। স্ত্রীর ন্যায় ভালোবাসে–বলো তো জগতে কে আর আছে? টাকা না থাকলে অমন অকৃত্রিম ভালোবাসারও আশা নেই, কারো নিকট সম্মান নেই। টাকা না থাকলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তেও টাকা, জগতে টাকারই খেলা।

সারাংশ : পৃথিবীতে অর্থের চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। যার অর্থ নেই সমাজ সংসারে কোথাও তার মূল্য নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত টাকাই মানুষের ভাগ্যের মূল নিয়ন্তা।

৩৩

মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বলেই মানুষের জীবনে যা–কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হবার দরকার নেই। জগতে যে–সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরব মূলে এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি লম্পট নও, তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর; তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়। চরিত্রবান মানে এই।

সারাংশ : চরিত্রই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। চরিত্রবান ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে। জগতের সকল মহাপুরুষের গৌরবের মূলে আছে এই চরিত্রশক্তি। সত্যবাদী, বিনয়ী, ন্যায়নিষ্ঠ, জ্ঞানবান, পরদুঃখকাতর স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিকেই চরিত্রবান বলা যায়।

৩৪

নিষ্ঠুর ও কঠিন মুখ শয়তানের। কখনও নিষ্ঠুর বাক্যে প্রেম ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হয় না। কঠিন ব্যবহারে ও রূ ঢ়তায় মানবাত্মার অধঃপতন হয়। সাফল্য কিছু লাভ হইলেও যে আত্মা দরিদ্র হইতে থাকে, সুযোগ পাইলে সে আপন পশু স্বভাবের পরিচয় দেয়। যে পরিবারে কর্তা ছোটদের সঙ্গে কদর্য ব্যবহার করে, সে পরিবারের প্রত্যেকের স্বভাব অতিশয় মন্দ হইতে থাকে। শিশুর প্রতি একটি নিষ্ঠুর কথা, এক–একটা মায়াহীন ব্যবহার, তাহার মনুষ্যত্ব অনেকখানি রক্তের মতো শুষিয়া নেয়, পরান্তরে স্নেহ–মমতা শিশুর মনুষ্যত্বকে সঞ্জীবিত করে। পরিবারের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য সকলেরই প্রচেষ্টা করা উচিত। ইহাই পরিবারের প্রতি প্রেম।

সারাংশ : নিষ্ঠুর ও কঠিন আচরণে শিশুর মানসিক বিকাশ ব্যহত হয়। এ ধরনের আচরণ মনুষ্যত্বের অন্তরায়। তাই পারিবারিক প্রেম ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য একে অপরের সঙ্গে রূ ঢ় ও কঠিন ব্যবহার পরিহার করা উচিত।

❑ সারমর্ম

১

বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করে পাই শস্যকণা।

দিতে যদি হয়, দে মা প্রসন্ন সহাস,
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ৰতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন্ বসুমতি–
আমার গৌরব তাতে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাতে একেবারেই ছাড়ে।

[ঢা. বো. ১১; রা. বো. ১৩; সি. বো. ১৫, ১৩]

সারাংশ : মানবজীবনে শ্রমের মূল্য অপরিসীম। অপরের করৰণা কিংবা সাহায্য প্রত্যাশা না করে নিজের ৰমতা বা সামর্থ্যকে কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ। এর মাধমেই মানুষের গৌরব বাড়ে এবং সে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়।

২

আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই,
সকলের সুখ, সখা, সুখ শুধু তাই।
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার
যদি না সবারে অংশ আমি দিতে পাই।
সকলের সাথে বন্ধু সকলের সাথে,
যাইব কাহারে বলো ফেলিয়া পশ্চাতে?
ভাইটি আমার যে তো ভাইটি আমার।
নিয়ে যদি নাহি পারি হতে অগ্রসর,
সে আমার দুর্বলতা, শক্তি সে তো নয়।
সবই আপন হেথা, কে আমার পর?
হৃদয়ের যোগ সে কি কভু ছিন্ন হয়?
এক সাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি
এসো বন্ধু, এ জীবন মধুময় করি। [কু. বো. ১০]

সারমর্ম : একাকী জীবনে কখনোই সুখ উপলব্ধি করা যায় করা না। কেননা সমগ্র মানবজাতিই আত্মার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। তাই সবাই মিলেমিশে সুখ–দুঃখ ভাগাভাগি করে আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে থাকার মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত।

৩

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ–পিছে।
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব তবু আজ যতৰণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাবো আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সারমর্ম : পৃথিবীতে নতুনের জন্য পুরাতনকে স্থান ছেড়ে দিতে হয়– এটাই প্রকৃতির নিয়ম। জীর্ণ পৃথিবীর ব্যর্থ, মৃত, ধ্বংসস্তূপ আর গৰানি দূর করে তাকে নবীনদের বাসযোগ্য আবাসভূমি হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের একান্ত কাম্য।

৪

কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল
মাঠ ভরে দেই আমি কত শস্য ফল
পর্বত দাঁড়ায়ে রহে কি জানি কি কাজ
পাষাণের সিংহাসনে তিনি মহারাজ
বিধাতার অবিচার কেন উঁচু নিচু
সে কথা বুঝিতে আমি নাহি পারি কিছু।
গিরি কহে সব হলে সমতল পারা,
নামিত কি ঝরনার সুশীতল ধারা? [চ. বো. ১০]

সারমর্ম : সমতল উর্বর মাঠের তুলনায় অটল পর্বতকে নিষ্ফলা পাষাণ মনে হলেও পর্বত থেকে নেমে আসা ঝর্ণাধারাতেই পুষ্ট ও সিক্ত হয় সমতল ভূমির ফসলের ৰেত। বস্তুত পৃথিবীতে ছোট–বড়, উঁচু–নিচু সব কিছুই একে অপরের পরিপূরক। কোনোটিই অপ্রয়োজনীয় নয়।

৫

ধন্য আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়
অসার সংসার চক্র ঘোরে নিরবধি;
দাঁড়াইত স্থিরভাবে চলিত না, হায়
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি।
ভবিষ্যৎ অন্ধ মূঢ় মানবসকল
ঘুরিতেছে কর্মৰেত্রে বর্তুল–আকার;
তব ইন্দ্রজাল মুগ্ধ, পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন যুদ্ধে হায় অনিবার।
নাচায় পুতুল যেবা দৰ বাজিকরে,
নাচাও তেমনি তুমি অর্বাচীন নরে।

সারমর্ম : জীবনে আশাই মানুষের অদৃশ্য চালিকাশক্তি। আশার ছলনায় পড়ে মানুষ সংসারের নানা ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হয়ে প্রতারিত হচ্ছে বার বার। কিন্তু আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আশার তরি বেয়েই মানবজীবন এগিয়ে চলে।

৬

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়–মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরার প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি–অশ্রব–ময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর–আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বল সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়,
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

সারমর্ম : সুন্দর এই পৃথিবীর রূ প–রস–গন্ধ–স্পর্শ ছেড়ে কেউ চলে যেতে চায় না। সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনা ও মিলন–বিরহে পরিপূর্ণ এই জগৎ–সংসার। জীবনে সেই লীলাবৈচিত্র্যকে উপেৰা করা অসম্ভব। তাই প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্যকে ভালোবেসে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়।

৭

হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান,
অসীম ৰমতা তার অতুল সম্মান,

হউক বিভব তার সম সিন্ধু জল,
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ণ উজ্জ্বল,
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্য মাঝে,
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে,
হউক তাহার রূ প চন্দ্রের উপম,
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন সে রোস্তম,
শত দাস দাসী তার সেবুক চরণ,
করবক স্তাবকদল স্তব সংকীর্তন।
কিন্তু যে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত,
স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিঞ্চিৎ,
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর
অতীব ঘৃণিত সেই পাষণ্ড বর্বর।

সারমর্ম : জন্মভূমির প্রতি যার ভালোবাসা নেই সে পশুর চেয়ে অধম। মানুষ জ্ঞান, সম্মান, সম্পদের অধিকারী হয়ে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে পারে। খ্যাতির শীর্ষে উঠলেও দেশপ্রেমহীন মানুষের কোনো মর্যাদা নেই। সে পাষণ্ড ও বর্বর হিসেবেই ঘৃণিত হয়ে থাকে।

৮

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিষ্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা; –দিয়াছ তাপস,
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হল তরবার।
দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস, [ঢা. বো. ১২]

সারমর্ম : দারিদ্র্য জীবনকে করে মহিমান্বিত। দারিদ্র্য মানুষকে স্পষ্টভাষী করে, ফলে সে নির্মম বাণী প্রকাশের প্রেরণা পায়। নিজের দাবি জানাতে সাহস পায়। কিন্তু দারিদ্র্যের অভিশাপে জীবনের অনেক স্বপ্ন অপূর্ণ থাকে এবং সৌন্দর্য–আনন্দ বিনষ্ট হয়।

৯

ৰমা যেথা ৰীণ দুর্বলতা
হে রবদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি ওঠে খরখর সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।

সারমর্ম : ৰমা মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ এবং এটি মহত্ত্বের লৰণ। কিন্তু এই ৰমা যেন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্তরায় না হয়, যেন তা অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেয়। কারণ, অন্যায় করা আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া দুই–ই সমান অপরাধ।

১০

পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মত কেন বলিস?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মত কেন চলিস?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,
মুছে সেটুকু বাজে হলি, গৌরব কি বাড়ল তাতে?
আপনারে যে ভেঙে চুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে,
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে জন নামটা তার কদিন বাঁচে?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যারে,
খাঁটি ধন যা সেথায় পাবি, আর কোথাও পাবি নারে। [চ. বো. ১৪]

সারমর্ম : অন্ধ অনুকরণপ্রবণতা মানুষের জন্য বিশেষ ৰতিকর। কারণ, তাতে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি ও সৃজনশীলতার পথ রবদ্ধ হয়ে যায়। তাই কেবল নিজ মেধা ও যোগ্যতায় বিকাশের মাধ্যমেই মানুষ সত্যিকারের গৌরব ও মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

১১

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহ ক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশ দেশান্তর–মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে,
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভাল ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।

সারমর্ম : মাতৃক্রোড়ে স্নেহবন্দি বাঙালি স্বদেশের সীমীত পরিসরে সমাজ ও ধর্মের নানা বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। ফলে মুক্তপ্রাণের বিকাশ ব্যাহত। কঠিন জীবন–সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালিকে যথার্থ মানুষ হতে হলে বিশ্বের বিপুল কর্মোদ্যোগের স্রোতধারায় যুক্ত হতে হবে। তাহলেই চিন্তা ও কর্মের প্রসারিত চেতনায় জাতি হবে সমৃদ্ধ।

১২

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?
সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম,
ফল কহে সেও অতি নির্বোধ অধম।
খেয়াতরী চলে গেলে বসে থাকে তীরে,
কিসে পার হবে তারা না আসিলে ফিরে ॥
[চ. বো. ১৫, ব. বো. ১৫]

সারমর্ম : সময়ের কাজ সময়ে করার মাধ্যমেই মানুষ জীবনে সফলতা লাভ করে। সততা ও নৈতিকতার শিৰা ও গ্রহণ করা উচিত শৈশবকালেই। এই সময় সৎ কাজ করতে না শিখলে পরে সে অভ্যাস গড়ে ওঠে না। সময়ের কাজ সময়ে না করলে তার জন্যও জীবনে প্রচুর খেসারত দিতে হয়। কারণ, সুযোগ চলে গেলে তা হয়তো আর ফিরে আসে না।

১৩

"নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল
তরবগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল,

গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্ন দান;
স্বর্ণ করে নিজ রূ পে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ সুরে অপরে মোহিত;
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।" [কু. বো. ০৯]

সারমর্ম : পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মাঝেই জীবনের সার্থকতা। নদী যেমন নিজ জল পান না করে এটি অপরকে দান করে সেই রূ পে বৃৰ, গাভী, কাষ্ট, স্বর্ণ, বংশী ও জলধর পরের উপকারের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়; এমনকি জীবন পর্যন্ত দান করে। মহৎ ব্যক্তিরা এদের মতো নিজ স্বার্থ উপেৰা করে পরের উপকারে আত্মদান করেন। ত্যাগেই তাদের প্রকৃত সুখ।

১৪

নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরে আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে,
নিন্দুক সে ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে,
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে, পবিত্রতা আনে,
সাধকজনে নিস্তারিতে তার মত কে জানে?
বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার
বিশ্ব মাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর।
নিন্দুক যে বেঁচে থাকুক বিশ্ব হিতের তরে;
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে। [সি. বো. ১০]

সারমর্ম : যারা পরচর্চা করে তারাই নিন্দুক। নিন্দুকেরা সবারই ঘৃণার পাত্র। কিন্তু সে এখানে নিন্দুককে হৃদয়ের গভীর প্রশস্ততা দিয়ে পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কবির মতে, নিন্দুকের নিন্দার ভয়েই মানুষ নিজেকে সচেতন করে তোলে। তখন মানুষ আত্মশুদ্ধি অর্জন করে। নিজেকে পবিত্র করতে পারে। এ কারণে নিন্দুক কবির প্রিয়পাত্র।

১৫

হায় হায়, জন্মিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম কলি নয়ন কিরণে;
একটি জীবন–ব্যথা যদি না জুড়ালে,
বুক ভরা প্রেম ঢেলে, বিফল জীবনে,
আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা,
জনম বিশ্বের তরে, পরার্থে কামনা। [য. বো. ১৩]

সারমর্ম : অপরের কল্যাণ সাধন মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য। নিজের নয়, অপরের ব্যথা ও ব্যর্থতাকে দূর করার জন্যই তার জন্ম। জীবনে যেখানে দুঃখ–হতাশা মানবজীবন কুসুমকে ম্লান করে তুলেছে, সেখানে সকলের উচিত প্রেম ও ভালোবাসায় মানুষকে কাছে টানা। নচেৎ জীবন ব্যর্থ, কর্ম ব্যর্থ। অপরের হিত সাধন করতে পারাই জীবনের সার্থকতা।

১৬

স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালোবাসে;
সুখের আশা জ্বালে বুকে দুঃখের ছায়া নাশে।
স্বাধীনতা সোনার কাঠি খোদার সুধা দান,
স্পর্শে তাহার নেচে উঠে পূর্ণ দেহে দাণ।
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায় যাহার হৃদয় তলে
বুক ফুলায়ে দাঁড়ায় ভীরব স্বাধীনতার বলে।
দর্পভরে পদাহত উচ্চ করে শির,
শক্তিহীনেও স্বাধীনতা আখ্যাদানে বীর। [চ. বো. ০৮]

সারমর্ম : স্বাধীনতা মানুষের অমূল্য সম্পদ। স্পর্শমণির মতো এটি মানব–মন থেকে সকল দুঃখ গরানি দূর করে আশা–আনন্দে মন–প্রাণ ভরিয়ে দেয়। স্বাধীনতার স্পর্শে ভীরব কাপুরবষের বৰে ও প্রাণের সঞ্চার হয় এবং তারা একসময় মাথা উঁচু করে বীরের মতো দণ্ডায়মান হয়।

১৭

নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পলরবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল– নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে –
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।

সারমর্ম : মা ও মাতৃভূমি সবার কাছে প্রিয়। বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি–এর আকাশ-বাতাস, নদী, মাঠ, প্রকৃতি-নিসর্গ, মানুষ সবই আমাদের ভালোবাসার ধন। বাংলার আবহমান অপরূপ রূপে প্রতিটি বাঙালিই মোহমুগ্ধ।

১৮

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি,
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্ট গতি,
গৃহের প্রতি টান–
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রা রসে ভরা
মাথায় ছোটো বহরে বড় বাঙালি সন্তান।
ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।
ছুটছে ঘোড়া উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন–
বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধা-হীন।

সারমর্ম : বাঙালি শান্তশিষ্ট, কর্মহীন, আরামপ্রিয় ও অলস জাতি। এ জীবন কারো কাম্য হতে পারে না। তার চেয়ে সাহসী, কর্মী ও চঞ্চলতা-মুখর জীবনের অধিকারী হওয়া অনেক বেশি সম্মানের।

১৯

এই যে বিটপি-শ্রেণি হেরি সারি সারি–

কি আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি!
কেহ বা সরল সাধু-হৃদয় যেমন,
ফল-ভারে নত কেহ গুণীর মতন।
এদের স্বভাব ভালো মানবের চেয়ে,
ইচ্ছা যার দেখ দেখ জ্ঞানচক্ষে চেয়ে।
যখন মানবকুল ধনবান হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়।
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ,
অহংকারে উচ্চশির না করে কখন।
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত,
নীচ প্রায় কার ঠাঁই নহে অবনত।

সারমর্ম : গাছ ফলে পরিপূর্ণ হয়ে নত হয়। তাতে তার গৌরব থাকলেও অহংকার থাকে না। কিন্তু মানুষের অর্থ হলেই অহংকার, অর্থ ফুরিয়ে গেলেই মাথা নিচু হয়। গাছ ফলশূন্য হলেও কিন্তু মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকে। নীচ স্বভাবের মানুষের মতো সে কারো কাছে অবনত হয় না।

২০

সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।

সারমর্ম : মানবসভ্যতা নির্মাণে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে পুরুষের কথা যতটা লেখা হয়েছে, নারীর ততটা হয়নি। নারীকে তার কর্ম-স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখন দিন এসেছে সম-অধিকারের। নারী-পুরুষ সবাইকে সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

২১

হে সূর্য! শীতের সূর্য!
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি
যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষকের চঞ্চল চোখ
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।
হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!
সকালের এক টুকরো রোদ্দুর–
এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামি।

সারমর্ম : সূর্যের শক্তিতে ভূ–পৃষ্ঠে গাছপালা, জীব-জন্তু ও মানুষ জীবনধারণ করে। প্রচণ্ড শীতে সূর্যের একটু উত্তাপের জন্য সারারাত অপেক্ষা করে বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন শীতার্ত মানুষ। সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত এসব মানুষের কাছে সূর্যের উষ্ণতা সোনার চেয়েও মূল্যবান।

২২

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মা গো, তোমায় ভালোবেসে ॥
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রানির মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে ॥
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥
[দি. বো. ১৫, সি. বো. ১৪, ব. বো. ১৪, রা. বো. ১২]

সারমর্ম : ধন-রত্নে পূর্ণ না থাকলেও মাতৃভূমি প্রতিটি মানুষের কাছেই প্রিয়। স্বদেশ মানুষের মনে পূর্ণতা এনে দেয়। এজন্যই মানুষ দেশের মাটিতেই শেষ আশ্রয়টুকু চায়।

২৩

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ;
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদ না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে। [ঢা. বো. ১৪]

সারমর্ম : ত্যাগের মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত। অন্যকে বাদ দিয়ে কেউ একা চলতে পারে না। সব মানুষেরই দায়িত্ব অন্যের আনন্দ-বেদনাকে নিজের বলে গ্রহণ করা। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সুখী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

২৪

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথি।

শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলো ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারই সমান রাঙা।

সারমর্ম : জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ইত্যাদিতে পার্থক্য থাকলেও এ সকল পরিচয়ের ঊর্ধ্বে হচ্ছে মানুষ জাতি। সব মানুষের অনুভূতিই সমান। মানুষে মানুষে পার্থক্য করা তাই অযৌক্তিক। সকলের অনুভূতিকে মূল্য দিয়ে একসঙ্গে জীবনযাপন করলেই পৃথিবী সুন্দর হবে।

২৫

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।
মুহূর্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
রচে যুগ-যুগান্তর-অনন্ত মহান,
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
–এ ধরায় স্বর্গ শোভা নিত্য দেয় আনি। [দি. বো. ১২]

সারমর্ম : পৃথিবীর কোনো কিছুই তুচ্ছ নয়। ছোট ছোট বালুকণা যেমন মহাদেশ তৈরি করে, তেমনি বিন্দু বিন্দু জল মহাসাগরের জন্ম দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় যুগ–যুগান্তরের। সামান্য অপরাধের পথ ধরেই আসে মহাপাপ। আবার সামান্য একটু করুণা ও স্নেহের বাণী এ পৃথিবীতে স্বর্গসুখ এনে দিতে পারে।

২৬

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক– মানুষেতে সুরাসুর–
রিপুর তাড়নে যখন মোদের বিবেক পায়গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।
[চ. বো. ১২, য. বো. ১৫]

সারমর্ম : স্বর্গ বা নরক দূরে কোথাও নয় বরং মানুষের মাঝেই বিরাজ করে। খারাপ কাজ করে মানুষ যখন অনুতপ্ত হয়ে যন্ত্রণায় ভোগে, তখন সেটাই নরকযন্ত্রণা। পরস্পরের প্রতি বিভেদ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বে মানুষ এই পৃথিবীকে নরকে পরিণত করে। যখন সব বৈরিতা ভুলে একে অন্যকে বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসে, তখনই পৃথিবীতে নেমে আসে স্বর্গীয় সুখ।

২৭

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সেই পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইলো যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান! [রা. বো. ১৫]

সারমর্ম : পৃথিবীর যত উন্নতি সবই শ্রমজীবী মানুষের দান। তাদের নিরলস সেবা ও শ্রমের কল্যাণেই আমরা সুখী জীবনযাপন করি। অথচ তাদের এই শ্রমের মূল্য আমরা দিই না, তাদের দুঃখ-বেদনা অনুভব করতে চাই না। শ্রমজীবী এই মানুষেরাই সভ্যতার অগ্রযাত্রার মূল কারিগর। তারাই প্রকৃত শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা আমাদের কর্তব্য।

২৮

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা–
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই–বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় ॥

সারমর্ম : কবি সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন না। কবি কামনা করেন, তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি যেন যথাযথভাবে পালন করতে পারেন। বিপদ থেকে রক্ষা, দুঃখে সান্ত্বনা, কর্মের ভার লাঘব ইত্যাদি তাঁর প্রত্যাশিত নয়। কবির কামনা বিপদে, দুঃখে, ভয়ে তাঁর মনোবল যেন অটুট থাকে।

২৯

'তরুতলে বসে পান্থ শ্রান্তি করে দূর,
ফল আস্বাদনে পায় আনন্দ প্রচুর।
বিদায়ের কালে হাতে ডাল ভেঙে লয়,
তরু তবু অকাতর, কিছু নাহি কয়।
দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছে যখন,
তরুর আদর্শ কর জীবনে গ্রহণ।
পরার্থে আপন সুখ দিয়ে বিসর্জন,
তুমিও হও গো ধন্য তরুর মতোন।'

সারমর্ম : নিজেকে প্রকৃত মানুষরূপে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সবারই বৃক্ষের আদর্শ থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। মানুষ বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নেয়, এর ফল আস্বাদন করে, আবার যাওয়ার সময় সেই বৃক্ষের ডালপালা অকারণে ভেঙে যায়। কিন্তু বৃক্ষ কোনো প্রতিবাদ না করে নীরবে কেবল দান করে যায়। যেসব মানুষ অপরের আঘাতে জর্জরিত হয়েও তাদের মঙ্গল কামনা করে চলেন তাঁরাই প্রকৃত মহৎ।

৩০

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত
গিরি–গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,

তাজা জীবন্ত সে সব সৃষ্টি শ্রম–মহান,
চলমান–বেগে প্রাণ–উছল
রে নবযুগের স্রষ্টাদল
জোর কদমে চল্ রে চল্।

সারমর্ম : নষ্ট অতীতকে পেছনে ফেলে সকল বাধা–বিপত্তি অতিক্রম করে তরুণরাই এক নতুন জগৎ তৈরি করবে। তাদের সাধনাতেই জন্ম নেবে নতুন সৃষ্টি। তাই প্রাণচঞ্চল তরুণদেরকে দৃপ্তপদে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

২. ভাব–সম্প্রসারণ

কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় কখনো কোনো একটি বাক্যে বা কবিতার এক বা একাধিক চরণে গভীর কোনো ভাব নিহিত থাকে। সেই ভাবকে বিস্তারিতভাবে লেখা, বিশ্লেষণ করাকে ভাবসম্প্রসারণ বলে। যে ভাবটি কবিতার চরণে বা বাক্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। সাধারণত সমাজ বা মানবজীবনের মহৎ কোনো আদর্শ বা বৈশিষ্ট্য, নীতি-নৈতিকতা, প্রেরণামূলক কোনো বিষয় যে পাঠে বা বাক্যে বা চরণে থাকে, তার ভাবসম্প্রসারণ করা হয়। ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে রূপকের আড়ালে বা প্রতীকের ভেতর দিয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়, তাকে যুক্তি, উপমা, উদাহরণ ইত্যাদির সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে হয়।

ভাবসম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে যেসব দিক বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

১. উদ্ধৃত অংশটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।
২. অন্তর্নিহিত ভাবটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।
৩. অন্তর্নিহিত ভাবটি কোনো উপমা-রূপকের আড়ালে নিহিত আছে কি না, তা চিন্তা করতে হবে।
৪. সহজ-সরলভাবে মূল ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।
৫. মূল বক্তব্যকে প্রকাশরূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে।
৬. বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৭. বক্তব্য সাধারণত বিশ থেকে পঁচিশ লাইনের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।

১

পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়। [ব. বো. ১৪]

মূলভাব : প্রতিটি মানুষই নিষ্পাপ হয়ে পৃথিবীতে আসে। জন্মের সময় কোনো মানব শিশুর গায়ে পাপ–পঙ্কিলতার চিহ্ন থাকে না। অর্থাৎ, মানুষ জন্মসূত্রে পাপী হয় না; বরং পরিবেশ তাকে ক্রমে ক্রমে পাপীতে রূপান্তরিত করে।

সম্প্রসারিত ভাব : বিংশ শতাব্দীর এ সভ্যতার যুগে ক্রমেই বাড়ছে খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণের মতো অনৈতিক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। কেউ লোভে পড়ে, কেউ জীবিকার তাগিদে আর কেউ বা সঙ্গদোষে এসব কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। সমাজের কুচক্রীমহল বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে অন্যায় কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত করছে প্রতিনিয়ত। এভাবেই ধীরে ধীরে একজন মানুষ হয়ে উঠছে দাগী আসামি কিংবা অপরাধী। কিন্তু তার জন্মের সময় সে আর দশজনের মতোই নিষ্পাপ ছিল। পৃথিবীর বুকে বেড়ে উঠতে গিয়ে নানা প্রতিকূল পরিবেশের সংস্পর্শেই মানুষ পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়। স্বেচ্ছায় কেউ পাপী হয় না। বৈরী পরিবেশে, অসৎ সঙ্গ, জীবিকার তাগিদ কিংবা অন্য কোনো কারণেই মানুষ পাপপথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। মানুষের ইন্দ্রিয় সংযত না থাকলেই মানুষ পাপ–পুণ্যের ব্যবধান করতে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। মানুষ হিসেবে প্রত্যেককেই অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতে হবে। পাপ কর্মকে ঘৃণা করা প্রতিটি মানুষের পরম কর্তব্য ও পবিত্র দায়িত্ব। কিন্তু যে পাপী তাকে সমাজের এককোণে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া মহৎপ্রাণ মানুষের কাজ নয়। তারাও মানুষ এবং আমাদের বৃহত্তর সমাজেরই অংশ। তাই তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা অবিবেচকের কাজ। তাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে তাদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তবেই সমাজে হবে চির কল্যাণ ও মঙ্গলের জয়যাত্রা।

মন্তব্য : সমাজে নানা ধরনের মানুষ বাস করে। সবাইকে নিয়েই গঠিত হয় সমাজ। এদের মধ্যে যারা পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয় তাদের কর্মকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। তবে মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে চেষ্টা করতে হবে পাপীকে সংশোধন করার। পাপকে ঘৃণা করলেও পাপীকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

২

অর্থই অনর্থের মূল। [য. বো. ০৯]

মূলভাব : পার্থিব জীবনে মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অর্থ। তাই অর্থ মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন, তথা অর্থকে সে পরিচালিত করে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ যখন অর্থের কাছে জিম্মি হয়ে অর্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই জগৎসংসারে অর্থ অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সম্প্রসারিত ভাব : জীবনধারণের জন্য অর্থ অপরিহার্য। পার্থিব জীবনে অর্থ বা বিত্তই মানুষের একান্ত কামনা। মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত অর্থ উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে। অর্থ মানুষের আজীবন প্রয়োজন মেটায় বলে অর্থ ছাড়া জীবন অর্থহীন বা মূল্যহীন বলে বিবেচিত হয়। তাই সারা জীবন মানুষ অর্থের পেছনে ছোটে। বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র অর্থের মাপকাঠিতেই প্রতিপত্তি ও সম্মান নির্ধারিত হয়। কী করে তাই অধিক অর্থ উপার্জন করা যায় তার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। বিপদে–আপদে, উৎসবে–আনন্দে, জন্ম–মৃত্যুতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অর্থের অযাচিত ব্যবহার সুখ ও কল্যাণের বদলে অকল্যাণ বয়ে আনে। অর্থের লোভে নীতিবর্জিত হয়ে মানুষ অহরহ নানা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়। অন্যায় পথে অর্জিত অর্থ মানুষকে বিবেকহীন ও দাম্ভিক করে তোলে। অর্থের লালসা মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটায়। অর্থের লোভেই চরিত্রহীন হয়ে মানুষ সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। পৃথিবীর সকল দ্বন্দ্ব–সংঘাত ও অশান্তির মূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে অর্থ। অর্থ–সম্পদের স্বার্থেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধের উন্মাদনা জাগে, শ্রমিকে–মালিকে হয় মতবিরোধ, ভাইয়ে–ভাইয়ে শুরু হয় চরম শত্রুতা। অর্থের লোভেই মানুষ মানুষকে খুন করে। তাই বলা যায়, জগতের সব অশান্তি ও অনর্থের মূলে রয়েছে অর্থ।

মন্তব্য : সুষ্ঠু সমাজজীবন ও স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করার জন্য অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু অর্থ যেন অনর্থের মূল না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তাই অর্থ–সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারই এর মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

৩

অর্থসম্পত্তির বিনাশ আছে কিন্তু জ্ঞানসম্পদ কখনো বিনষ্ট হয় না। [কু. বো. ১৪]

মূলভাব : পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তুর ক্ষয় বা বিনাশ অনিবার্য। কিন্তু যে–সম্পদটির বিনাশ নেই বরং বিকাশ আছে তা হলো জ্ঞানসম্পদ। জ্ঞান অবিনাশী বলে একবার

তা অর্জন করলে সারা জীবনের সম্পদ হিসেবে সঞ্চিত হয়। তাই জ্ঞানই মানুষের একান্ত নিজস্ব মহামূল্যবান সম্পদ।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অর্থের বিকল্প নেই। অর্থের জন্য মানুষ উদয়-অস্ত কঠোর পরিশ্রম করে। অর্থ দ্বারাই আমরা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে মানুষের অবস্থানকে নির্ণয় করে থাকি। কিন্তু এ অর্থসম্পদ কেবল মানুষের বাইরের দিকটিকেই প্রকাশ করে। অর্থ-সম্পদ যতই শক্তির অধিকারী হোক না কেন, জ্ঞানসম্পদের কাছে তা তুচ্ছ। সত্যিকারের জ্ঞানী ব্যক্তি বিত্তশালী লোকের চেয়ে অনেক বেশি ধনবান। বস্তুত অর্থ-সম্পদের কোনো স্থায়িত্ব নেই। আজকে রাজা, কালকে ফকির এ রকম দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। বিত্তবানের ধনভাণ্ডার একসময়ে নিঃশেষ হয়ে আসে। কিন্তু বিদ্বানের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে থাকে। সময়ের ব্যবধানে সে অধিকতর জ্ঞানী হতে থাকে। যিনি জ্ঞানী তিনি আমৃত্যু জ্ঞানরূ প সম্পদে সম্পদশালী। তাঁর জ্ঞানের ৰয় নেই। এমনকি মৃত্যুর পরেও তাঁর এই জ্ঞানের প্রাচুর্য পৃথিবীতে বিরাজ করে এবং জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করে। এভাবেই জ্ঞানীরা মানুষের মনে অমরত্বের আসন লাভ করেন। তাই অর্থ-সম্পদে নয়, জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণই দেশ ও জাতির প্রকৃত সম্পদ, আর এ জন্যে অর্থসম্পদের মাপকাঠিতে নয়, বরং জ্ঞানসম্পদের মাপকাঠিতেই মানুষের মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

মন্তব্য : জ্ঞান অতুলনীয় সম্পদ। জীবনের মতোই এটি মহামূল্যবান। জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়েও মহত্তর। মানুষ তার স্বরূ পকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে পারে শুধু জ্ঞান আহরণের মধ্য দিয়েই। জাগ্রত করতে পারে নিজের ৰমতাকে, সহায় হতে পারে বিশ্বমানবতার।

৪

"স্বদেশের উপকারে নাই যার মন,
কে বলে মানুষ তারে পশু সেই জন।"
অথবা,
স্বদেশের প্রতি যার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা নেই সে পশুতুল্য।

[কু. বো. ১৫, য. বো. ১৪, রা. বো. ১৪, চ. বো. ১৪, ব. বো. ১৪]

মূলভাব : দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ। দেশের সেবায়, জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।

সম্প্রসারিত ভাব : প্রিয় স্বদেশ ঘিরেই মানুষের অন্তরে রচিত হয় নানা স্বপ্ন। দেশের গৌরবে মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত হয়। আবার দেশের পরাজয়ে মানুষের অন্তরে নেমে আসে বেদনার ছায়া। একজন সচেতন মানুষ তার জন্মভূমিকে ভালো না বেসে পারে না। যদি কেউ ভালো না বাসে সে মানুষ নামের অযোগ্য। তাকে পশু বলাই শ্রেয়। কেননা, পশুর কোনো দেশ নেই, মানুষের আছে। একজন মানুষ যতই ধনবান, রূ পবান কিংবা জ্ঞানবান হোক, তার অন্তরে যদি স্বদেশপ্রেম না থাকে, জন্মভূমির কল্যাণের জন্য যদি তার মন না থাকে, তাহলে সে নরাধম, সে বর্বর, সে পশু। আমাদের জন্মভূমি আমাদেরকে দিয়েছে পরম আশ্রয়। এর সুশীতল ছায়ায় আমরা লালিত হচ্ছি। অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখার স্বপ্ন আমরা পূরণ করছি দেশের মাধ্যমেই। আমাদের মাতৃভূমি সারা পৃথিবীর সাথে আমাদের আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। এর কল্যাণের জন্য, এর গৌরব বৃদ্ধির জন্য আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। স্বদেশের ভালো-মন্দ দেখার দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের। দেশের গৌরবকে সমুন্নত রাখা একজন নাগরিকের পবিত্রতম কর্তব্য। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ এবং লালন করা একজন নাগরিকের একান্ত কর্তব্য। পতাকার রং বাড়ায় আত্মসম্মান। সুমধুর জাতীয় সংগীত জোগায় সঞ্জীবনী সুধা, স্বদেশের মাটির মতো এমন পবিত্র আর কিছু নেই। এর নদী, জল, শস্য ভরা প্রান্তর, নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি মানুষকে টেনে নেয় গভীর থেকে গভীরে।

মন্তব্য : স্বদেশপ্রীতি যার নেই সে পশুর সমান। দেশের উপকারে যিনি নিবেদিতপ্রাণ, তিনিই প্রকৃতপৰে মানুষ। পৰান্তরে, দেশ প্রেমহীন আত্মকেন্দ্রিক যার হৃদয়, সে নিঃসন্দেহে পশুর সমান।

৫

কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি–
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি। [ব. বো. ১৫]

মূলভাব : বস্তুর বাহ্যিক আকৃতিতে অভিভূত না হয়ে তার অভ্যন্তরীণ সত্য উপলব্ধিতেই আছে সার্থকতা। আয়তনের দিক থেকে বিশালত্ব, চাকচিক্যের দিক থেকে ঔজ্জ্বল্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক নয়। মিথ্যা, ভিত্তিহীন পরিচয়ের অহংকার নিয়ে বেশিদিন চলা যায় না। একদিন না একদিন আসল পরিচয় প্রকাশিত হবেই।

সম্প্রসারিত ভাব : হীরা মহামূল্যবান ধাতু। খাঁটি হীরা আকারে ছোট হয়। পৰান্তরে নকল হীরা হয় আকারে বড়। কিন্তু নকল হীরা যতই বড় হোক না কেন, সে আসল হীরার মতো অপরূ প আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণের মাধ্যমে মনোহর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে পারে না। তার আকৃতি বা আত্মপ্রচার কোনোটাই তাকে খাঁটি হীরায় পরিণত করতে পারে না। সে মেকি, মেকিই থেকে যায়। বরং নিজের আকৃতি এবং আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণে কৃত্রিমতার কারণে সে ধরা পড়ে যায়। আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা সত্যিকার অর্থে নিকৃষ্ট, হীনচিত্ত কিন্তু মিথ্যা অহমিকায় অন্ধ হয়ে তারা বাইরে প্রচার করে যে তারা অনেক বড়। এমনকি প্রচারসর্বস্ব পন্থায় সমাজের কাছ থেকে নাম কেনার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় হীনচিত্তের এ মানুষগুলো নকল হীরের মতো আমাদের সমাজের মধ্যমণি হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। তাদের আত্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে তারা যে প্রকৃত অর্থে অন্তঃসারশূন্য তা ধরা পড়ে যায়। একদিন তাদের সত্যিকার মুখোশ বেরিয়ে পড়ে। তখন মুখ লুকোবার জায়গা থাকে না। বস্তুত নিজের ঢাক নিজে পিটিয়ে কখনও বড় হওয়া যায় না। প্রকৃতই যারা বড় তাঁদের ৰমতা জাহিরের প্রয়োজন হয় না। তাঁদের সুকৃতির আলোতেই লোকে তাদের পরিচয় পায়। আকাশে চাঁদ উঠলে তাকে দেখার জন্য আলো জ্বালানোর প্রয়োজন হয়। তেমনিভাবে প্রকৃত মহৎ ব্যক্তিদের স্বভাব ও কর্মের গুণে স্বাভাবিকভাবেই তাদের চিহ্নিত করা যায়। প্রকৃতপৰে, নিছক বাহ্য আকৃতি কারোর আসল পরিচয় বহন করে না। হৃদয়ের বিশালতাই মানুষকে বড় করে, দেহের বিশালতা কিংবা অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য বা ৰমতার প্রাবল্য তাকে একটুও বড় করে না।

মন্তব্য : বস্তুত যাদের কর্মের ভাণ্ডার শূন্য; নিষ্ঠা, সাধনা ও শ্রমে যারা বিমুখ, মনের দিক থেকে যারা নিকৃষ্ট, চিন্তায় যারা অনগ্রসর তারাই আত্মপ্রচারসর্বস্ব হয়। প্রকৃত গুণী ব্যক্তিগণ কখনোই অহেতুক আত্মপ্রচারের কৌশল অবলম্বন করেন না। যার গুণ আছে তার সুনাম এমনিতেই প্রকাশ পায়।

৬

দুর্নীতি জাতীয় জীবনে অভিশাপস্বরূ প।

[ঢা. বো. ১৫, কু. বো. ১৫, রা. বো. ১৪]

মূলভাব : সমাজে বসবাস করতে হলে মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খল কতকগুলো নিয়মনীতি মেনে চলে ও চলতে হয়। কিন্তু মানুষ যখন স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশ ঘটিয়ে অন্যায়ভাবে প্রচলিত নিয়মনীতি ও আইনকানুন লঙ্ঘন করে দুর্নীতির আশ্রয় নেয় জাতীয় জীবনে তখন নেমে আসে ঘোর অন্ধকার।

সম্প্রসারিত ভাব : দুর্নীতি জাতীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে এক দুষ্ট রাহু। দুরারোগ্য ব্যাধির মতোই তা সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার লোককে গ্রাস করে। দুর্নীতির প্রভাবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে অধঃপতন নেমে আসে। দুর্নীতির ফলে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় সকল নিয়মনীতিতে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা তেমনি সমাজজীবনেও অবৰয়ের চিত্র প্রকট হয়ে ওঠে। দুর্নীতির ফলে প্রশাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সমাজে দেখা দেয় খুন–রাহাজানি, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারিসহ নানা অপকর্ম। একজন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি কখনোই সুস্থ স্বাভাবিক চিন্তা করতে পারে না। সে দেশ ও দশের মঙ্গলের কথা না ভেবে স্বার্থচিন্তায় মগ্ন হয়। তখন তার কাছে মানবিক মূল্যবোধ গৌণ হয়ে ওঠে। বিবেক, সততা তার কাছে হয় লাঞ্ছিত, অপমানিত। সে বেছে নেয় অন্যায় ও অসত্যের পথ। এভাবে দেশ ও সমাজ ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। তাই দুর্নীতিকে জাতীয় জীবনে অভিশাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মন্তব্য : দুর্নীতির কারণে একটি জাতির মহত্তম অর্জনও বিফলে যেতে পারে। দুর্নীতির গ্রাসে কেবল অতীত ও বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। এই সামাজিক অভিশাপকে সমূলে উৎপাটনের জন্য সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।

৭

মিথ্যা শুনিনি ভাই
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির–কাবা নাই। [ঢা. বো. ১২]

মূলভাব : মানুষের হৃদয় সকল উপাসনালয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপাসনালয়। কেননা, পবিত্র হৃদয়েই স্রষ্টার অবস্থান। মানুষের অন্তরগুলো যদি কল্যাণকামিতা আর পবিত্র চিন্তায় ভরে যায় তাহলে কোথাও আর অশান্তি ও অকল্যাণ থাকে না।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। বুদ্ধি–বিবেচনা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় মানুষের সমকৰ আর কোনো প্রাণী নেই। মানুষের রয়েছে বিচার ও বিশ্লেষণের শক্তি। ন্যায়–অন্যায়, পাপ–পুণ্য বিচার করে চলা মানুষের ধর্ম। পাপ–পুণ্য, ভালো–মন্দ, ধর্ম–অধর্মের পার্থক্য নির্ধারণে মানুষকে পরিচালিত করে মানুষের মন। মন দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ সৎ কাজ করে এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ করে। স্রষ্টা অন্তর্যামী। তিনি মানুষের হৃদয়ের খবরাখবর রাখেন। তাই তাকে পেতে হলে হৃদয়কে শুদ্ধ করতে হবে। যারা নির্মল হৃদয়ের অধিকারী, তারাই আলৱাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। মিথ্যা, কপটতা এবং হীনম্মন্যতায় যাদের হৃদয় পরিপূর্ণ, তাদের মসজিদে–মন্দিরে গিয়ে লাভ নেই। তারা যতই সেজদা অথবা পূজা–অর্চনা করুক না কেন, কোনো কাজ হবে না। কেউ কেউ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মসজিদে–মন্দিরে গিয়ে আরাধনা করে; কিন্তু তার হৃদয় যদি কলুষমুক্ত না হয় তাহলে রাতভর আরাধনা করেও কোনো লাভ হবে না। তাই মন্দির বা কাবা শরিফ নয়, অন্তরই হচ্ছে আসল। অর্থাৎ অন্তর শুদ্ধ না করে কাবা শরিফে গিয়ে লাভ নেই। পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী যাঁরা তাদেরকে কাবা শরিফ গিয়ে আরো পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। তাঁরা সহজেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করেন।

মন্তব্য : হৃদয়ের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কোনো কাবা, মন্দির নেই। নির্মল হৃদয়ের অধিকারী যারা তারাই সৃষ্টিকর্তাকে কাছে পেয়ে থাকেন। তাদের হৃদয়ই সত্যিকার আলোয় উদ্ভাসিত। তারাই স্রষ্টার প্রকৃত কল্যাণ লাভে সমর্থ।

৮

প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

মূলভাব : মনই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছে। মনই মানুষকে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে গৌরব দান করেছে।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো মানুষের একটা সুন্দর, অনুভূতিপ্রবণ মন আছে, যা আর কোনো প্রাণীর নেই। পৃথিবীরতে যত প্রকার জীব আছে, তাদের প্রত্যেকেরই প্রাণ রয়েছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে মানুষ আর দশটা প্রাণীর মতোই একটা প্রাণী। তবে মনোজগতের বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে একেবারেই আলাদা। মন আছে বলেই মানুষের মধ্যে প্রেম আছে, কল্পনা আছে, সৌন্দর্যবোধ আছে, ধর্ম আছে। পৃথিবীর সকল পাপ–পুণ্য, ভালো–মন্দ, ধর্ম–অধর্মের পার্থক্য নির্ধারণে মানুষকে পরিচালিত করে তার মন। এ মন বা হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ সৎ কাজ করে এবং শিৰা, সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানবিক গুণাবলি আয়ত্ত করে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। তখন অন্যান্য প্রাণী থেকে সে আলাদা হয়ে যায় এবং দৈনন্দিন জীবনের দ্বন্দ্ব–সংঘাত, হিংসা–বিদ্বেষ, লোভ–লালসা, স্বার্থচিন্তা, কুমন্ত্রণা প্রভৃতির সংস্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। মনের শক্তির কারণেই মানুষ আজ সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছতে পেরেছে। মানুষ তার মন দিয়ে সাধনা করে জীবনের বিচিত্র বিকাশ ঘটায়, যা অন্য কোনো প্রাণী পারে না। আবার কোনো প্রাণীই নিজেকে জানে না, কিন্তু মানুষ নিজেকে জানে। আর এটা সম্ভব হয় তার মনের মাধ্যমেই। মনই তার রহস্যময় আয়না, মনই তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। তাই সকল প্রাণীর ওপরে মানুষের স্থান। যে মানুষের আকৃতি নিয়ে পশুসুলভ আচরণ করে, যার মধ্যে মানবতাবোধ, সত্যনিষ্ঠা, ঔদার্য, সৎবিবেচনাবোধ, বিবেক–বুদ্ধি ইত্যাদি নেই তাকে সত্যিকারের মানুষ বলা চলে না। তাই মানুষ হতে হলে শুধু প্রাণ থাকলেই চলবে না, প্রাণ ও মনের যুগপৎ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে।

মন্তব্য : জীবজন্তুর সারা জীবন কেটে যায় কেবল আত্মরৰা, বংশরৰা ও খাদ্য সংগ্রহে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষকেও একই কাজ করতে হয়। তা সত্ত্বেও মানুষ বিশিষ্ট, কারণ সে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, হৃদয় ও সুকোমল বৃত্তির অধিকারী বলে।

৯

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

মূলভাব : অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার বিধান চিরাচরিত। সকল শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু দণ্ডদাতা বিচারক যদি মানবিক দিক থেকে সবকিছু বিবেচনা করেন এবং সমব্যথী হন তবেই সে বিচার হয় সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার।

সম্প্রসারিত ভাব : ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাই বিচারকের একমাত্র ধর্ম। নিরপেৰভাবে অপরাধ নির্ণয় করে অপরাধীকে শাস্তিদান করাই বিচারকের কাজ। এই কাজ অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু অপরাধীকে দণ্ডদানের ব্যাপারে বিচারককে সংবেদনশীল হতে হবে, হতে হবে অনুভূতিপ্রবণ। তা না হয়ে তিনি যদি

অপরাধীকে নির্মমভাবে দণ্ডদান করেন, দণ্ডিতের বেদনায় তাঁর হৃদয়ে যদি করুণার উদ্রেক না হয়, তবে তাঁর দণ্ডদান হয়ে ওঠে প্রবলের অত্যাচার এবং তিনি হয়ে পড়েন বিচারক পদের অযোগ্য। যে দণ্ডিত, যাকে তিনি দণ্ড দান করলেন, সে অবশ্যই কোনো হতভাগ্য পিতামাতার সন্তান। সন্তানের ব্যথা–বেদনায় তারাও ব্যথিত হবেন। তাছাড়া যেকোনো শাস্তিই কষ্টদায়ক। অপরাধীকে সেই কষ্ট ভোগ করতে হয়। বিচারক যদি তার এবং তার স্বজনদের ব্যথা–বেদনার কথা চিন্তা করে ব্যথিত না হন, তাহলে তাঁর শাস্তিদান হবে নিষ্ঠুরতার নামান্তর। কাজেই, দণ্ডিতের প্রতি বিচারককে সমব্যথী হতে হবে। সমব্যথী বিচারকের বিচারই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার এবং তিনি যে শাস্তিদান করেন, তাই সর্বোচ্চ শাস্তি।

মন্তব্য : দণ্ডদাতার মন অপরাধীর জন্য যদি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে, তবে তা অপরাধীর হৃদয় এবং বিবেককেও স্পর্শ করবে। সেই সঙ্গে অপরাধী নিজের কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং জাগ্রত হবে তার পরিশুদ্ধ বিবেক।

১০

প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তাহারই।

মূলভাব : মানবকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা প্রয়োজনে হাসিমুখে প্রাণ উৎসর্গ করে, অমরত্ব একমাত্র তাদেরই প্রাপ্য। ভীরুতা নয়, আত্মপ্রত্যয়ই জীবনের যথার্থ ধর্ম।

সম্প্রসারিত ভাব : মৃত্যু অনিবার্য, এর ভয়াল হাত থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। প্রতিনিয়ত মৃত্যুর লীলাখেলা দেখেও মানুষ জীবনের মায়া ত্যাগ করে না। জীবনের প্রয়োজনেই সে বেঁচে থাকে। আবার জীবনের প্রয়োজনেই মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। মরণজয়ী দুঃসাহসী মানুষেরাই মৃত্যুকে বুক পেতে নিয়ে গড়ে তুলেছে মানবসভ্যতার মহিমান্বিত ঐশ্বর্য। মৃত্যুকে বরণ করে মৃত্যুকে জয় করেছেন তাঁরা। মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত হয়ে জীবনযাপনের মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। ভয়ের মধ্যে থাকলে জীবনের সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সেজন্যে ভয়ার্ত জীবন সফল জীবন বলে বিবেচিত হতে পারে না। জীবনকে সত্যিকারভাবে সফল ও উপভোগ্য করতে হলে মৃত্যুভয় পরিহার করতে হবে। কর্মময় মানবজীবনের প্রতিটি কাজেই কম–বেশি ঝুঁকি আছে। যে কাজ যত দুরূ হ, যত বিপজ্জনক সে কাজের মৃত্যুর ঝুঁকি তত বেশি। এমন ক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্ত সাহসীরাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কর্ম সম্পাদন করতে পিছপা হয় না। এ কারণেই পৌরুষদীপ্ত লোকেরাই ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে সফলতা বয়ে আনে। বস্তুত মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তবে মৃত্যুর শ্রেণিভেদ আছে। মৃত্যু কখনো কাপুরুষোচিত, কখনো স্বাভাবিক, কখনো বীরোচিত। বীরোচিত মৃত্যুই মানুষকে অমরত্ব দান করে। মহৎ উদ্দেশ্যে মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে মানুষ ভীত হয় না, তার জীবনই যথার্থ সার্থকতার দাবিদার। বেঁচে থাকার অধিকারী হতে হলে মরণকে তুচ্ছ বলে বিবেচনা করতে হবে।

মন্তব্য : জীবনের প্রতি মায়া দেখালে মৃত্যুভয় এসে জীবনকে মর্যাদাহীন করে তোলে। জীবনের প্রয়োজনে মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত।

১১

প্রয়োজনই উদ্ভাবনের জনক। [ঢা. বো. ০৯]

মূলভাব : সমস্ত সৃষ্টির মূল প্রেরণা হচ্ছে চাহিদা বা প্রয়োজন। প্রয়োজন না থাকলে মানুষের ভাবনাও থাকে না; তখন বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছু করার আগ্রহও থাকে না। তাই কোনো কিছু উদ্ভাবনের প্রারম্ভে যে বিষয়টি বিবেচ্য তা হচ্ছে প্রয়োজন।

সম্প্রসারিত ভাব : অণু থেকে অট্টালিকা পর্যন্ত, বিশ্বসভ্যতার প্রতিটি সৃষ্টির মূলে রয়েছে প্রয়োজন। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত; পৃথিবীর সব কাজে– খাদ্য, বস্ত্র, অন্ন, বাসস্থান, চিকিৎসা– যা কিছু দৃশ্যমান সবই প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি। পৃথিবীর সূচনা থেকেই মানুষ তার প্রয়োজন মেটানো বা অভাব পূরণের নিমিত্তেই বিচিত্র জিনিস উদ্ভাবন শুরু করেছে। তবে মানুষের এ উদ্ভাবন নাটকীয়ভাবে হয়নি। সৃষ্টির আদিলগ্নে মানুষ যখন অসহায় তখনই তার বোধ হয় 'প্রয়োজন'–এর। উদ্ভাবন শুরু হয় নতুন নতুন জিনিসের। আদিম গুহাবাসী মানুষ শিকারের প্রয়োজনে তীর ধনুক আবিষ্কার করে, কাঁচা মাংস পুড়িয়ে খাওয়ার জন্য আগুন জ্বালাতে শেখে। এমনিভাবে প্রয়োজন ও আবিষ্কারের ধারাবাহিক স্তর পেরিয়ে মানুষ পদার্পণ করেছে আধুনিক সভ্যতায়। অন্ধকার থেকে আলোয় যাওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করে মানুষ বিদ্যুৎ উদ্ভাবন করেছে। সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থার প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছে। শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান করেছে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, ওষুধ ও বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য এক্স–রে, আল্ট্রাসনোগ্রাফি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই–মেইল, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন এবং চাষাবাদের জন্য উন্নত ধরনের আধুনিক কৃষিসরঞ্জাম আবিষ্কার করা হয়েছে। সর্বোপরি বিশ্বের সর্বত্র যে বিশাল কর্মকাণ্ডে মানুষ নিয়োজিত রয়েছে তা কেবল প্রয়োজন সাধনেই নিবেদিত।

মন্তব্য : প্রয়োজনের শেষ নেই, তাই মানুষের উদ্ভাবনেরও শেষ নেই। প্রয়োজনের তাগিদেই যুগ যুগ ধরে মানুষ এগিয়ে চলছে অসীমের সন্ধানে।

১২

পরের অনিষ্ট চিন্তা করে সেই জন
নিজের অনিষ্ট বীজ করে সে বপন।

[ঢা. বো. ১৪; রা. বো. ১৫, ১৩; কু. বো. ১৩]

মূলভাব : মানুষে মানুষে কল্যাণ কামনার মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ নেমে আসে। কিন্তু অপরের অনিষ্ট চিন্তা সমাজে নিয়ে আসে বিপর্যয়। অন্যকে বিপদগ্রস্ত করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় মানুষ নিজেই বিপদগ্রস্ত হয়।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষ পৃথিবীতে একে অপরের সাথে মিলে মিশে থাকবে এটাই একান্তভাবে প্রত্যাশিত। পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে একে অপরের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতির মাধ্যমে। এর ফলে একজন আরেকজনের দুঃখে কাতর হয়। তাকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এভাবেই চলতে থাকে সামাজিক কাজকর্ম। কিন্তু সমাজের সকল মানুষের মনমানসিকতা তো একরকম নয়। ভালো মানুষের আড়ালে কিছু দুষ্ট লোকেরও বাস থাকে। পরের অনিষ্ট করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। পরের ভালো তাদের দুচোখের কাঁটা। কীভাবে অন্যের ক্ষতি করা যাবে সেই চিন্তায় তারা সর্বদা ব্যস্ত থাকে। তাদের সবসময় যোগাযোগ থাকে তাদের সমজাতীয় লোকের সাথে। এরা কূটবুদ্ধির হোতা হিসেবে সমাজে পরিচিত। কিন্তু তারা একথা বুঝতে পারে না যে তারা পরের অনিষ্ট করতে গিয়ে নিজেরই বেশি ক্ষতি করে। তারা কখনোই সমাজের ঊর্ধ্বে নয়। সমাজের কারো যদি তারা ক্ষতি করে তাহলে কিছুটা হলেও তার প্রভাব সমাজের ওপর পড়ে। আর সমাজের ওপর প্রভাব পড়া মানে তার ওপর প্রভাব পড়া। কিন্তু স্থূলবুদ্ধির কারণে তারা অনেক সময় এই ব্যাপারটি বুঝতে পারে না। অনেক সময় অন্যের সামান্য ক্ষতি করার

জন্য নিজের দ্বিগুণ ৰতি স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে না। পরিণতিতে তারা তাদের নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে। উদাহরণস্বরূ প– ঘসেটি বেগম ও মীরজাফর, নবাব সিরাজদ্দৌলাকে ধ্বংস করতে গিয়ে তারা ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে পরিচিত। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে এ রকম অজস্র উদাহরণ চোখে পড়বে। তাই পরের অনিষ্ট চিন্তা না করে পরের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই জীবনের সার্থকতা।

মন্তব্য : যারা পরের অনিষ্টের কথা চিন্তা করে তারা শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে না। নিজের ফাঁদে নিজেই আটকে পড়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে। চক্রান্ত ষড়যন্ত্রকারীরা সাময়িকভাবে সফল হলেও প্রকৃত বিচারে তারা ইতিহাসে ঘৃণিত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

১৩

ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ। [সি. বো. ১৪]
অথবা, ভোগে সুখ নাই, কর্ম সম্পাদনেই প্রকৃত সুখ।

মূলভাব : মনুষ্যত্বই মানুষের আসল পরিচয়। আর ত্যাগের মহিমাই পারে মানুষের এ মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ ও বিকাশ ঘটাতে। ত্যাগের মাধ্যমে সম্পদ চলে যায়, কিন্তু তার বদলে পাওয়া যায় অমিয় সুখ। তাই ত্যাগই মানুষের একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত।

সম্প্রসারিত ভাব : জগৎসংসারে ভোগ ও ত্যাগ দুটি বিপরীতমুখী দিক। ভোগ ও ত্যাগের দরজা সবার জন্যই উন্মুক্ত। ভোগে আনন্দ থাকলেও তৃপ্তি নেই। কিন্তু ত্যাগের মাধ্যমে আনন্দ ও তৃপ্তি দুটোই লাভ করা যায়। তাই ভোগ নয়, ত্যাগই জীবনের মূল সাধনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনুষ্যত্বের কল্যাণেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা ও শ্রেষ্ঠ। শুধু মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেই মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। মানুষকে তার স্বীয় চেষ্টায় এ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে হয়। ভোগের মাধ্যমে এর বিকাশ ঘটে না। ভোগ মানুষকে জড়িয়ে ফেলে পঙ্কিলতা, গ্লানি ও কালিমার সঙ্গে। মনুষ্যত্বহীন মানুষদের অর্জিত সম্পদ নিজের স্বার্থ ছাড়া সমাজের অন্য কোনো কাজে আসে না। পরের দুঃখে তাদের মন কাঁদে না। তারা স্বার্থান্ধ ও সংকীর্ণচিত্ত বলে সমাজে পরিচিত। অন্যদিকে ত্যাগের পরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মনুষ্যত্বের গুণে মানুষ নিজের স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে পরার্থে, দীনদুঃখীদের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পায়। সুখের জন্য অনেকেই বিলাস–ব্যসনে মত্ত হয়ে ওঠে এবং ভোগ–বিলাসের নানা উপকরণের আয়োজন করে। কিন্তু কোনোভাবেই ভোগাকীর্ণ জীবন সুখের সন্ধান দেয় না। কেননা তা হলে বিত্ত ও ৰমতাবানরাই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী বলে গণ্য হতেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এঁরাও জীবনে প্রকৃত সুখী হতে পারেন না। একমাত্র মহৎ কর্মের মধ্য দিয়েই অন্তরের সুখ পাওয়া যায়। দেশব্রতী, মানবব্রতী কর্মেই মানুষ লাভ করে জীবনের সার্থকতা।

মন্তব্য : বস্তুত পরের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করার মধ্যেই মানুষের মানবিক গুণাবলির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। যথার্থ সুখ ভোগ–বিলাসে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় নিরন্তর কাজের মধ্যে। আর দেশব্রতী ও মানবব্রতী ভূমিকার মধ্যে।

১৪

যে একা সেই সামান্য, যার ঐক্য নাই সে তুচ্ছ।

মূলভাব : অন্যের সহযোগিতা ছাড়া মানবজীবন অচল। পৃথিবীতে যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ ও একা, সে নিঃসন্দেহে অসহায়। ঐক্যবদ্ধ জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে সে শক্তিতে সামান্য এবং সামাজিকভাবে তুচ্ছ।

সম্প্রসারিত ভাব : একজন মানুষ বা অন্য যেকোনো প্রাণী যখন একা তখন তার শক্তি থাকে সীমিত। কিন্তু যখন একতাবদ্ধ হয়ে দশজন একসঙ্গে কোনো কাজে হাত দেয় তখন সে হয় অনেক সবল ও শক্তিশালী। তখন কোনো কঠিন কাজ আর কঠিন বলে মনে হয় না। পৃথিবীর আদিপর্বে মানুষ ছিল ভীষণ অসহায়। কারণ তখন সে ছিল একা। সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ উপলব্ধি করল যে, ঐক্যবদ্ধ জীবন ছাড়া এ পৃথিবীর সমস্ত প্রতিকূলতা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাই মানুষ গড়ে তোলে সমাজবদ্ধ জীবন, হয়ে ওঠে সামাজিক বলে বলীয়ান। এর পর থেকে মানুষ আর পেছনে ফিরে তাকায়নি। একতার শক্তিকে উপেৰা করে যে একা থাকতে চায় সে আসলে অসহায়। শক্তি বা সামর্থ্যের ক্ষুদ্রতার কারণে একক মানুষ সকলের নিকট উপেৰিত। কিন্তু যারা ঐক্যবদ্ধ তাদের শক্তি অসীম। ঐক্যই প্রকৃত শক্তি। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় বিশাল জলরাশি। এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় অসীম শক্তি। অনেক ব্যক্তিসত্তা যখন একতাবদ্ধ হয়ে সমষ্টির সৃষ্টি করে, তখন তাদের সমবেত শক্তি জাতীয় জীবনে বিরাট অবদান রাখতে সৰম হয়। একতার শক্তি অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করে। সমগ্র জাতির মধ্যে একতা ছিল বলেই আমরা মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়েছি। একক কোনো শক্তি বলে তা সম্ভব ছিল না। আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি, যখনই আমাদের জাতীয় জীবনে ঐক্যের অভাব হয়েছে তখনই নানা বিপদ ও দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে। শুধু জাতীয় জীবনে নয়, আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও একতার প্রয়োজন। একতাবদ্ধ হয়ে আমরা যেকোনো কাজ যত সহজে ও নির্বিঘ্নে করতে পারি একাকী তা করা সম্ভব নয়।

মন্তব্য : মানুষ এককভাবে সামান্য আর তুচ্ছ। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতিতে চাই মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস।

১৫

এ জগতে হায় সে–ই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

মূলভাব : ধনসম্পদ টাকা–পয়সা বাড়ানোর আকাঙ্ক্ষা মানুষের দুর্নিবার। তাই আকাঙ্ক্ষা মানুষকে লোভী করে তোলে। শত অর্জনের পরও তারা তৃপ্ত হয় না। তখন তারা গরিবের সামান্যতম সম্পদটুকু গ্রাস করে নিতে পিছপা হয় না।

সম্প্রসারিত ভাব : ধনসম্পদ উপার্জনের অদ্ভুত রকমের তৃষ্ণা মানুষকে ক্রমাগত তাড়িত করে। যে যত পায় সে তত চায়। এই চাওয়া এবং পাওয়ার কখনো শেষ নেই। রাশি রাশি সম্পদ জমিয়ে সম্পদের পাহাড় তৈরি করে মানুষ। তারপরও সে তৃপ্ত হয় না। সম্পদ বাড়ানোর নেশায় সে দুর্দমনীয় হয়ে উঠে। ভালো–মন্দ, কল্যাণ–অকল্যাণ, সত্য–মিথ্যা ইত্যাদি জলাঞ্জলি দিয়ে বিত্ত ও বৈভবের মোহে সে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলে। নির্বিচারে সম্পদ সঞ্চয়ের ফলে সে গরিবের সামান্য সম্পদের প্রতি হাত বাড়ায়। গরিবের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিয়ে সে তার প্রাচুর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে হয়। অন্য দিকে অনাহারক্লিষ্ট গরিব মানুষেরা তাদের সামান্য সম্বল নিয়ে নিরিবিলি জীবনযাপন করে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য তাদের নিত্যদিনের সহচর। ধনীর ঐশ্বর্যের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকে না। রাজা–মহারাজাদের বিলাসবহুল জীবনের খবরাখবর তারা কখনো রাখে না। কোনো রকমে খেয়ে–পরে বাঁচার মধ্যেই তারা শান্তি খুঁজে নিতে চায়। কিন্তু, এইটুকু সুখ আর এইটুকু শান্তিতেও বাধা সৃষ্টি করে উঁচু তলার ধনিক সম্প্রদায়। তাদের অপরিসীম ধনতৃষ্ণা একসময় গ্রাস করে গরিবের শেষ সম্বল

ভিটে বাড়ি। ছলে–বলে–কৌশলে অথবা শক্তি খাটিয়ে, ভুখা–নাঙা মানুষের শেষ সম্বলটুকু ছিনিয়ে এনে এরা ভয়ংকর লোভের আগুনে নিজেদেরকে আত্মাহুতি দেয়। এভাবেই দরিদ্র মানুষেরা পরিণত হয় পথের ভিক্ষুকে।

মন্তব্য : শোষিত–বঞ্চিত দুঃখী মানুষের ক্রন্দনধ্বনি আর দীর্ঘ নিশ্বাসে ভারী হয়ে উঠছে পৃথিবীর বাতাস। এজন্য প্রয়োজন সম্পদের সুষম বণ্টন ও ন্যায্য হিসাব। সামন্তবাদী আর পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ফলে দরিদ্র মানুষের ওপর নেমে এসেছে যে অমানিশার কালো অন্ধকার, তার অবসান হওয়া উচিত।

১৬

সুশিৰিত লোক মাত্রই স্বশিৰিত।
অথবা, জ্ঞানশক্তি অর্জনই শিৰার উদ্দেশ্য।

মূলভাব : প্রাতিষ্ঠানিক শিৰায় শিৰিত হলেই সুশিৰিত হওয়া যায় না। শিৰার পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে হলে মানুষকে নিজস্ব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং সুশিৰিত হওয়ার জন্য স্বশিৰা বা নিজে নিজে শিৰার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা শিৰার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানশক্তিতে বলীয়ান হওয়া।

সম্প্রসারিত ভাব : শিৰা সম্পূর্ণভাবেই অর্জনসাপেৰ। শিৰাপ্রতিষ্ঠানে অর্জিত শিৰার একটা সীমাবদ্ধতা আছে। নির্দিষ্ট ডিগ্রি প্রদানের মধ্যেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিৰার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের পূর্ণতা আসে না। জ্ঞানকে আত্মস্থ করার জন্য আত্মপ্রয়াসের কোনো বিকল্প নেই। শিৰার পরিধি বা সীমা বলতে কিছু নেই। তাই নিরন্তর জ্ঞান–অনুশীলন ছাড়া কেউ সুশিৰিত হতে পারে না। আমাদের সমাজে এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁদের উচ্চতর ডিগ্রি আছে, কিন্তু দেশ ও জাতির কল্যাণে তাঁরা কিছুই করতে পারেন না। তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর ডিগ্রি থাকলেও তাঁরা স্বশিৰায় সুশিৰিত না হওয়ায় তাঁদের মধ্যে কখনোই মুক্তচিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। আবার অনেক স্বশিৰিত ব্যক্তি প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছাড়াও দেশ ও জাতি তথা বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূ প– সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, পেৱটো, নিউটন, গ্যালিলিও, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরৰল ইসলাম প্রমুখের নাম উলেৱখ করা যেতে পারে। তাঁরা স্বশিৰায় সুশিৰিত ছিলেন বলেই মরেও অমর হয়ে আছেন। সুশিৰিত লোকের মন মুক্তবুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হয়। তিনি বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হন। পরিশীলিত রৰচিবোধে তিনি হন উদার ও বিনম্র। সব মিলিয়ে সুশিৰিত মানুষ নিঃসন্দেহে হন আলোকিত মানুষ। তাই একটি দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নতিকল্পে স্বশিৰিত ও সুশিৰিত লোকের কোনো বিকল্প নেই।

মন্তব্য : প্রাতিষ্ঠানিক শিৰা এবং বাস্তব জীবন থেকে অর্জিত শিৰার মধ্যে ব্যাপক ফারাক আছে। এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় ঘটলে পূর্ণাঙ্গভাবে শিৰিত হওয়া যায়। সুশিৰার জন্য নিজের উদ্যোগের প্রয়োজন হয়। একমাত্র স্বশিৰার মাধ্যমেই সুশিৰিত হয়ে ওঠা সম্ভব।

১৭

স্পষ্টভাষী শত্রৰ নির্বাক মিত্র অপেৰা ভালো।

[ঢা. বো. ১১, দি. বো. ১৪]

মূলভাব : স্পষ্টভাষী লোকদের স্বভাবের কারণে তাদের পরিচয় কারও কাছে গোপন থাকে না। অন্যদিকে নির্বাক ব্যক্তির মনে কী চলছে তা জানার উপায় নেই। এ কারণে স্পষ্টভাষী ব্যক্তি শত্রৰ হলেও নির্বাক বন্ধুর তুলনায় নিরাপদ বলে বিবেচিত।

সম্প্রসারিত ভাব : যে ব্যক্তি সত্য প্রকাশের সাহস রাখে না, সে মিত্র হলেও তাকে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে ভাবা বা গ্রহণ করা যায় না। পৰান্তরে, যে ব্যক্তি সত্য কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে না, অন্যায়ের বিরৰদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী, সে শত্রৰ হলেও নির্বাক বন্ধু অপেৰা উত্তম। একজন সৎবন্ধু প্রত্যেকের জীবনেই কাম্য। প্রকৃত বন্ধু সুখে–দুঃখে, আনন্দ–বেদনায়, বিপদে–আপদে সুহৃদের ভূমিকা রাখে। কিন্তু অনেক সময় বন্ধুত্বের কারণে এবং বন্ধুত্ব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় অনেকে বন্ধুর ত্রৰটি–বিচ্যুতি নির্দেশ করে না। নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ফলে মানুষ নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পায় না। মানুষের জীবনে স্পষ্টবাদিতা একটি মহৎ গুণ। স্পষ্টভাষী লোক শত্রৰ হলেও নির্বাক বন্ধু অপেৰা সহস্র গুণ শ্রেয়। কারণ, যেখানে বন্ধু বন্ধুর দোষের কথা বন্ধু হওয়ায় গোপন করে, সেখানে স্পষ্টভাষী শত্রৰ দোষ তুলে ধরে। তখন সে দোষ সংশোধনের বা সাবধানতা অবলম্বনের সুযোগ পায়। শত্রৰর এই আচরণ প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের উপকারই করে। স্পষ্টভাষী শত্রৰর সমালোচনা থেকে মানুষ উপকৃত হয় বলে শত্রৰকে অমর্যাদা করা যথার্থ নয়। সে শত্রৰ হলেও পরোৰভাবে উপকার করে বন্ধুর মতোই দায়িত্ব পালন করে থাকে।

মন্তব্য : স্পষ্টবাদী ব্যক্তি সবসময়ই অন্যায়ের বিরৰদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী। তাই এমন ব্যক্তি শত্রৰ হলেও নির্বাক বন্ধু অপেৰা অনেক ভালো। সে শত্রৰ হলেও স্পষ্টবাদিতার গুণে মহৎ বন্ধু।

১৮

পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে।

মূলভাব : জগতে যারা স্মরণীয় ও বরণীয় তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পথ রচনা করেছেন। আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে অন্ধকারকে বিদূরিত করে এগিয়ে গেছে চিরকল্যাণ ও মুক্তির পথে। সত্যসন্ধানী মানুষেরা কখনো থেমে থাকে না। পথহীন পথে হেঁটে হেঁটেই তাঁরা আবিষ্কার করে নেয় আলোকিত নতুন পথ।

সম্প্রসারিত ভাব : পার্থিব কামনা–বাসনায় পরিপূর্ণ আমাদের এ মানবজীবন। প্রাপ্তির প্রত্যাশায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এখানে চলছে কর্মোদ্যোগ। সাধনা এবং কর্মকুশলতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তাই এগিয়ে যায় সামনের দিকে। জীবনের অভীষ্ট লৰ্যে পৌঁছার জন্য সে নিজেই খুঁজে নেয় নিজের পথ। জীবনের আঁকাবাঁকা পথে হাঁটতে হাঁটতে সে একসময় যখন পথের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়, যখন সে দেখে তার সামনে আর কোনো পথ নেই, কেবল ঘুটঘুটে অন্ধকার; তখনো সে থেমে থাকে না। আলোর মশাল জ্বালিয়ে সৃষ্টি করে নতুন পথ। সমাজের কল্যাণের জন্য মানুষের মুক্তির জন্য যেসব মহাপুরৰষ এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন– তাঁরা সেই তীর্থ পথের পথিক। হযরত মুহাম্মদ (স.), ঈসা (আ.), সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, কনফুসিয়াস এমনি বহু মহামানবের নাম এ প্রসঙ্গে বলা যায়। যাঁরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে পথহারা মানুষের জন্য তৈরি করে গেছেন নতুন পথ। তাঁদের আদর্শ, তিমিরবিনাশী অমর বাণী বিভ্রান্ত মানুষকে দেখিয়েছে সত্য ও সুন্দরের পথ। তাঁরা যে জীবনাদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন, তা আমাদের পরম পাথেয়। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরাও যদি আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হই তাহলে তাদের সম্মুখ থেকে সকল অন্ধকার কেটে যাবে। সমস্ত জঞ্জাল, সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে উদিত হবে জীবনের সোনালি সূর্য।

মন্তব্য : আলোকপিয়াসী মানুষ কখনো গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় না। ভ্রান্তপথ কখনো তাকে মোহগ্রস্ত করতে পারে না। সে তারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে সত্য ও কল্যাণের পথ প্রাপ্ত হয়। অন্যদেরও সেই কল্যাণের পথে আহ্বান জানায়। কারণ, সে সচেতন– সে বিশ্বাস করে পথিকই পথের স্রষ্টা।

১৯

যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

মূলভাব : এই মহাবিশ্বের কোনো বস্তুই তুচ্ছ নয়। অতি সাধারণ জিনিসের অন্তরালেও মূল্যবান কিছু লুকিয়ে থাকতে পারে।

সম্প্রসারিত ভাব : ছাই অতি নগণ্য একটি বর্জ্য পদার্থ। সকলে তাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু এই মূল্যহীন ছাইয়ের নিচে অমূল্য রতন পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এর মাঝেও লুকিয়ে থাকতে পারে জ্বলজ্বলে হীরক খণ্ড, যা মহামূল্যবান। তাই রহস্যে ভরা এই পৃথিবীর কোনো কিছুকেই তুচ্ছ জ্ঞান করা ঠিক নয়। কোনো কিছুর উপরিভাগের দৈন্য কিংবা অসৌন্দর্যতা দেখে তা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত। কারণ অনেক সময়, অতি সাধারণ জিনিসের ভেতরেই অসাধারণ কিছু লুকিয়ে থাকতে পারে। এ জগৎ সংসারে অতি সাধারণ জিনিসকে আমরা অনেক সময় অবহেলা করি। ছোটকে ছোট ভেবে দূরে সরিয়ে রাখি। আবার অনেক সময় সোনার হরিণ ধরার মতো মহামূল্যবান জিনিসের পেছনে আমরা ধাবিত হই। ফলে সাধারণ জিনিসগুলো বহুকাল থেকে যায় অজ্ঞাত, অবহেলিত। অথচ অনুসন্ধান করলে এ সাধারণ জিনিসগুলার ভেতরেই অসাধারণ মহামূল্যবান জিনিসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। যেমন– ঝিনুকের ভেতর পাওয়া যায় মুক্তার মতো রত্নপাথর। মানুষের বাহ্যিক অবয়ব, পোশাক–পরিচ্ছদ অতি সাধারণ হলেও অনেক সময় এসবের ভেতরে বসবাস করে অতি অসাধারণ মানুষ। মিথ্যা জৌলুসের মোহে অন্ধ মানুষ এ অসাধারণ মানুষগুলোকে অনুসন্ধান করে না। অথচ মানুষের উচিত কারো বাহ্যিক আড়ম্বরে বিভ্রান্ত না হয়ে তার সত্যিকার স্বরূ প উদ্‌ঘাটন করা।

মন্তব্য : ছোটকে তুচ্ছ বলে অবহেলা করলে অনেক মূল্যবান সম্পদ হারানোর সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে মূল্যহীন ভাবা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ভেতরটা অনুসন্ধানের মাধ্যমেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা উচিত।

২০

"শৈবাল দিঘীরে বলে উচ্চ করি শির
লিখে রেখে এক ফোঁটা দিলেম শিশির।"

[ঢা. বি. ১১, চ. বো. ১৫, য. বো. ১৩]

মূলভাব : সংকীর্ণ মনের অধিকারীরা উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। যারা অকৃতজ্ঞ তারা যদি অপরের সামান্য উপকার করে তাহলে গর্বভরে সে কথা প্রচার করে বেড়ায়। কিন্তু মহৎ ও উদার মনের মানুষেরা আত্মপ্রচারে উৎসাহ পান না।

সম্প্রসারিত ভাব : শৈবালের জন্ম এবং পরিবৃদ্ধি হয় দিঘির অথৈ জলে। নিজের অস্তিত্বের জন্য দিঘির প্রতি শৈবালের কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা উচিত। কিন্তু শৈবাল এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কুয়াশা ঢাকা শীতের সকালে শৈবালের গায়ে জমা হয় বিন্দু বিন্দু শিশির। প্রাকৃতিক নিয়মে সেই শিশির গড়িয়ে পড়ে দিঘির জলে। ক্ষুদ্র শৈবাল এটাকেই দিঘির প্রতি তার বড় দান হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। বিচিত্র এ পৃথিবীতে পরনির্ভরশীল শৈবালের মতো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষের অভাব নেই। তারা আশ্রয়দাতার প্রতি সকৃতজ্ঞ নয় বরং নিজেকে জাহির করার জন্য সামান্য অবদানের কথাই জনসমক্ষে তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকে। অথচ সেই জলভরা দিঘি অন্যের উপকার হেতু নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দেয়। শৈবালের মতো সে দানের হিসাব লিখে রাখতে বলে না। এখানেই ক্ষুদ্র ও মহৎ প্রাণের পার্থক্য দেখা যায়। দিঘির মতোই কোনো কিছুর প্রত্যাশা না করে পৃথিবীর মহৎ মানুষেরা পরোপকারে ব্রতী হন। অন্যের মঙ্গল সাধনাকেই তারা নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করেন। এর বিনিময়ে তাঁরা কিছুই চান না। তাঁরা ত্যাগের মহিমা দ্বারা নিজেকে উজাড় করে দেন অপরের সুখ–শান্তির জন্য।

মন্তব্য : পরোপকারের হিসাব মনে রাখা দানশীল মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের ধর্ম নয়। অন্যের কল্যাণ সাধন করেই তাঁরা কৃতার্থ হন। আত্মপ্রচারের ফলে ক্ষুদ্র দানের মহিমাও ম্লান হয়ে যায়। তাই প্রত্যেকেরই উচিত, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং নিজের উপকারের জন্য বড়াই না করা।

২১

রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে
অথবা, একের শেষান্তে অপরের আবির্ভাব।

মূলভাব : মানুষের জীবনে সুখ–দুঃখ পর্যায়ক্রমে আসে। সুখ বা দুঃখ কোনোটাই কারো জীবনে চিরস্থায়ী হয় না। চরম দুঃখ কষ্টের মাঝে যদি কেউ মনে করে তার জীবনের সুখ শান্তি খুবই নিকটবর্তী তবেই সে দুঃখ কষ্টকে জয় করতে পারে।

সম্প্রসারিত ভাব : বিশ্ব–সংসারে সবকিছুই নিয়মের অধীন। এ ধরণীতে দিন–রাত হয় প্রকৃতির নিয়মে। স্রষ্টার এ এক অলঙ্ঘনীয় বিধান। রাতের ক্রমযাত্রা প্রভাতের নবোদিত সূর্যের দিকে। তবে এ প্রভাত সহজেই আসে না। একে আসতে হয় রাতের আঁধারকে ভেদ করে। রাত যখনই সময়ের অচলায়তন অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, তখনই প্রভাতের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। প্রভাত একান্তই রাতের গতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল। অনুরূ পভাবে মানবজীবনের বৈচিত্র্যময় জীবনধারার এটাই জীবনের আবর্তন। আজ যারা সুখে দিনাতিপাত করছে, তাদের সে সুখ একদিনে আসেনি। হাজারো চড়াই–উতরাই এর মাধ্যমে এসেছে। রাত এখানে দুঃখ–কষ্টের প্রতীক। প্রভাত সুখ–শান্তির প্রতীক। এই সুখ–শান্তি সহজেই পাওয়া যায় না। এজন্য মানুষকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হয়, পাড়ি দিতে হয় কষ্টের সমুদ্র। দুঃখ–কষ্টের প্রবহমান স্রোতই মানুষকে সুখ–সমৃদ্ধির দিকে ঠেলে দেয়। তাই বলা যায়, দুঃখ–কষ্ট যতই তীব্রতর হয়, সুখ–শান্তি ততই সহজে পাওয়া যায়।

মন্তব্য : দিবা–রাত্রির মতো মানুষের জীবনেও সুখ–দুঃখ চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে এবং প্রাণপণ চেষ্টা করলে মানুষ সুখের নাগাল একদিন না একদিন অবশ্যই পাবে। যথার্থ প্রচেষ্টা থাকলে মানুষ সুখের আলোক দর্শন করবেই করবে। জীবনে মানুষ যে অবস্থারই মুখোমুখি হোক হতাশা যেন তার ওপর ভর না করে।

২২

"আলো বলে, অন্ধকার, তুই বড় কালো
অন্ধকার বলে, ভাই তাই তুমি আলো।" [ব. বো. ১০]

মূলভাব : আলো ও অন্ধকার পরস্পর বিপরীতধর্মী হলেও একে অপরের পরিপূরক। একটির অস্তিত্ব ও মূল্য নির্ভর করে অন্যটির ওপর। আমাদের জীবনে আলো এবং অন্ধকারের মতো সুখ–দুঃখের বিচিত্র সমাবেশ ঘটে। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা নিরর্থক।

সম্প্রসারিত ভাব : আমাদের এ সুন্দর পৃথিবী পরস্পরবিরোধী উপাদানসমূহের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া দ্বারা সতত সচল। জন্ম–মৃত্যু, সৃষ্টি–ধ্বংস, আলো–অন্ধকার, সুখ–দুঃখ এসবই পরস্পর বিপরীতধর্মী। কিন্তু এরা একে অপরের পরিপূরক। জন্মের পর মৃত্যু অবধারিত বলেই জীবন এত মূল্যবান। ধ্বংসের ভয় আছে বলেই

মানুষ সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করতে ভালোবাসে। পৃথিবীতে সুখের অস্তিত্ব আছে তাই মানুষ দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করে। আর দুঃখের অস্তিত্ব আছে তাই সুখে বসবাস করার জন্য মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। পৃথিবীতে আলো ও অন্ধকার কেউ কারও অস্তিত্বকে স্বীকার করতে পারে না। অন্ধকার ছাড়া আলো মূল্যহীন। আর আলো ছাড়া পৃথিবীও অচল। কেননা, আলো না থাকলে ঘোর অমানিশায় ডুবে যাবে এই স্বপ্নীল পৃথিবী। আলো ঝলমল উজ্জ্বল দিন ফুরিয়ে পৃথিবীতে নামে রাতের অন্ধকার। রাত এলেই আমরা অনুধাবন করি উজ্জ্বল সূর্যের গুরুত্ব। রাত ফুরালে ভোরের সূর্য যখন উঁকি দেয় পুবের আকাশে, তখন আমাদের মন নতুন আশায় ভরে ওঠে। আলো অন্ধকারকে যতই অবজ্ঞা করুক, অন্ধকার ছাড়া আলোর গৌরব এতটা উজ্জ্বলভাবে আমাদের কাছে কোনোদিন ধরা পড়ত না। মন্দ আছে বলেই তো ভালোর গুণ বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব।

মন্তব্য : প্রকৃতপক্ষে নিরবচ্ছিন্ন সমস্ত কিছুর অস্তিত্বই মূল্যহীন। দুই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যের কারণেই জীবন ও প্রকৃতি হয়েছে কৌতূহলোদ্দীপক ও আকর্ষণীয়।

২৩

আত্মশক্তি অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

[ঢা. বো. ১৫, ১৩, ১০; য. বো. ১৪; কু. বো. ১২]

মূলভাব : শিক্ষা মানুষের মানসিক শক্তি তৈরি করে। ভালো ও সৎকর্মের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অধিকারী হয় দৃঢ় মনোবলের। এ আত্মশক্তি বা দৃঢ় মনোবল অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এর বলেই মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। কিন্তু যাদের মধ্যে এ আত্মশক্তি নেই তারা কখনও স্বনির্ভরশীল হতে পারে না। যাদের সারা জীবন পরনির্ভর থেকে অন্ধকার পরিবেশে জীবন কাটাতে হয়, তারা কখনও আলোর মুখ দেখতে পারে না। সবকিছুতেই যেন তাদের সংশয় কাজ করে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না করায় তারা হয় অন্তঃসারশূন্য। শিক্ষার আলোক পেয়েছে যারা তাদের দৃষ্টি বহুদূরে প্রসারিত। তারা জীবনের সঠিক পথ দেখতে পায়। জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের অন্য লোকের দ্বারস্থ হতে হয় না। তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে এগিয়ে চলে নিজের গতিতে। নিজের শক্তিকেই তারা সবচেয়ে বড় হাতিয়ার মনে করে। আর এ সবকিছুই সম্ভব প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে আত্মশক্তি অর্জনের মাধ্যমে। কিন্তু এ আত্মশক্তি মানুষের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করে। একে যথাসময়ে যথার্থরূপে আবিষ্কার করে নিতে হয়। যারা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত; তারাই এ আত্মশক্তিকে সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত অবস্থায় আনতে সমর্থ হয়।

মন্তব্য : শিক্ষা মানুষের জন্য জাদুর কাঠির মতো। এর স্পর্শে মানুষ মনুষ্যত্বলোকের স্বাদ পায়। নিজেকে ও আশপাশের পরিবেশকে চিনতে পেরে সে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে।

২৪

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে। [কু. বো. ১১]

মূলভাব : অন্যায়কারী এবং অন্যায় সহ্যকারী উভয়ই সমভাবে ঘৃণ্য। যারা আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বিশৃঙ্খল ও অরাজক পরিস্থিতি সমাজে তৈরি করে তারা সমাজের চোখে অপরাধী। আবার যারা এই অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য করে তারাও অপরাধী।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষ সামাজিক জীব। বিধাতা মানুষকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আচরণবিধি ঠিক করে দিয়েছেন। এগুলোকে আমরা ধর্মীয় বিধি–নিষেধ বলি। আবার ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বৃহত্তর কল্যাণে ও সামাজিক শান্তি–শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মানুষ গড়ে তুলেছে অনেক মান্য অনুশাসন ও অনুসরণীয় নিয়ম–নীতি। কিন্তু সমাজজীবনে এমন কিছু লোক থাকে যারা এসব অনুশাসন ও নিয়মনীতি মান্য ও অনুসরণ করে না; তারা অন্যকে উৎপীড়ন করে, অন্যের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণে সমাজকে অস্থিতিশীল করে। সামাজিক শৃঙ্খলাকে উপেক্ষা করে সামাজিক স্বার্থবিরোধী অন্যায় ও অবৈধ কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হয়। এরা সমাজের চোখে অন্যায়কারী ও আইনের চোখে অপরাধী বলে বিবেচিত হয়। এই অপরাধ বা অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ যে করে না বরং তা মেনে নেয়, সূক্ষ্ম বিচারে সেও অপরাধী। কেননা অন্যায়ের বিচার বা প্রতিবিধান না হলে তার মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মানুষের পক্ষে সমাজে বসবাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থার জন্য অন্যায় সহ্যকারীর দায়িত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য অপরাধীকে ক্ষমা করার মহৎ গুণের কথাই এ প্রসঙ্গে উঠতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে ক্ষমারও নির্দিষ্ট মাত্রা ও সীমা থাকা দরকার। অন্যায় করে যদি কেউ অনবরত ক্ষমা পেতে থাকে, তাহলে দিন দিন তার অপরাধপ্রবণতা প্রবল হয়ে উঠবে। তার স্বেচ্ছাচারিতার মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাবে। দিন দিন বাড়বে তার শক্তি ও সাহস। শাসনযন্ত্রেও সে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে এবং শেষ পর্যন্ত দুর্বিনীত অন্যায়কারী সবার কাছ থেকে সমীহ পেতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খল অবস্থা ও অস্থিরতা বিরাজ করবে।

মন্তব্য : অন্যায়কারী ও অন্যায়কে প্রশ্রয়দানকারী উভয়েই সমান অপরাধী। ক্ষমার দুর্বলতাকে সম্বল করে কেউ যেন অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হতে না পারে সে ব্যাপারে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। অন্যায়কারী এবং অন্যায় সহ্যকারী উভয়কেই আমরা ঘৃণার চোখে দেখব।

২৫

সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন। [য. বো. ০৮]

মূলভাব : পৃথিবীতে মানুষ স্মরণীয় ও বরণীয় হয় তার মহৎ কর্মের মধ্য দিয়ে। মানুষের কল্যাণ সাধনায় যারা জীবন উৎসর্গ করেন তারা মানুষের সর্বাধিক প্রিয় হয়ে ওঠেন। তারা হয়ে ওঠেন আত্মার আত্মীয়। তাই তাদের কেউ ভুলতে পারে না। তারা পৃথিবীতে অমর হন।

সম্প্রসারিত ভাব : আমাদের সমাজে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেয় তার স্বীয় কীর্তিময় অবদান। কিন্তু অর্থবিত্ত দ্বারা সেই স্থান অর্জন সম্ভব নয়। তারাই মহাপুরুষ যাদের জীবন পবিত্র ও মহৎ কর্মে চির প্রাণবন্ত ও উচ্ছল। কোনো কোনো মানুষ শতাধিক বছর জীবিত থেকেও তাদের মতো ইতিহাসে পাতায় নাম লেখাতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, কর্ম মানুষকে মহৎ করে তোলে। এসব মহাপুরুষের জীবন ও সাধনাই স্মরণ মননের যোগ্য। কারণ তা বৃহত্তর মানবসমাজকে মুক্তি, মৈত্রী ও শান্তির পথ দেখাতে সাহায্য করে। অন্য দিকে, এসব প্রতিভাবানরা তাঁদের কর্মের মহিমায় বিশ্বজগৎকে সুশোভিত করেন। সুমহান কর্মের মাধ্যমে আনন্দ, সুখ ও সমৃদ্ধির বহু অজানা দিগন্ত উন্মোচিত করেন, দেখান মুক্তির পথ। মানুষমাত্রই মরণশীল। ক্ষণভঙ্গুর এ জীবনে সত্যের সন্ধানে হযরত মুহম্মদ (সা.), ঈসা (আ.), মুসা (আ.), চৈতন্যদেব প্রমুখ জীবন

উৎসর্গ করেছিলেন। তারা কোনো নির্দিষ্ট স্থান ও কালের মানুষ ছিলেন না, ছিলেন সর্বযুগের ও সর্বকালের। তারা জগতে মহাপুরুষরূপে অগণিত মানুষের প্রীতি ও ভালোবাসা লাভ করেছেন। তাদের জন্যই যুদ্ধ-বিগ্রহসঙ্কুল এ পৃথিবী বসবাসের উপযোগী হয়েছে। তাঁদের মানবকল্যাণ কর্ম ও চিন্তা দ্বারা বিপথগামীরাও সুপথে পরিচালিত হয়। আর সভ্যতার ইতিহাসে তাঁরাই সৌভাগ্যবান পুরুষ হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। এসব বীর্যবান পুরুষ শারীরিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেও ইতিহাসের পাতায় অবিনশ্বর ও চির অম্লান হয়ে আছেন। পরবর্তী বংশধরেরা সেই সব মহাপুরুষের নাম স্মরণ করে, মহৎ জীবনের স্বর্ণতোরণে উপস্থিত হয়।

মন্তব্য : কাজেই জীবনে মহৎ কিছু করতে হলে, যারা স্মরণীয় তাদের পথ অনুসরণ করে চলা উচিত। সকলের জন্য মনের মধ্যে মমত্ববোধ এবং প্রেমভাব জাগিয়ে তোলাই জীবনকে ধন্য করার উপায়।

২৬

বিশ্রাম কাজের অঙ্গ এক সাথে গাঁথা
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

[য. বো. ১৫, দি. বো. ১২]

মূলভাব : পৃথিবীতে উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে মানুষের পরিশ্রম বা কাজের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই কঠিন পরিশ্রম মানুষ একটানা করতে পারে না। কাজ বা পরিশ্রমের পাশাপাশি বিশ্রাম গ্রহণ প্রয়োজন। একটি আরেকটির পরিপূরক।

সম্প্রসারিত ভাব : কাজ এবং বিশ্রাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কাজ বা পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি। পরিশ্রমের ফলেই জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে। আর পরিশ্রমের শেষে বিশ্রাম ফিরিয়ে আনে উদ্যম ও শক্তি। বিশ্রাম সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদকে নাশ করে এবং দেহ ও মনকে কাজের জন্য নতুনভাবে সতেজ করে। পরিশ্রমের পর শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহে উদ্যম ফিরিয়ে আনার জন্য যেমন বিশ্রামের প্রয়োজন, তেমনি বিশ্রামের পরে দেহের কর্মস্পৃহাকে সচল ও সজীব রাখার জন্য নিয়মিত শ্রমেরও প্রয়োজন। দেহের জন্য একটানা পরিশ্রম যেমন ক্ষতিকর, তেমনি একটানা বিশ্রামও সুখকর নয়। একটানা বিশ্রাম জীবনকে অলস, অচল ও কর্মবিমুখ করে তোলে। পরান্তরে, একটানা পরিশ্রমের ফলে দেহ-মনে ভর করে অবসাদ, এর ফলে লুপ্ত হয় দেহের কর্মক্ষমতা। চোখের পাতা যেমন চোখের জন্য অপরিহার্য অঙ্গ, তেমনি বিশ্রামও পরিশ্রমের জন্য অপরিহার্য। শুধু পরিশ্রমী ব্যক্তিই বিশ্রামের আনন্দ অনুভব করতে পারে। এ আনন্দ তার কাছে স্বর্গের সুধার মতো। যারা পরিশ্রম করে না তারা বিশ্রামের আনন্দও অনুভব করতে পারে না। সুতরাং বিশ্রাম ছাড়া কাজ এবং কাজ ছাড়া বিশ্রামের কোনো সার্থকতা নেই।

মন্তব্য : বিশ্রামকে তাই কাজের অঙ্গ বলা হয়েছে। একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন; কেননা শুধু কাজ কিংবা শুধু বিশ্রাম কোনোটাই জীবনের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই কাজের পাশাপাশি বিশ্রাম ও বিশ্রামের পাশাপাশি কাজ অপরিহার্য। এই অভ্যাসের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন সার্থকতার দিকে এগিয়ে যায়।

২৭

সংসার সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা
আশা তার একমাত্র ভেলা। [চ. বো. ১১]

মূলভাব : জীবন সংগ্রামে মানুষ আশায় বুক বাঁধে। আশায় ভর করেই মানুষ সম্মুখে এগিয়ে যায়। অথবা আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। আশা বা প্রত্যাশাই তার স্বপ্ন। আশাই তার কর্মের প্রেরণা জোগায়। আশার ভেলায় চড়েই সে জীবনসমুদ্রে পাড়ি জমায়।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষের জীবনে চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এখানে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত নিত্য নতুন দুঃখ-দুর্দশার সাথে চিরন্তন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। মনীষীরা সংসারটাকে সীমাহীন সমুদ্রের সাথে তুলনা করেছেন, আর সেই সমুদ্রে নিরন্তর আছড়ে পড়ে দুঃখের তরঙ্গমালা। বাস্তবকে মেনে নিলে দুঃখের অমানিশা কেটে একদিন সুখের সোনালি সকাল জীবনে আসবেই। এ আশাতেই মানুষ স্বপ্ন দেখে। দুঃখের দিনে আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের মতো এই পৃথিবীর সীমাহীন দুঃখের সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য ভেলা যেমন একমাত্র ভরসা তেমনি আশাই হচ্ছে জীবন সংসারের অবলম্বন। মানুষ সুখের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে। কিন্তু সুখ পাখির নাগাল পাওয়াও যে বড় কষ্ট। সোনার হরিণের মতো সুখ শুধু পালিয়ে বেড়ায়; কিন্তু মানুষ হাল ছাড়ে না– আপ্রাণ চেষ্টা করে তাকে ধরতে। সহস্র দুঃখ-বেদনা আর প্রতিকূলতার মধ্যেই মানুষ রুখে দাঁড়ায়, সংগ্রামে ব্রতী হয়। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা অনেক সময় ব্যর্থ হয়, সুখ থাকে নাগালের বাইরে। তবু মানুষ স্বপ্ন দেখে আশার ভেলায় ভর করে। কেউ বলে আশা সে তো মরীচিকা, মাইকেল মধুসূদন হাহাকার করে বলেন– 'আশার ছলনে ভুলি, কী ফুল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে–' কিন্তু আশার অমৃত রসেই উজ্জীবিত হয় মানুষ। আশা না থাকলে মানুষের পক্ষে সংসারধর্ম পালন করা সম্ভবপর হতো না। কেউ কোনো কাজ করত না, মানবজীবনের অস্তিত্ব হয়ে পড়ত বিপন্ন। আশা আছে বলেই মানুষের জীবন গতিশীল। আশাই মানুষকে টিকিয়ে রাখে সোনালি ভবিষ্যতের জন্য। মানুষ যখন চাওয়া পাওয়া হতাশার দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান ঠিক তখনই আশা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় সম্মুখ পানে।

মন্তব্য : আশা নামের এক অনির্বাণ শিখার আলোকে মানুষ অন্ধকারে খুঁজে নেয় পথ। সংসার সমুদ্রে মানুষ অক্লান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ লাভ করে। হতাশাগ্রস্ত মানুষের জীবনে সফলতা নেই। সকলকেই তাই হতে হবে আশাবাদী প্রাণবন্ত মানুষ।

২৮

"উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।" [চ. বো. ১০]

মূলভাব : উত্তম ব্যক্তির মাঝে তাঁর চরিত্র মাধুর্য যেমন থাকে তেমনই থাকে তার মনের প্রশস্ততা। তাই সে কলঙ্ক, দুর্নাম ও অপবাদের ভয় করে না। কিন্তু মধ্যম শ্রেণির লোক অধমের সাথে ব্যবধান রেখে চলে পিছে মানুষ তাকে অধম জ্ঞান করে।

সম্প্রসারিত ভাব : চরিত্র, প্রবৃত্তি এবং প্রবণতা অনুযায়ী মানুষকে উত্তম, মধ্যম এবং অধম-এ তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী তারা সৎ, সাহসী এবং আদর্শবান। তারা বরাবরই দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই তারা নিশ্চিন্তে অধম, পতিত এবং অসৎ ব্যক্তিদের সাথে মিশতে পারেন। এতে করে তিনি ছোট হয়ে যান না বা চরিত্র কলুষিত হবে এমন কোনো ভয়ও তার থাকে না। কারণ তিনি মিথ্যা অপবাদের ভয় করেন না। সে আলোকের কাছে যদি অন্ধকার থাকে তাহলে আলোকের কোনো ক্ষতি হয় না। বরং অন্ধকারই দূরীভূত হয়। চরিত্রবান উত্তম ব্যক্তিদের আমরা পরশপাথরের সাথে তুলনা করতে পারি। পরশপাথরের সান্নিধ্যে এসে সাধারণ পাথরও সোনা হয়ে যায়। তেমনি চরিত্রহীন অধম ব্যক্তি যদি উত্তম ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে তাহলে তার জীবনের রূপরেখা পাল্টে যেতে পারে। সকল ধরনের অন্যায় ও অসত্য পরিহার করে সেও শুদ্ধ

জীবনযাপন শুরব করতে পারে। কিন্তু সমাজে যারা মধ্যম শ্রেণির মানুষ, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ততটা উন্নত নয়। ফলে অসৎ মানুষের সঙ্গো যখন তারা মিশতে যায় তখন সব সময় তারা কলঙ্কের ভয়ে ভীত থাকে। তাই তারা অধম ব্যক্তির সংশ্রব সযত্নে এড়িয়ে চলে। এর ফলে তাদের পৰে কোনো মহৎ কাজ করা সম্ভব হয় না। আমাদের এই সমাজে ভালো এবং মন্দ উভয় প্রকার মানুষের বাস। মধ্যম ব্যক্তিরা শুধু ভালো মানুষের সাথে চলতে চায়। মন্দকে ভালো করার কঠিন চেষ্টায় তাঁরা কখনো আত্মনিয়োগ করেন না। তাঁরা কলঙ্ক থেকে শত হাত দূরে থাকতে চান এবং মন্দ লোক সম্পর্কে এক ধরনের ছুঁতমার্গে ভোগেন। ফলে তার থেকে সমাজ কিছুই পায় না। কিন্তু উন্নত চরিত্রের অধিকারী যাঁরা তাঁরা কখনো স্বার্থপরের মতো জীবনযাপন করেন না। কল্যাণের জন্য তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করেন। মিথ্যাকে, জরাকে, অসত্যকে যারা আঁকড়ে পড়ে আছে, তাঁদেরকেই তাঁরা শোনান সত্যের বাণী। জগতের সব মহামানবের অধমের মাঝেই জন্ম নিয়েছেন। তাঁদের সংস্পর্শে অধম পরিণত হয়েছে উত্তমে।

মন্তব্য : আত্মকেন্দ্রিক এবং আপসকামী শ্রেণির মানুষ সমাজে মধ্যম হিসেবে বিবেচিত। গা বাঁচিয়ে চলতেই তাঁরা ভালোবাসেন। কিন্তু উত্তম ব্যক্তিরা সত্যসন্ধানী। তাঁরাই অধমকে আলোর পথ দেখান। তাই অধমের সাথেই মিলেমিশে চলতে তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করেন না।

২৯

শিক্ষাই জাতির মেরবদণ্ড। [চ. বো. ১২]

অথবা,

শিক্ষাই জাতির উন্নতির পূর্বশর্ত।

মূলভাব : শিক্ষা এমন এক পরশ পাথর যার ছোঁয়ায় একটি জাতি পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। মেরবদণ্ডহীন মানুষ যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি শিক্ষাহীন কোনো জাতিকেও গণনা করা হয় না।

সম্প্রসারিত ভাব : সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষার মাধ্যমে জাতি কুসংস্কার, জড়তা ও হীনতা থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এক্ষেত্রে আদর্শ শিক্ষাই জাতিকে দিকনির্দেশনা দিতে পারে। বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগামী জাতিগুলোই বিশ্বকে পরিচালিত করছে। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা ছাড়া কোনো জাতি বড় হতে পারে না। শিক্ষাহীন জাতি মেরবদণ্ডহীন প্রাণীর মতো। মেরবদণ্ডহীন মানুষ জীবন্মৃতের মতো সংসারে জীবনযাপন করে, তার দ্বারা যেমন সমাজ ও দেশের কোনো উন্নতি আশা করা যায় না, তেমনি শিক্ষাহীন জাতিও পদে পদে পঙ্গু হয়ে পড়ে। তাই শিক্ষা একটি জাতির জীবনে মেরবদণ্ড। মেরবদণ্ডহীন মানুষ যেমন এ জগতে অপ্রয়োজনীয়, তেমনি শিক্ষাহীন জাতিও পৃথিবীতে পতিত। নিজেকে চেনার জন্য যেমন শিক্ষা প্রয়োজন, তেমনি জাতীয় অগ্রগতি শিক্ষা ছাড়া অসম্ভব। শিক্ষা মানুষের মানবিক গুণাবলিকে বিকশিত করে এবং তার মাঝে সুকুমার প্রবৃত্তির স্ফূরণ ঘটায়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করে তা দিয়ে সে জীবনকে ঠিকমতো গড়ে নিতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ না করলে মানুষ অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ জন্মগ্রহণ করলেও মূলত শিক্ষার মাধ্যমেই সে নিজেকে আবিষ্কার করে। যারা নিজেকে নিজে আবিষ্কার করতে পারে না, তারা পেছনে পড়ে থাকে। এ পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিরাই জাতিকে এগিয়ে যেতে বাধা সৃষ্টি করে। অশিক্ষিত মানুষ মানেই হচ্ছে অসচেতন এবং অসম্পূর্ণ মানুষ। এ পর্যায়ে পশু ও তার মাঝে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। তাই শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের মেরবদণ্ড বলা হয়ে থাকে, কারণ শিক্ষার প্রভাবেই মানুষ কুসংস্কার, জড়তা ও হীনতা মুক্ত হয়ে জাতিকে শক্তিশালী করতে পারে।

মন্তব্য : শিক্ষায় অগ্রসরতার মানদণ্ডে একটি জাতি চিহ্নিত হতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমেই কোনো জাতি নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে। একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে পরিচিতি লাভ করতে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই।

৩০

কীর্তিমানের মৃত্যু নেই।

[রা. বো. ১৫, য. বো. ১৫, সি. বো. ১৫]

মূলভাব : মহাকাল সব কিছুকে ধ্বংস করে দেয়। তারপরও কোনো কোনো কর্ম, ত্যাগ, সৃষ্টি কখনো বিলীন হয় না। তেমনি কোনো কোনো মহৎ কার্যাবলির মাধ্যমে মানুষ মানব জগতে চির অমর হয়ে থাকেন।

সম্প্রসারিত ভাব : মানবজীবন বিলয়ের অধীন; কিন্তু ধ্বংসের অধীন হয়েও কল্যাণময় কার্যাবলির মাধ্যমে অবিনশ্বর হওয়া যায়। অমরত্ব লাভের একমাত্র পথ নিজস্ব কার্যাবলি। কর্মই মানবজীবনকে মহিমান্বিত করে; বয়সের মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না; কারণ তাকে মরতে হবে। মরার পর কেউ তাকে স্মরণ করবে না, বরং সে যদি এ ক্ষুদ্র পরিসরের জীবনে মানবকল্যাণের জন্য কীর্তির স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে তবে সে মরে গিয়েও চিরকাল মানব হৃদয়ে অমর হয়ে থাকে। মানুষের দেহের মৃত্যু আছে কিন্তু তার মহত্ব, কীর্তি ও মহিমার কোনো মৃত্যু নেই। তা যুগ যুগ ধরে মানুষের মাঝে চির অম্লান হয়ে থাকে। দৈহিক মৃত্যু ঘটলেও তাদের কীর্তির মৃত্যু হয় না। মহামানবেরা তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য কিছুই করেন না। পরের জন্য তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। এ পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর এ পর্যন্ত অনেক মানুষই জন্মগ্রহণ করেছে ও পরের জন্য তারা নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই কর্মগুণে মানুষের হৃদয়ে সমাসীন রয়েছেন। একমাত্র যারা মহত্ব অর্জন করতে পেরেছেন তাদের জীবনই সার্থক। এভাবে কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব তাদের সৎকর্মের জন্য অমরত্ব প্রাপ্ত হন। এসব লোকের দৈহিক মৃত্যু হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা অমর। সর্বদাই তাঁরা মানবের অন্তরে বিরাজ করে। মানুষ তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গের জীবনদর্শন যুগ যুগ ধরে মানুষের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকে। সক্রেটিস, পেরটো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্যালিলিও প্রমুখ কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গের মৃত্যু হয়েছে বহুদিন; কিন্তু আজও তারা চিরভাস্বর মানুষের হৃদয়ে।

মন্তব্য : মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়। যেসব কীর্তিমান ব্যক্তি মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা অমর।

৩১

মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

মূলভাব : বিলাস ব্যসন নয়, মানবকল্যাণে ব্যয়িত অর্থই প্রকৃত ধন। বস্তুগত অর্থের যত উপযোগিতাই থাক না কেন, তা দ্বারা মানবসমাজের যত পরিবর্তন হোক না কেন, মানুষ যতটুকুই তৃপ্তি লাভ করবক না কেন, মনের উদারতা ও মানব মঙ্গালের চেয়ে মূল্যবান ধন আর নেই।

সম্প্রসারিত ভাব : মানব সমাজ আজন্ম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এর একটি দিক হচ্ছে কিভাবে, কতটুকু অর্থের পাহাড় গড়ে তোলা যায় এবং তা নিজের কিংবা মানবসমাজের হিতকর উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যায়। অর্জিত কিংবা প্রাপ্য ধন-সম্পদের সার্থকতা নির্ভর করে এর যথার্থ ব্যবহারের ওপর। অর্জিত অর্থ চরম ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে। তা ব্যক্তিকে তৃপ্ত করতে পারে, কিন্তু পূর্ণতা দিতে পারে না। কেননা এ অর্থে মানবকল্যাণ সাধিত হয়নি। ব্যক্তিক প্রয়োজনে

ব্যয়িত অর্থে ব্যক্তির প্রয়োজন শুধু মেটে না, অনেক সময় অতি অর্থের সমাগমে সে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করেই ক্ষান্ত হয় না; সমাজ এমনকি নিজের জন্যও মহাক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব অর্থ ধন নয় এবং তা কখনোই জাতীয় শক্তির উৎস হতে পারে না। ধনীর ধন তা উপার্জিতই হোক কিংবা দানের মাধ্যমেই অর্জিত হোক, তাতে সমাজের সাধারণ মানুষেরও অল্পবিস্তর অধিকার রয়েছে। সমাজ, সমাজের মানুষ এবং নিরন্নদের বঞ্চিত করে কেবল নিজস্ব ভোগ-বিলাসে যে অর্থ মানুষ ব্যয় করছে তা ধন নয়। মহামানবদের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে, এদের অনেকেই ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন না। তাদের যতটুকু সম্পদ ছিল তা মানবকল্যাণে ব্যয় করেছেন। ধনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই হচ্ছে মানবমঙ্গলের জন্য তা উৎসর্গ করা। বিলাসিতায় ব্যয়িত অর্থ অপব্যয় মাত্র; ধন নয়। সহজ কথায় অর্থের কোনো স্থায়িত্ব নেই। সুতরাং একে ধন বলা যাবে না। মানবমঙ্গল ভাবনা মানব চরিত্রের মহান বৈশিষ্ট্য। এ প্রবণতা মানবজীবনে সম্পদ বলে বিবেচিত হতে পারে।

মন্তব্য : প্রকৃত 'ধন' তাই যার দ্বারা মানবতা উপকৃত হয়; মানবমঙ্গল বিধান করা যায়। সৎপ্রেরণা থেকে উৎসারিত কর্ম ও অর্থ ব্যয়ই প্রকৃত ধন।

৩২

দ্বার রবন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকে রবখি সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি? [রা. বো. ০৮]

মূলভাব : সত্য মানবজীবন অমৃতের মতো, কিন্তু এটি সহজলভ্য নয়। ভুল-ভ্রান্তিকে বাদ দিয়ে নিছক সত্যানুসন্ধান করলে দুর্লভ সত্যকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। কেননা, সত্য অবিমিশ্র নয়; মিথ্যার পাশেই তার অবস্থান।

সম্প্রসারিত ভাব : সত্যের অনুসন্ধান এবং তা লাভ করা মানবজীবনের পরম এবং একমাত্র লক্ষ্য হলেও তা অর্জন করা কঠিন। কারণ মানবজীবন মাটির কলসে তোলা কোনো পবিত্র পানি নয়, তা নদীর প্রবহমান জলধারা এবং সেখানে থাকে অনেক আবিলতা। এর মধ্যে থেকে মানুষকে পানের যোগ্য পানিটুকু ছেঁকে নিতে হয়। সত্যও নদীর জলধারার মতো। তার সঙ্গে মিশে থাকে অনেক মিথ্যা এবং ছলনা। সত্য ও মিথ্যা পাশাপাশি অবস্থান করে। এ দুটি এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। আলোর সঙ্গে অন্ধকার যেমন জড়িত, তেমনি সত্যও মিথ্যা দ্বারা আবৃত। জীবনের কণ্টকিত পথে চলতে চলতে মানুষ সকল ভুল-ভ্রান্তি ও মিথ্যাকে অতিক্রম করে একসময় সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ায়; জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জন করে পরম সত্যকে। যারা ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে অতিক্রম না করে শুধু সত্য লাভ করতে চায়, তারা দুর্লভ সত্যের সন্ধান কখনো পায় না। সত্যকে আবিষ্কারের জন্য রূ ঢ় বাস্তবের দৃপ্ত পদচারণ প্রয়োজন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিষধর সাপের মস্তক থেকে যেমন উদ্ধার করতে হয় মূল্যবান মানিক, তেমনি ভুল-ভ্রান্তি এবং পঙ্কিলতা থেকে উদ্‌ঘাটন করতে হয় হিরণ্ময় সত্যকে। শিশু যেমন আছাড় খেতে খেতে হাঁটতে শেখে, মানুষও তেমনি ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সত্যকে চিনে নেয়। মিথ্যা ছাড়া সত্যের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। অন্তত মানবজীবনে এটি সত্য। মানুষের ভুল হবেই। তবে সে ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দিনকে যেমন রাতের সঙ্গে তুলনা করেই চেনা যায়, তাপকে যেমন শৈত্যের সঙ্গে তুলনা করে অনুভব করা যায় সত্যকেও তেমনি মিথ্যার পাশাপাশি রেখেই নির্ণয় করতে হয়। এজন্য প্রয়োজন মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা। উদারনৈতিক মনোভাব ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে; কেবল মিথ্যা, পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে দূরে রাখার মধ্য দিয়ে নয়। মন্দের ভয়ে যদি কেউ মনের দ্বারই বন্ধ করে রাখে তাহলে তিনি প্রার্থিত বস্তুটি লাভ করতে পারেন না।

মন্তব্য : সত্য কিংবা মিথ্যাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। একটি আরেকটির সাথে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

৩৩

জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর

[কু. বো. ১৩]

মূলভাব : স্রষ্টার সৃষ্ট জীবকে ভালোবাসলেই স্রষ্টার সেবা করা হয়। স্রষ্টাকে পাওয়ার উত্তম পথ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসা। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁকে খুশি করতে হলে তাঁর সৃষ্টিকুলকে খুশি করতে হবে।

সম্প্রসারিত ভাব : শুধু ঈশ্বরের প্রার্থনা করলেই তাঁকে পাওয়া যায় না বা নির্জনে বসে আলরাহর ধ্যানে মত্ত থাকলেও ধর্ম পালন করা হয় না। তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি সদয় হলেই তাঁকে ভালোবাসা হয়। কোনো মানুষ যদি ঈশ্বরকে পেতে চায় তবে ঈশ্বরের সৃষ্টি অন্য জীবকুলের প্রতি তাকে দয়া প্রদর্শন করতে হবে। সকল ধর্মেই সৃষ্টকুলকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। কোনো ধর্মেই বলা হয়নি যে, মানুষ মানুষকে বা অন্য কোনো প্রাণীকে ঘৃণা করবে। তাই সকল জীবকে ভালোবাসার মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি। পবিত্র ধর্মগ্রন্থেও বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও তবে আমার সৃষ্টিকুলকে ভালোবাস। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সৃষ্টিকুলকে ভালোবাসার মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। পবিত্র বৌদ্ধধর্মে বলা হয় 'পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক।' মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধি দিয়ে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাই শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে জন্মগ্রহণ করেও যদি অন্য প্রাণীর প্রতি যত্নবান না হওয়া যায় তবে মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। মনুষ্যত্ব মানুষকে দান করে হিরণ্ময় দ্যুতি। যার আলোয় মানুষ পথ চলতে পারে। পৃথিবীতে অসংখ্য দীন-দরিদ্র মানুষ ও ঐশ্বর্যশালী মানুষের সাহায্য ও ভালোবাসা প্রত্যাশা করে। আর এসব দুস্থ, কাঙাল, অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখালে স্রষ্টার সন্তুষ্টি বিধান করা হয়। শুধু আর্তমানবকে নয়; পশুপাখির মতো মূক ও অসহায় প্রাণীকেও ভালোবাসতে হয়। আজকের পৃথিবীতে যে নৈরাজ্য তার মূলে রয়েছে জীবের প্রতি জীবের ভালোবাসার অভাব। আর তাই আমরা যদি মানুষের প্রতি মানুষ, জীবের প্রতি জীব, প্রাণীর প্রতি প্রাণী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই তবেই পৃথিবী হবে সুন্দর, সুশৃঙ্খল।

মন্তব্য : স্রষ্টাকে পাওয়ার উত্তম পথ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসা। যদি তার সৃষ্টিকে ভালোবাসা যায় তবেই হবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা, তবেই জীবন হবে অর্থপূর্ণ।

৩৪

গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন, নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন। [সি. বো. ১৫, ১৪]

মূলভাব : ধন-সম্পদের সার্থকতা সদ্ভাবে ব্যয়ে আর বিদ্যার সার্থকতা মানসিক বিকাশ ও জগতের কল্যাণ সাধনে। কিন্তু বিদ্যা যদি বইয়ের পাতায় আবদ্ধ থাকে, চর্চা ও অনুশীলনের অভাবে কর্মক্ষেত্রে তার ব্যবহার না হয় তবে বাস্তবজীবনে সে বিদ্যার কোনো মূল্য নেই।

সম্প্রসারিত ভাব : বই হচ্ছে জ্ঞানের ধারক ও বাহক। বই পাঠ করে মানুষ তার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারে। কিন্তু বিদ্যাকে আয়ত্ত না করে কেবল গ্রন্থগত করে রেখে দিলে বা বইয়ের তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলে তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ গ্রন্থগত বিদ্যা মানুষের প্রয়োজনের সময় কোনো কাজেই আসতে পারে না। অনুরূ প প্রয়োজনের সময় অর্থ-সম্পদ অপরের কাছে রেখে তা নিজের

মনে করাটাও বোকামির শামিল। প্রয়োজনের সময় সে অর্থ কোনো কাজে আসে না। গ্রন্থকে সুসজ্জিত বইয়ের তাকে সাজিয়ে রেখে অনেকেই নিজেকে মহাজ্ঞানী ভাবেন। কিন্তু সেটা বোকামিরই পরিচয় বহন করে। আমাদের দেশের অনেক ছাত্রই বইপত্র কিনে টেবিল ভর্তি করে রাখে বা মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করে বটে; কিন্তু তাতে তাদের প্রকৃত জ্ঞান আহরণ হয় না। আর তাই পরক্ষণেই সব কিছু ভুলে যায়। ধনসম্পদ বলতে বোঝায় যা মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সচ্ছলরূ পে পরিচালনার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং জাগতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। অথচ সেই অর্থ যদি নিজের কাছে না রেখে বা গুদামজাত করে প্রয়োজনের মুহূর্তে না পাওয়া যায় তবে সে ধনসম্পদ নিরর্থক। তাতে কষ্টই বাড়ে, সমাধান হয় না। পুথিতে যে জ্ঞান আবদ্ধ থাকে আর পরের হাতে রক্ষিত ধন থাকে দুটিই সমান। দরকারের সময় সে বিদ্যা বিদ্যা নয়; সে ধন ধন নয়।

মন্তব্য : বিদ্যা ও সম্পত্তি সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। গ্রন্থগত বিদ্যাকে অধিকার করতে না পারলে যেমন কোনো লাভ নেই, তেমনি অপরের হাতে অর্থ-সম্পদ আছে জেনে কোনো কাজে হাত দেওয়াও ঠিক নয়।

৩৫

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

মূলভাব : অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করা একটি পরাধীন জাতির জন্য অনেক কঠিন কাজ। কিন্তু স্বাধীনতার যথার্থ মূল্য দিয়ে তাকে রক্ষা করা আরো বেশি কঠিন কাজ। এ কারণে অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা ও সুসংহত করার জন্য প্রত্যেকটি নাগরিকের অতন্দ্রপ্রহরীর মতো সদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

সম্প্রসারিত ভাব : 'স্বাধীনতা' মানুষের হৃদয়ে কাঙ্ক্ষিত শব্দ। স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। আর মানুষ মাত্রই স্বাধীনতাকামী। পরাধীন জীবন কারো কাম্য নয়। জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ গ্রহণের জন্য মানুষ চায় স্বাধীনতা। কবি তা উচ্চারণ করেছেন–'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়?' তাই প্রত্যেক মানুষের প্রধান আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া কোনো মানুষই অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে না। স্বাধীনতা কথাটি যতই মধুর হোক না কেন, এটা অর্জন করা অনেক কঠিন। এটা অর্জন করতে অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অনেক মূল্যের বিনিময়ে কিনতে হয়। বিদেশি শাসন-শোষণের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন হয় কঠিন সংগ্রামের। প্রায়ই ক্ষেত্রে বিদেশি শাসক শক্তি হয় পরাক্রমশালী। তাদের থাকে সুশৃঙ্খল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। সেই সঙ্গে বিপুল রণসম্ভার। তাদের বিরবদ্ধে লড়তে গেলে প্রয়োজন হয় জাতীয় ঐক্য, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, বিপুল সাংগঠনিক শক্তি এবং দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রাম হয় প্রত্যক্ষ, শত্রু থাকে প্রকাশ্য এবং লক্ষ্য হয় একমুখী। স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় জনগণ অগ্রসর হয় ত্যাগী মনোভাব নিয়ে। স্বার্থবুদ্ধি বা বিভেদের শক্তি তখন বড় হয়ে উঠতে পারে না। তার অস্তিত্ব থাকলে তা হয় অদৃশ্য। কিন্তু পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশ গঠনপর্বে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দেশের যাত্রা শুরব হয়। একদিকে থাকে পরাজিত শক্তি ও তাদের এদেশীয় অনুচরদের জিজ্ঞাসা ও মরণ কামড়ের জ্বালা, অন্যদিকে স্বাধীনতা পক্ষের শক্তির অভ্যন্তরীণ রেষারেষি। এ পরিস্থিতিতে নব অর্জিত স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত মোকাবিলা করা সহজ নয়। ভৌগোলিক ও পতাকার স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকা তখন দুরূ হ কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করা অনেক কঠিন কাজ। এ কারণে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে চাই সঠিক নেতৃত্ব। অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য। তা না হলে জীবনে উন্নতি ও প্রগতি হবে না। স্বাধীনতা অর্থবহ হবে না। তাই আমাদের দরকার দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে কাজ করা।

মন্তব্য : বলিষ্ঠ ও আত্মপ্রত্যয়ী জাতি হিসেবে আমাদের স্বাধীনতাকে অম্লান রাখতে সচেষ্ট থাকতে হবে। তবেই অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব। নতুবা ঈপ্সিত স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়বে। আপন কর্মপ্রেরণা, চিন্তাধারা ও শৃঙ্খলাবোধের দ্বারাই প্রমাণ করতে হবে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার আদর্শ।

৩৬

দুঃখের মতো এত বড় পরশপাথর আর নেই।

মূলভাব : প্রত্যেক মানুষের জীবনে রয়েছে সুখ-দুঃখের সহাবস্থান। একটিকে ছাড়া অন্যটি মানুষ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। দুঃখের সংস্পর্শে না এলে মানুষের স্বীয় সত্তা ও অন্তরশক্তি সঠিকভাবে জাগ্রত হয় না। দুঃখের পরশেই মানুষের বিবেক জাগ্রত হয়, মানুষের জীবন হয় মানবিক বোধে আলোকিত, মানুষ হয়ে ওঠে মহানুভব ও মহীয়ান।

সম্প্রসারিত ভাব : স্রষ্টার বিচিত্র রূ প। তিনি কখনও করবণা ধারায় তাঁর সব সুধা ঢেলে দেন, কখনও তিনি দুঃখের রবদ্রমূর্তি ধারণ করে আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন। সুখবিলাসী মানুষ জীবনের সারবত্তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। দুঃখে পতিত হলে মানুষ সুখের যথার্থ মর্ম বুঝতে পারে। দুঃখের দারবণ দহন শেষে মানুষের জীবনে যে সুখ আসে, তা অনাবিল ও অতুলনীয়। দুঃখই পারে মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব ও বিবেককে জাগ্রত করতে এবং মানুষকে খাঁটি মানুষে পরিণত করতে। দুঃখ মোকাবিলা করার শক্তি দিয়েই মানুষ আপন শক্তির পরিচয় দিতে পারে। পৃথিবীতে মহৎ কিছু অর্জন করতে হলে দুঃখ সইতে হয়। কষ্ট ছাড়া কেষ্ট পাওয়া যায় না বলেই পৃথিবীতে মহামনীষীরা দুঃখকে তুলনা করেছেন পরশপাথরের সঙ্গে। পরশপাথরের ছোঁয়ায় লোহা যেমন স্বর্ণপিণ্ডে পরিণত হয়, দুঃখও তেমনি মানুষের জীবনকে নতুন রূ প দেয়; দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া জীবনের স্বর্ণশিখরে আরোহণ সম্ভব নয়। পৃথিবীর বহু মনীষী দুঃখকে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিলেন বলেই আজও তারা স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.), যিশুখ্রিস্ট, গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ মহান ধর্মবেত্তা দুঃখকে জয় করে খাঁটি মানুষে পরিণত হয়েছিলেন; কাজ করেছিলেন মানবজাতির কল্যাণে।

মন্তব্য : বস্তুত, মানুষের মনুষ্যত্ব ও অন্তর্নিহিত গুণাবলির জাগরণের জন্য দুঃখ মানুষের জীবনে পরশপাথরের মতোই কাজ করে।

৩৭

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

[দি. বো. ১১]

মূলভাব : সৃষ্টিকর্তা নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন একে অপরের পরিপূরক হিসেবে। তাই নারী ও পুরুষ চিরকালের সার্থক সঙ্গী।

সম্প্রসারিত ভাব : জগতে চিরকালই পুরবষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সকল বেত্রে নারী ছায়ার মতো পাশে থেকেছে। নারী ও পুরবষের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া এই বিশ্বসংসার, সমাজ, সভ্যতা সবকিছুই অন্ধকারেই থেকে যেত। নারী ও পুরবষ পাশাপাশি থেকেছে বলেই সভ্যতার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছে। তাই নারী ও পুরবষ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সৃষ্টির আদিমকাল থেকে নারী পুরুষকে জুগিয়েছে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস। আর পুরুষ বীরের মতো সব কাজে অর্জন করেছে সাফল্য। আজ পর্যন্ত বিশ্বে যত অভিযান সংঘটিত হয়েছে, তার

অন্তরালে নারীর ভূমিকাই মুখ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে বীর যেমন জীবন দান করেছে তেমনি নারীও তার সিঁথির সিঁদুর হারিয়েছে। আবার ইতিহাসে পুরুষের পাশাপাশি অনেক বীরাঙ্গনাও রয়েছে যারা যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করেছে। সংগত কারণেই নারী ও পুরুষের কার্যক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে। তবুও নারী যেমন পুরুষের ওপর নির্ভরশীল, পুরুষও তেমনি নারীর মুখাপেক্ষী। তাই নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষের জীবন অসম্পূর্ণ, অর্থহীন। নারী ও পুরুষের মিলনের মধ্যেই রয়েছে জগতের সমস্ত কল্যাণ। উভয়ের দানে পুষ্ট হয়েছে আমাদের পৃথিবী। মানবসভ্যতা বিকাশে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছে আমাদের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

মন্তব্য : প্রকৃতপক্ষে পুরুষের শৌর্য–বীর্য আর নারীহৃদয়ের সৌন্দর্য, প্রেম ও ভালোবাসা এ দুয়ের সমন্বয়েই বিশ্বের সকল উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাই নারীর অবদানকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

৩৮

সঙ্গদোষে লোহা ভাসে।

মূলভাব : মানুষের স্বভাব–চরিত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে সঙ্গী নির্বাচন।

সম্প্রসারিত ভাব : প্রত্যেক মানুষই তার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন সত্তা বহন করে। সে একাই তার বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এক্ষেত্রে তার সঙ্গের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভবিষ্যতের সুন্দর বা খারাপের বিষয়টি নির্ভর করে ব্যক্তির ইচ্ছা বা সঙ্গ নির্বাচনের ওপর। যেসব মানুষ উন্নত চরিত্র বা সৎ–স্বভাবের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাদের স্বভাব–চরিত্রও সুন্দর ও বিকশিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যারা কুসঙ্গে বা কুসংসর্গে এসেছে তাদের চরিত্রের অধঃপতন ঘটেছে। চরিত্রের গঠনে ভালো মন্দ উভয় দিকই নির্ভর করে সঙ্গী নির্বাচনের ওপর। যারা খারাপ সঙ্গীর সংস্পর্শে থেকে নিজেদের চরিত্রের অধঃপতন ঘটিয়েছে, সমাজে তাদের বিপর্যয় অনিবার্য। তাই মানবজীবনে সঙ্গ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতিতেও যেসব বস্তু সুন্দর ও রমণীয়, সেগুলোর সংস্পর্শে যেসব বস্তু থাকে তারাও সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। খারাপ বস্তুটি সুন্দর বস্তুটির গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করে অন্যের কাছে নিজেকে মর্যাদাবান ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, সঙ্গই সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করে তোলে। আর এজন্য সঙ্গই হলো সবকিছুর সাফল্য ও বিফলতার চাবিকাঠি। ব্যক্তি যতই মনে করুক সে ভালো চরিত্রের অধিকারী হবে সে তা কখনোই হতে পারবে না যদি খারাপ সঙ্গীর সংস্পর্শে থাকে। কেননা খারাপের সঙ্গে থাকতে থাকতে একসময় প্রভাবিত হয়ে ব্যক্তি খারাপকে গ্রহণ করবে। তাই ভালো চরিত্র লাভ করতে ভালো সঙ্গী নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ।

মন্তব্য : ব্যক্তির চরিত্র গঠনে সঙ্গই ভালো মন্দের নির্ণায়ক।

৩৯

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

মূলভাব : লোভের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। লোভ মানুষের পরম শত্রু। লোভ মানুষকে অন্ধ করে; তার বিবেক বিসর্জন দিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

সম্প্রসারিত ভাব : লোভের বশবর্তী হয়েই মানুষ জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। মানুষ নিজের ভোগের জন্য যখন কোনো কিছু পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করে তাকে লোভ বলে। তখন যা নিজের নয়, যা পাওয়ার অধিকার তার নেই, তা পাওয়ার জন্য মানুষ লোভী হয়ে ওঠে। সে তার ইচ্ছাকে সার্থক করে তুলতে চায়। লোভের মোহে সে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ সব বিসর্জন দেয়। তার ন্যায়-অন্যায় বোধ লোপ পায়। সে পাপের পথে ধাবিত হয়। নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের সর্বনাশ করে। এভাবে লোভ মানুষকে পশুতে পরিণত করে। ডেকে আনে মৃত্যুর মতো ভয়াবহ পরিণাম। লোভের মোহে পড়লে মানুষের ব্যক্তিত্ববোধ লোপ পায়। ফলে লোভ ব্যক্তি তার হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সচেষ্ট থাকে। এতে তার চাহিদা তো পূরণ হয়ই না বরং আরও পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে একসময় লোভের কারণে তার পতন আসন্ন হয়ে ওঠে।

মন্তব্য : লোভের কারণে অন্তরের সুখ হারিয়ে যায়। ফলে এটি ব্যক্তির পতনের কারণ হয়। তাই সার্থক জীবনের জন্য লোভ পরিহার করা প্রয়োজন।

৪০

জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান।

মূলভাব : জ্ঞান বা বিবেক না থাকলে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো তফাৎ থাকে না।

সম্প্রসারিত ভাব : সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষকে আলাদা করেছে তার বিবেক বা জ্ঞান, যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই জ্ঞান বা বিবেক সুপ্ত অবস্থায় থাকে। অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। জ্ঞান মানুষকে যোগ্যতা দান করে। নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলে। জ্ঞানের আলোকেই মানুষের জীবন বিকশিত হয়ে ওঠে। তাই মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য জ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। অন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এখানেই। জ্ঞানবান মানুষ কখনো খারাপ কাজ করতে পারে না। তার বিবেক তাকে খারাপ আচরণ করতে বাধা দেয়। অন্যদিকে জ্ঞানহীন মানুষ পশুর মতো নির্বোধ। পশুর যেমন জ্ঞান নেই। সে ন্যায়-অন্যায় বোঝে না। আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। জ্ঞানহীন ব্যক্তিরও তেমনি কোনো বিবেক নেই। জ্ঞানের অভাবে তারা আধুনিক জীবনের সম্পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করতে পারে না। তাদের জীবনের সঙ্গে পশুর জীবনের কোনো পার্থক্য নেই। জ্ঞানই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দেয়। জ্ঞান রয়েছে বলেই মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এটি মানুষের জীবনে হিরন্ময় শিখার মতো অনন্য মানবীয় গুণ। জ্ঞানই একজন মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে তোলে। পশু যেমন নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ধুকে ধুকে মৃত্যুবরণ করে তেমনি জ্ঞানহীন মানুষের ক্ষেত্রেও একই ঘটে। ফলে জ্ঞান নামক মানবীয় গুণের উপস্থিতিই মানুষকে পশু থেকে উন্নত করে তুলেছে।

মন্তব্য : পশুর বিবেক নেই বলেই সে বেঁচে থাকাকেই জীবনের ধর্ম মনে করে। আর বিবেকহীন মানুষেরাও পশুর মতো কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে নিমগ্ন থাকে। তাই জ্ঞানহীন মানুষ এবং পশুর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।

৪১

পিতামাতা গুরুজনে দেবতুল্য জানি,
যতনে মানিয়া চল তাহাদের বাণী।

মূলভাব : বাবা, মা ও অভিভাবকবৃন্দ আমাদের জীবন গঠন ও পরিচালনার জন্য যেসব উপদেশ দেন, সেগুলো মেনে চলা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

সম্প্রসারিত ভাব : পিতা-মাতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। অনেক কষ্ট করে তাঁরা আমাদের লালন-পালন করেন। পিতা-মাতার সঙ্গে অন্য গুরুজনরাও আমাদের সুস্থ জীবন বিকাশে সহায়তা করেন। তাঁরা আমাদের স্নেহ করেন,

ভালোবাসেন এবং সর্বদাই মঙ্গল কামনা করেন। এঁরা সবাই বয়সে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, প্রজ্ঞায় আমাদের থেকে অনেক বড়। অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা জানেন কী করলে আমাদের ভালো হবে। আর কোন পথটি আমাদের জন্য ৰতিকর। নবীনতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে এই কঠিন ও জটিল পৃথিবীর অনেক কিছুই আমাদের অজানা। সে জন্য পিতা–মাতা, গুরবজন ও বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের উপদেশ চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর তা অবহেলা করলে জীবনে সফলতা আসবে না। প্রতি মুহূর্তেই আমরা হোঁচট খাব। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বায়েজিদ বোস্তামি গুরবজনদের আদেশ-উপদেশ শ্রদ্ধাভরে পালন করেছেন। আর সে কারণেই তাঁরা সকলের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হতে পেরেছেন। তাই পিতা-মাতা, গুরবজন আদর্শস্থানীয়, দেবতুল্য এবং আরাধনাযোগ্য। তাঁদের বাণী অনুসরণ করে নিজের জীবন গড়তে হবে এবং দেশ, জাতি তথা সমগ্র বিশ্বকে শাশ্বত কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

মন্তব্য : পিতা-মাতা, গুরবজন ও বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের উপদেশ মানলে নিজের জীবন সুন্দর ও বিকশিত হবে এবং দেশ ও জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারবে।

৪২

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

[ব. বো. ১৩, চ. বো. ১৩]

মূলভাব : মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ যেকোনো কিছুর প্রকৃত রস আস্বাদন করতে পারে এবং এই ভাষাতেই তার প্রাণের স্ফূর্তি ঘটে।

সম্প্রসারিত ভাব : পৃথিবীর প্রায় সব জাতিরই নিজস্ব ভাষা আছে এবং এক ভাষা থেকে অন্য ভাষা আলাদা। ভাষার মাধ্যমে আমরা শুধু নিজের মনের ভাবই অন্যের কাছে প্রকাশ করি না, মাতৃভাষার সাহায্যে অন্যের মনের কথা, সাহিত্য–শিল্পের বক্তব্যও নিজের মধ্যে অনুভব করি। নিজের ভাষার কিছু বোঝা যত সহজ, অন্য ভাষায় তা সম্ভব নয়। বিদেশে গেলে নিজের ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায় আরও প্রবলভাবে। তখন নিজের ভাষাভাষী মানুষের সান্নিধ্য পেতে ভেতরে ভেতরে মরবভূমির মতো তৃষিত হয়ে থাকে মানুষ। আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের ভাষা। বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি, পড়ালেখা করি, গান গাই, ছবি আঁকি, সাহিত্য রচনা করি, হাসি–খেলি, আনন্দ–বেদনা প্রকাশ করি। অন্য ভাষায় আমাদের সব অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরবল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এই ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনের শুরবতে অন্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করে পরে আবেপ করেছেন এবং মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন। মায়ের মুখের বুলি থেকে শিশু তার নিজের ভাষা আয়ত্ত করা শুরব করে এবং এই ভাষাতেই তার স্বপ্নগুলোকে রূ প দেওয়ার চেষ্টা করে, এই ভাষাতেই লেখাপড়া করে এবং জগৎ ও জীবনকে চিনতে শুরব করে। ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রৰার জন্য, দেশ–বিদেশের জ্ঞান–বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত রাখার জন্য আমাদের অন্যান্য ভাষাও শিখতে হয়। কিন্তু কোনো বিষয় বোঝার জন্য মাতৃভাষার মতো সহায়ক আর কিছু নেই। অন্য ভাষা শেখার জন্যও মাতৃভাষার বুনিয়াদ শক্ত হওয়া জরবরি।

মন্তব্য : স্বদেশের ভাষাকে ভালোবাসতে হবে, এর বিকাশ ও সমৃদ্ধিকে অবাধ করতে হবে এবং বিকৃতিকে রোধ করতে হবে। সুপেয় জল যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি স্বদেশের ভাষা সুমিষ্ট।

৪৩

লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড

মূলভাব : লাইব্রেরি হচ্ছে জ্ঞানের আধার। একটি জাতির রবচি, জ্ঞানের গভীরতা ও সভ্যতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় ঐ জাতির লাইব্রেরির মাধ্যমে।

সম্প্রসারিত ভাব : একটি জাতি বা দেশের সাহিত্য, জ্ঞান–বিজ্ঞান, খেলাধুলা–বিনোদন, সভ্যতা–সংস্কৃতির পরিচয়কে ধারণ করে সেই জাতির সযত্নে তৈরি লাইব্রেরি। কখনো কখনো মানুষের মুখ যেমন ব্যক্তির অন্তর্গত রূ প বা পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে, তেমনি লাইব্রেরি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতিকে চিহ্নিত করে। লাইব্রেরি জাতির অতীত ও বর্তমানকে এক সুতায় বেঁধে রাখে এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা দেয়। জ্ঞানান্বেষী ও সত্যসন্ধানী মানুষ লাইব্রেরিতে এসে নিজেকে সমৃদ্ধ করে এবং জাতির ক্রমোন্নতিতে ভূমিকা রাখে। একটি লাইব্রেরিতে সংরবিত সাহিত্যগ্রন্থ দেখে সংশিরষ্ট জাতির সাহিত্যরবচি উপলব্ধি করা যায়, বিজ্ঞানগ্রন্থ দেখে জাতির বিজ্ঞান–চিন্তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুভব করা যায়। তাই গ্রন্থাগার হচ্ছে কালের সাৰী। জ্ঞান–বিজ্ঞানসংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে লাইব্রেরি পরম বন্ধু এবং অনন্ত উৎস। পৃথিবীতে যত বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলোর প্রতিটির পেছনে রয়েছে লাইব্রেরির গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই অনেক বড় বড় যুদ্ধের পরে দেখা গেছে বিজয়ী শক্তি পরাজিত জাতির লাইব্রেরিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। একটি বৃহৎ লাইব্রেরি জাতির সব ধরনের তথ্যই শুধু সংরবণ করে না, দেশের সঠিক উন্নতিতেও প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। লাইব্রেরি মানুষের আনন্দেরও খোরাক জোগায় এবং মানুষের মনকে প্রশান্ত করে। পুস্তক পাঠ মানুষের একটি সৃষ্টিশীল শখ। আর এই শখ পূরণের জন্য লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী।

মন্তব্য : যে জাতি যত উন্নত, সেই দেশের লাইব্রেরি তত সমৃদ্ধ।

৪৪

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে [য. বো. ১২]

মূলভাব : প্রকৃতির সবকিছুরই একটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্য যথোপযুক্ত পরিবেশেই স্বতঃস্ফূর্ত ও আকর্ষণীয়।

সম্প্রসারিত ভাব : সৌন্দর্য প্রকৃতির এক মহামূল্যবান দান। কোথায় সেই সৌন্দর্য সবচেয়ে মানানসই, তা প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দেয়। নির্দিষ্ট পরিবেশের ব্যত্যয় ঘটলে সৌন্দর্যের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বন্য প্রাণীরা বনেই সুন্দর, পাখি মুক্ত আকাশে। ফুল সুন্দর গাছে, মাছ স্বাভাবিক জলে। কিন্তু বন্য প্রাণীকে লোকালয়ে, পাখিকে খাঁচায়, ফুলকে ফুলদানিতে, মাছকে ডাঙায় রাখলে তাদের জীবনের গতি ব্যাহত হয়, সৌন্দর্যের হানি ঘটে, কখনো কখনো জীবননাশের আশঙ্কা তৈরি হয়। প্রত্যাশিত পরিমণ্ডল হারিয়ে এরা নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে। শিশুরও যথার্থ স্থান মায়ের কোল। মায়ের কোলে শিশুকে যতটুকু মানায়, অন্য কোথাও তা সম্ভব নয়। নিজেদের শখ–আহ্লাদ পূরণের জন্য মানুষ কখনো কখনো কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে বন্য প্রাণী, পাখি, মাছ পোষার চেষ্টা করে, কিছুটা হয়তো সফলও হয়। কিন্তু এতে সেই সব প্রাণীর জীবনের ছন্দ নষ্ট হয়, বিকাশ ব্যাহত হয়। তাই কৃত্রিমতা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু প্রাণীর আবাস নয়, মানুষের জীবনেও কৃত্রিমতা কাম্য নয়। যে যেখানে উপযুক্ত তাকে সেখানেই থাকতে দেওয়া উচিত। তাহলে তার প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

মন্তব্য : যার যেখানে স্থান, তাকে সেখানেই থাকতে দেওয়া উচিত। প্রকৃত রূ পেই সবকিছু সুন্দর, কৃত্রিমতা স্বতঃস্ফূর্ততা ও নান্দনিকতার অন্তরায়।

৪৫

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

মূলভাব : মানুষে মানুষে অনেক ধরনের বিভেদ-বৈষম্য থাকতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক বিবেচনায় সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে আমরা সবাই মানুষ।

সম্প্রসারিত ভাব : সব মানুষ একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর একই জল-হাওয়ায় আমরা বেড়ে উঠি। আমাদের সবার রক্তের রং লাল। তাই মানুষ একে অন্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ভৌগোলিকভাবে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, অথবা আমরা যে যুগেরই মানুষ হই না কেন, আমাদের একটিই পরিচয়– আমরা মানুষ। কখনো কখনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা জাত-কুল-ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য তৈরি করে মানুষকে দূরে ঠেলে দিই, এক দল আরেক দলকে ঘৃণা করি, পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হই। কিন্তু এগুলো আসলে সাময়িক। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আমরা একে অন্যের পরম সুহৃদ। আমাদের উচিত সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। প্রত্যেককে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া এবং তার অধিকার সংরক্ষণে একনিষ্ঠ থাকা। মানুষের মধ্যে নারী–পুরুষ, শিক্ষিত–অশিক্ষিত, ধনী–দরিদ্র, ব্রাহ্মণ–শূদ্র, আশরাফ–আতরাফ, হিন্দু–মুসলমান, বৌদ্ধ–খ্রিস্টান, কেন্দ্রবাসী–প্রান্তবাসী এমন ভাগাভাগি কখনোই কাম্য হতে পারে না। তাতে মানবতার অবমাননা করা হয়। তাই আধুনিককালে এক বিশ্ব, এক জাতি চেতনার বিকাশ ঘটছে দ্রুত। মানবজাতির একই একাত্ম–ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে যুগে যুগে, দেশে দেশে মারামারি, যুদ্ধ–বিগ্রহ কমে আসবে। মানুষ সংঘাত–বিদ্বেষমুক্ত শান্তিপূর্ণ এক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সর্বত্র মনুষ্যত্বের জয়গাথা ঘোষিত হবে।

মন্তব্য : সব ধর্ম–বর্ণ–গোত্রের মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসতে পারলেই বিশ্বে প্রার্থিত সুখ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪৬

চরিত্র মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। [ব. বো. ১৫]

মূলভাব : চরিত্র মানবজীবনের মুকুটস্বরূ প। চরিত্রবান ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে; চরিত্রহীনকে সকলে ঘৃণা করে।

সম্প্রসারিত ভাব : চারিত্রিক গুণাবলির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের মহিমা প্রকাশ পায়। চরিত্রবান ব্যক্তি কতগুলো গুণের অধিকারী হন। সততা, বিনয়, উদারতা, নম্রতা, ভদ্রতা, রুচিশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, লোভহীনতা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণ চরিত্রবান ব্যক্তিকে মহত্ত্ব দান করে। এসব গুণ যদি মানুষের মধ্যে না থাকে, তাহলে সে পশুরও অধম বলে বিবেচিত হয়। চরিত্রহীন ব্যক্তির মানুষ হিসেবে কোনো মূল্য নেই। চরিত্রবান ব্যক্তি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণে সমাজে সমাদৃত হন। অন্যদিকে চরিত্রহীন ব্যক্তিকে কেউ ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে না, বরং ঘৃণা করে। চরিত্রবান ব্যক্তি জাগতিক মায়া–মোহ–লোভ–লালসার বন্ধনকে ছিন্ন করে লাভ করেন অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত সম্মান। চরিত্রের মাধ্যমেই ঘোষিত হয় জীবনের গৌরব। চরিত্রবান না হলে অন্য কোনো কিছুই মানুষকে সর্বোত্তম মানুষে পরিণত করতে পারে না। চরিত্রবান ব্যক্তি সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বদা অবিচল থাকে। এতে সে সকলের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু চরিত্রহীন কখনো কারো সম্মানের পাত্র হতে পারে না। সে সকল সময় মানুষের ঘৃণাই পেয়ে থাকে। স্বাস্থ্য, অর্থ, বিদ্যা মানবজীবনের অপরিহার্য উপাধান হলেও চরিত্র ছাড়া এগুলোর কোনোটাই কাজে আসে না। তাই চরিত্রের মাহাত্ম্য কখনো মূল্য দিয়ে মাপা যায় না।

মন্তব্য : অর্থ–বিত্ত–গাড়ি–বাড়ি প্রভৃতির চেয়ে চরিত্র অনেক বড় সম্পদ। আর এ মর্যাদা অর্থমূল্যে নয়, মানবিকতা ও নৈতিক পবিত্রতার মানদণ্ডে বিচার করতে হয়। সকলেরই উচিত চরিত্রবান হওয়ার সাধনা করা।

৪৭

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

[ব. বো. ১২, দি. বো. ১৫]

মূলভাব : সৌভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে কোনো মানুষের জন্ম হয় না। কর্মের মাধ্যমে মানুষ তার ভাগ্য গড়ে তোলে। পরিশ্রমই সৌভাগ্য বয়ে আনে।

সম্প্রসারিত ভাব : যিনি জন্ম দান করেন তিনি প্রসূতি। মা যেমন সন্তানের প্রসূতি, তেমনি পরিশ্রম হলো সৌভাগ্যের প্রসূতি বা উৎস। মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতে হয়। ভালো কাজের ফল ভালো, মন্দ কাজের ফল মন্দ। কোনো কাজই সহজ নয়। আবার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কঠিন কাজও সহজ হয়। জীবনে উন্নতি করতে হলে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। পরিশ্রম ছাড়া কেউ কখনো তার ভাগ্যকে গড়ে তুলতে পারেনি। জীবনে অর্থ, বিদ্যা, যশ, প্রতিপত্তি লাভ করতে হলে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে। ছাত্রজীবনে কঠোর পরিশ্রম করে শিক্ষালাভ না করলে ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। পরিশ্রম ছাড়া জাতীয় উন্নতিও লাভ করা যায় না। পৃথিবীতে এমন একটি জিনিসও নেই যা শ্রমলব্ধ নয়। আমাদের সমাজ ও সভ্যতা বর্তমান পর্যায়ে আসার মূলে রয়েছে পরিশ্রম। যুগ যুগ ধরে তিল তিল পরিশ্রমের মাধ্যমে সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। মানব কল্যাণে আবিষ্কারকগণ পরিশ্রম করে আবিষ্কার করেছেন বিভিন্ন সূত্র। পরিশ্রম না করে অলস বসে থাকলে কখনো ভালো ফল এসে ধরা দেয় না। ভালো ফল ধরা দেয় তখনই যখন কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ফলাফলকে নিজের করে নিতে হয়।

মন্তব্য : শ্রমই হলো উন্নতির চাবিকাঠি। যে জাতি পৃথিবীতে যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত উন্নত। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই জাতির অগ্রগতি অর্জন করা যায়।

৪৮

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

মূলভাব : জীবন কর্মময়। কর্মশক্তির মূলে রয়েছে উৎসাহ–উদ্দীপনা আর প্রবল আগ্রহ। আগ্রহের সঙ্গে নিষ্ঠা যুক্ত থাকলে অসাধ্যকেও সাধ্য করা যায়।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষকে সব বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করে তার ইচ্ছাশক্তি। প্রতিদিনই আমাদের কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। পৃথিবীতে কোনো কাজই বিনা বাধায় করা যায় না। সব কাজেই কিছু না কিছু সুবিধা–অসুবিধা ও বাধা–বিপত্তি থাকে। সেই অসুবিধা ও বাধা–বিপত্তি অতিক্রম করতে পারলেই সাফল্য আসে। এজন্য প্রয়োজন প্রবল ইচ্ছা। ইচ্ছা থাকলে কোনো কাজ আটকে থাকে না। ইচ্ছাই সকল কর্মের প্রেরণা। ইচ্ছাই মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। দৃঢ় ইচ্ছার কাছে সকল বাধা হার মানে। প্রবল ইচ্ছা নিয়ে কোনো কাজ করলে অতি কঠিন কাজও শেষ করা যায়। পৃথিবীর মহান ব্যক্তিরা এভাবেই সব ধরনের বিপত্তি অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁর সেনাবাহিনীসহ আল্পস পর্বতের কাছে গিয়ে অসীম উৎসাহে বলে ওঠেন : 'আমার বিজয় অভিযানের মুখে আল্পস পর্বত থাকবে না।' আত্মশক্তি ও

ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি আল্পস পার হতে পেরেছিলেন। অসাধ্যকে সাধন করতে পেরেছিলেন প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে।

মন্তব্য : মানুষের সকল কাজের মূল হলো ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাই মানুষকে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দেয়।

৪৯

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

[য. বো. ১২, দি. বো. ১৫]

মূলভাব : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে তাকে বেঁচে থাকতে হয়।

সম্প্রসারিত ভাব : সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের জীবন অর্থহীন। কারণ, সমাজে প্রতিটি মানুষ একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি কেবল নিজের কথা ভাবে, সমাজের কথা ভাবে না, সে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ কখনোই সুখী হয় না। যারা নিজের কথা না ভেবে সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেয় তারাই প্রকৃত মানুষ। অন্যের সুখের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করে, তাদের মতো সুখী আর কেউ নেই। সমাজে এ রকম মানুষেরাই চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসাই প্রকৃত মানবধর্ম। আজকের এই সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে কাজ করেছে মানুষের শুভবুদ্ধি ও অন্যের কল্যাণ করার ইচ্ছা। আর অন্যের কল্যাণ করার এই ইচ্ছা ব্যক্তিকে সকলের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় করে তোলে। সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়ার মাঝে রয়েছে প্রকৃত সুখ। পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার মাঝে রয়েছে মানবজীবনের চরম সার্থকতা। আমরা শুধু নিজের জন্যই জন্মগ্রহণ করিনি, নিজের সুখই আমাদের একমাত্র কাম্য হতে পারে না। অন্যের কল্যাণই মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। আর এটিই সকলের একমাত্র কাম্য হওয়া প্রয়োজন।

মন্তব্য : ত্যাগের মাঝেই জীবনের সার্থকতা নিহিত, ভোগের মাঝে নয়।

৫০

কাঁটা হেরি ৰান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে? [ঢা. বো. ১১]

মূলভাব : পৃথিবীতে যেকোনো কাজে সাফল্য লাভ করার জন্য প্রয়োজন ঐকান্তিক সাধনা ও নিষ্ঠা; প্রয়োজন সকল প্রতিকূলতাকে জয় করার মনোবল ও সহ্যশক্তি। দুঃখ-কষ্ট বা পরিশ্রমের ভয়ে কাজ থেকে বিরত থাকা অনুচিত। কেননা দুঃখ ছাড়া সুখ লাভের কোনো উপায় নেই।

সম্প্রসারিত ভাব : হৃদয়গ্রাহী সৌন্দর্যের কারণে ফুল সবার কাছে প্রিয়। কিন্তু তার গায়ে রয়েছে কাঁটা। তাকে পেতে হলে অতিক্রম করা দরকার কাঁটার বাধা। ফুল সংগ্রহকারীকে সহ্য করতে হবে কাঁটার আঘাত। এ আঘাতে হাত ৰতবিৰত হওয়াও বিচিত্র নয়। যিনি এ আঘাতের কষ্টটুকু বরণ করতে প্রস্তুত, তিনি অবশ্যই কমল পেতে পারেন। পৃথিবীতে মানুষের চলার পথ কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত এই কণ্টকাকীর্ণ দুঃখময় পথে সমস্ত প্রতিকূলতাকে হাসিমুখে বরণ করে অগ্রসর হওয়া। দুঃখকে বরণ করতে না শিখলে সুখ অর্জন করা সম্ভব নয়। কাঁটার আঘাতের ভয়ে কেউ পদ্মফুল সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকলে, তার পৰে কখনোই পদ্মফুল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ক্লান্তির ভয়ে পথিক ভীত হয়ে পড়লে তার পৰে কখনও গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। তাই জীবনে চলার পথের সকল প্রতিকূলতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে দৃপ্ত সংকল্পে মানুষকে অগ্রসর হতে হয় ইপ্সিত লৰ্য অর্জনের জন্য।

মন্তব্য : ফুলের শোভা মনভরে উপভোগের জন্য কাঁটার আঘাত সইতে হয়। তেমনিভাবে জীবনে সুখলাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে শেখা। শ্রমকে ভয় পেলে জীবনে সাফল্য আসে না। জীবনে কোনো মহৎ প্রাপ্তিই ত্যাগ-তিতিৰা ছাড়া অর্জিত হয় না।

৫১

দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

মূলভাব : দুর্জনের স্বভাব-ধর্ম অন্যের ৰতি করা। তাই কোনো শিৰিত লোক যদি চরিত্রহীন হয়, তবে অবশ্যই তার সঙ্গ পরিহার করা উচিত। কারণ, তার কাছ থেকে উপকার পাওয়ার চেয়ে বরং ৰতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষ্যত্ববিরোধী কুপ্রবৃত্তিগুলো দুর্জন লোকের নিত্যসঙ্গী। এই ধরনের ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র দুর্বল। সমাজ, দেশ বা জাতি কেউ এদের দ্বারা উপকৃত হয় না। এরা সমাজের কলঙ্ক। এরা আত্মকেন্দ্রিক, লোভী এবং স্বার্থপর। কোনো কোনো দুর্জন লোক প্রাতিষ্ঠানিক শিৰায় শিৰিত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবে হয় না জ্ঞানী। তাদের শিৰার সার্টিফিকেট একটি কাগজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সার্টিফিকেট-সর্বস্ব শিৰা এদের চরিত্র ও মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এরা শিৰিত হয়ে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। চাতুরি ও ছলনায় আরও কূটকৌশলী হয়ে এরা সহজ-সরল মানুষকে প্রতারিত করে। এদের সাহচর্যে সততার অপমৃত্যু ঘটে। মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ তার চরিত্র। মানুষের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে অপরাপর বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটানো আবশ্যক। তেমনি, বিদ্বান হওয়াও একটি গুণ। বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। বিদ্বানের সংস্পর্শে এলে জ্ঞানের আলোয় মন আলোকিত হয়। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি চরিত্রহীন হয়, তবে তার বিদ্যার কোনো মূল্য থাকে না। সে তার বিদ্যাকে অন্যায় কাজে লাগায়। এরা নিজের স্বার্থ বা অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যেকোনো কৌশলের আশ্রয় নিতে পারে। চরিত্রহীন বিদ্বান ব্যক্তির কাছ থেকে বিদ্যা লাভ করে জীবনে কোনো কল্যাণ সাধন করা যায় না। তাই দুর্জন যদি বিদ্বানও হয়, তবু তার সান্নিধ্য ও সংশ্রব ত্যাগ করাই মঙ্গলজনক।

মন্তব্য : বিদ্যা অমূল্য ধন। কিন্তু এ ধন অর্জনকারী ব্যক্তি চরিত্রহীন হলে তা অসৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে পারে। তাই তার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

৫. প্রবন্ধ রচনা

- **প্রবন্ধ কী :** 'প্রবন্ধ' শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট বন্ধন। প্রকৃতপৰে ভাব ও ভাষার বন্ধন। কোনো একটি বিষয়কে ভাব ও চিন্তার মধ্য দিয়ে ভাষায় প্রাণবন্ত করে প্রকাশ করাই হচ্ছে প্রবন্ধ।
- **প্রবন্ধের প্রকারভেদ :** বিষয়ভেদে প্রবন্ধকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।
  যথা– ১. বর্ণনামূলক; ২. ঘটনামূলক; ও ৩. চিন্তামূলক।
- **প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশ :** প্রবন্ধের সাধারণত তিনটি অংশ। যথা– ১। ভূমিকা, ২। মূল অংশ ও ৩। উপসংহার।

১। **ভূমিকা :** প্রবন্ধের প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা বা ভূমিকা অংশ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশের দরজা। সূচনা-পর্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য ভূমিকা

অংশের ওপর মূল বিষয়গত ভাবের প্রতিফলন এমনভাবে হওয়া দরকার যাতে প্রবন্ধের মূল বিষয়ে উত্তরণের দ্বার তো খুলে যাবেই, সেই সঙ্গে বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী হয়ে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হবে। ভূমিকা যাতে অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বাগ্‌বাহুল্য–দোষে দুষ্ট না হয় সেদিকে লৰ রাখতে হবে।

২। **মূল অংশ :** ভূমিকার পরে প্রবন্ধের মূল বিষয়ের আলোচনা শুরব হয়। মূল বক্তব্য পরিবেশনের আগে বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় সংকেত (points)–এ ভাগ করে নিতে হয়। সংকেত–সূত্রের পরম্পরা রৰা করে প্রবন্ধের অবয়বকে সুসংহতভাবে গড়ে তুলতে হয়। প্রতিটি সংকেতের কতখানি বিস্তার হবে তা তার প্রকাশের পূর্ণতার ওপর নির্ভরশীল। কাজেই আয়তনগত পরিমাপ নির্দিষ্ট নেই। প্রতিটি সংকেতের ওপর প্রয়োজনীয় গুরবত্ব দিয়ে আলোচনা করতে হয়।

৩। **উপসংহার :** প্রবন্ধের সর্বশেষ অংশ উপসংহার। সূচনার মতো সমাপ্তিরও আছে সমান গুরবত্ব। প্রবন্ধের ভাববস্তু ভূমিকার উৎস থেকে ক্রমাগ্রগতি ও ক্রমবিকাশের ধারা বহন করে উপসংহারে এসে একটি ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে সমাপ্তির ছেদ–রেখা টানে। এখানে লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। উপসংহারে লেখক একদিকে যেমন আলোচনার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, অন্যদিকে তেমনি লেখকের নিজস্ব অভিমতের কিংবা আশা–আকাঙ্ক্ষার সার্থক প্রতিফলনও ঘটে।

❑ **প্রবন্ধ রচনার ৰেত্রে যা যা মনে রাখা প্রয়োজন :** প্রবন্ধ রচনার সময় কিছু নিয়মকানুন অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাহলে প্রবন্ধের মান বৃদ্ধি পায় এবং পরীৰায় অধিক নম্বর পাওয়া যায়। এৰেত্রে–

১. প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।
২. চিন্তাপ্রসূত ভাবগুলো অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হবে।
৩. প্রতিটি ভাব উপস্থাপন করতে হবে পৃথক অনুচ্ছেদে।
৪. একই ভাব, তথ্য বা বক্তব্য বারবার উলেরখ করা যাবে না।
৫. রচনার ভাষা হতে হবে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।
৬. উপস্থাপিত তথ্যাবলি অবশ্যই নির্ভুল হতে হবে।
৭. বড় ও জটিল বাক্য যতটা সম্ভব পরিহার করতে হবে।
৮. নির্ভুল বানানে লিখতে হবে।
৯. সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটানো যাবে না।
১০. উপসংহারে সুচিন্তিত নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করতে হবে।

❶ বাংলাদেশের ষড়ঋতু

[চ. বো. ১৫, ব. বো. ১১, সি. বো. ১১]

সূচনা : সুজলা–সুফলা, শস্য–শ্যামলা অপরূ প নিসর্গের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। ঋতুচক্রের আবর্তে এখানে চলে প্রকৃতির রং বদলের খেলা। নতুন নতুন রং–রেখায় প্রকৃতি আলপনা আঁকে মাটির বুকে, আকাশের গায়ে, মানুষের মনে। তাই ঋতু বদলের সাথে সাথে এখানে জীবনেরও রং বদল হয়।

ষড়ঋতুর পরিচয় : বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ঋতুগুলো হচ্ছে– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এই ঋতুগুলো প্রতি দুই–মাস অন্তর চক্রাকারে আবর্তিত হয়। ঋতুর এই পালাবদলের সাথে সাথে বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপ ও সৌন্দর্য বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে।

গ্রীষ্মকাল : ঋতুচক্রের শুরুতেই আগুনের মশাল হাতে মাঠ–ঘাট পোড়াতে পোড়াতে গ্রীষ্মরাজের আগমন। বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মের রবরতায় প্রকৃতির শ্যামল–স্নিগ্ধ রূপ হারিয়ে যায়। খাল–বিল, নদী–নালা শুকিয়ে যায়। অসহ্য গরমে সমস্ত প্রাণিকুল একটু শীতল পানি ও ছায়ার জন্য কাতর হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে কখনো হঠাৎ শুরু হয় কালবোশেখির দুরন্ত তাণ্ডব। সেই তাণ্ডবে গাছপালা ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যায়। তবে গ্রীষ্ম শুধু পোড়ায় না, অকৃপণ হাতে দান করে আম, জাম, জামরুল, লিচু, তরমুজ ও নারকেলের মতো অমৃত ফল।

বর্ষাকাল : গ্রীষ্মের রবরতাকে বৃষ্টির জলে ধুয়ে দিতে মহাসমারোহে বর্ষা আসে। আষাঢ়–শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রকৃতি থেমে থেমে শিউরে ওঠে। শুরু হয় মুষলধারায় বৃষ্টি। মাঠ–ঘাট পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। প্রকৃতিতে দেখা দেয় মনোরম সজীবতা। জনজীবনে ফিরে আসে প্রশান্তি। গাছে গাছে ফোটে কদম, কেয়া, জুঁই। প্রকৃতি এক মনোরম স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। তাই তো কবি বর্ষার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন–

"বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউশের ৰেত জলে ভর ভর
কালিমাখা মেঘ ওপারে আঁধার
ঘনিয়াছে দেখ চাহি রে।"

শরৎকাল : বাতাসে শিউলি ফুলের সুবাস ছড়িয়ে আসে ঋতুর রানি শরৎ। ভাদ্র–আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। এ সময় শুভ্র জ্যোৎস্না আর সুরভিত ফুলের সুষমা মনকে উচাটন করে তোলে। নদীর তীরে তীরে বসে সাদা কাশফুলের মেলা। বিকেলবেলা মালা গেঁথে উড়ে চলে সাদা বকের সারি। সবুজ ঢেউয়ের দোলায় দুলে ওঠে ধানের খেত। শাপলার হাসিতে বিলের জল ঝলমল ঝলমল করে। তাই শরতের শোভাময় প্রকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে কবি বলেছেন–

আজিকে তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।

হেমন্তকাল : ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসবের আনন্দ নিয়ে আগমন ঘটে হেমন্তের। কার্তিক–অগ্রহায়ণ দুই মাস হেমন্তকাল। প্রকৃতিতে হেমন্তের রূপ হলুদ। সর্ষে ফুলে ছেয়ে যায় মাঠের বুক। মাঠে মাঠে পাকা ধান। কৃষক ব্যস্ত হয়ে পড়ে ফসল কাটার কাজে। সোনালি ধানে কৃষকের গোলা ভরে ওঠে, মুখে ফোটে আনন্দের হাসি। শুরু হয় নবান্নের উৎসব। হেমন্ত আসে নীরবে; আবার শীতের কুয়াশার আড়ালে গোপনে হারিয়ে যায়।

শীতকাল : কুয়াশার মলিন চাদর গায়ে উত্তুরে হাওয়া সাথে নিয়ে আসে শীত। পৌষ–মাঘ দুই মাস শীতকাল। শীত রিক্ততার ঋতু। কনকনে শীতের দাপটে মানুষ ও প্রকৃতি অসহায় হয়ে পড়ে। তবে রকমারি শাকসবজি, ফল ও ফুলের সমারোহে বিষণ্ন প্রকৃতি ভরে ওঠে। বাতাসে ভাসে খেজুর রসের ঘ্রাণ। ৰীর, পায়েস আর পিঠাপুলির উৎসবে মাতোয়ারা হয় গ্রামবাংলা। তাই তো কবি বলেছেন–

"পৌষ পার্বণে পিঠা খেতে বসে খুশিতে বিষম খেয়ে,
আরও উলরাস বেড়েছে মনে মায়ের বকুনি খেয়ে।"

বসন্তকাল : বাংলাদেশে ঋতুচক্রের সবশেষে আসে ঋতুরাজ বসন্ত। ফাল্গুন–চৈত্র দুই মাস বসন্তকাল। বসন্ত নিয়ে আসে সবুজের সমারোহ। বাতাসে মৌ মৌ ফুলের সুবাস। গাছে গাছে কোকিল–পাপিয়ার সুমধুর গান। দখিনা বাতাস বুলিয়ে দেয় শীতল পরশ। মানুষের প্রাণে বেজে ওঠে মিলনের সুর। আনন্দে আত্মহারা কবি গেয়ে ওঠেন–

আহা আজি এ বসন্তে

এত ফুল ফোটে, এত বাঁশি বাজে
এত পাখি গায়।

উপসংহার : বাংলাদেশে ষড়ঋতুর এই লীলা অবিরাম চলছে। প্রতিটি ঋতু প্রকৃতিতে রূপ-রসের বিভিন্ন সম্ভার নিয়ে আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তার প্রভাব পড়ে বাংলার মানুষের মনে। বিচিত্র ষড়ঋতুর প্রভাবেই বাংলাদেশের মানুষের মন উদার ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।

২ আমাদের দেশ

সূচনা : সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। সবুজে ঘেরা, পাখি ডাকা দেশটির রূ পের কোনো শেষ নেই। কবির দেশ, বীরের দেশ, গানের দেশ, মায়ের দেশ- এ রকম অনেক নামে এ দেশকে ডাকা হয়। দেশের অবারিত ফসলের ৰেত, মাঠ-ঘাট, প্রকৃতি প্রভৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাই কবি গেয়ে উঠেছেন-

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।"

অবস্থান ও আয়তন : বাংলাদেশ দৰিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ। এর সীমান্তের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে ভারত। আর দৰিণ-পূর্বের সামান্য অংশে মিয়ানমার এবং দৰিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এ দেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

স্বাধীনতা লাভ : ১৯৭১ সালে এক রক্তৰয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এই স্বাধীনতা বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল একটি অধ্যায়। সুদীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে বাঙালি জাতি ছিল দিশেহারা। পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশদের দুশো বছরের অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে আবার শুরব হয় পাকিস্তানিদের অপশাসন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এই সময়কালে পাকিস্তানি শাসকচক্রের অত্যাচারে বাঙালি জাতি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তারা স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে দীর্ঘ নয় মাসের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে নাম লেখায় আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ।

জনসংখ্যা : জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। বর্তমানে দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। আয়তনের তুলনায় এই জনসংখ্যা অনেক বেশি। ফলে প্রতিনিয়ত এই দেশকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ সামলাতে হচ্ছে। এই জনসংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ বাস করে ঢাকা শহরে।

ভাষা : বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এ দেশে অনেক জাতি-গোষ্ঠীর লোক বাস করে। যেমন- চাকমা, মারমা, মুরং, সাঁওতাল, খুমি, লুসাই, বম, খেয়াং, রাখাইন ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা। তবে বাংলা-ই আমাদের রাষ্ট্রভাষা।

ভূ-প্রকৃতি : বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। এ দেশের প্রায় সবটাই সমভূমি। তবে সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কুমিলৰার কিছু অংশে পাহাড় রয়েছে। এছাড়া রয়েছে শত-সহস্র আঁকাবাঁকা নদ-নদী।

ঋতুবৈচিত্র্য : বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। প্রতি দুই মাসে একটি করে ঋতুর পালাবদল ঘটে। একেক ঋতুতে প্রকৃতি একেক সাজে সেজে ওঠে। প্রতিটি ঋতুর সৌন্দর্যই অতুলনীয়। এ দেশের অপরূ প প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মূল কারণ এই ঋতুবৈচিত্র্য। এ দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টি ঋতু বিদ্যমান। বৈশাখ মাস থেকে প্রতি দুই মাস অন্তর একটি করে ঋতু ধরা হয়।

জনজীবনের বৈচিত্র্য : বাংলাদেশে আছে নানা ধর্মের, নানা পেশার লোকজন। ধর্মীয় দিক থেকে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানই প্রধান। এছাড়া পেশার ৰেত্রে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষক, কামার, কুমোর নানা পেশার মানুষ। বাঙালি ছাড়াও দেশে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। তাদের আছে নিজস্ব জীবনযাপন পদ্ধতি। সব ধরনের মানুষ এ দেশে মিলেমিশে থাকে।

অর্থনৈতিক অবস্থা : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। অর্থাৎ সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে পরিচিত হওয়া থেকে এখনও আমরা অনেক পিছিয়ে। তবে আমাদের অর্থনীতি খুবই দ্রবত বিকাশ লাভ করেছে। এ দেশ মূলত কৃষিনির্ভর হলেও বিভিন্ন শিল্পখাত থেকে আমরা অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি। তাছাড়া আমরা প্রশিৰিত জনগোষ্ঠীর সাহায্যে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করি।

প্রাকৃতিক সম্পদ : বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের প্রধান সম্পদ। এছাড়াও রয়েছে কয়লা, চুনাপাথর, খনিজ তেল, আকরিক, চীনামাটি প্রভৃতি। এসব খনিজ সম্পদ উত্তোলনের মাধ্যমে নাগরিক জীবনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কমিটি দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

উপসংহার : বাংলাদেশ আমাদের গর্ব ও অহংকার। অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এ দেশকে স্বাধীন করেছি। দেশকে আমরা মায়ের মতো ভালোবাসি। এ দেশে রয়েছে মনোরম প্রকৃতি। পাহাড়, নদী, গাছপালা, দৰিণে বঙ্গোপসাগর দেশের সৌন্দর্যকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। তাই দেশের সৌন্দর্যে সকলেই মুগ্ধ হয়।

৩ বাংলা নববর্ষ

সূচনা : বাংলা নববর্ষ বাঙালির জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরবত্ব বহন করে। গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যে নববর্ষ নিয়ে আসে নতুন সুর, নতুন উদ্দীপনা। পুরোনো দিনের গরানি জরাকে মুছে দিয়ে একরাশ হাসি, আনন্দ আর গান দিয়ে ভুলিয়ে দিয়ে যায় নববর্ষ। প্রাচীনকাল থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এটি বাঙালির আনন্দময় উৎসব হিসেবে সুপরিচিত। বাংলা নববর্ষ তাই বাঙালির জাতীয় উৎসব।

বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের ইতিহাস : বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন প্রচলনের ইতিহাস রহস্যে ঘেরা। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন, বাংলার সুলতান হোসেন শাহ বাংলা সনের প্রবর্তক। কারো কারো মতে, দিলিৰর সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রচলন করেন। তাঁর নির্দেশে আমির ফতেউলৰাহ সিরাজি পূর্বে প্রচলিত হিজরি ও চান্দ্র বছরের সমন্বয়ে সৌরবছরের প্রচলন করেন। তবে সুলতান হোসেন শাহের সময়ে (৯০৩ হিজরি) বাংলা সনের প্রচলন হলেও সম্রাট আকবরের সময় (৯৬৩ হিজরি) থেকেই এটি সর্বভারতীয় রূপ লাভ করে। তখন থেকেই এটি বাঙালি সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাংলা সন আপামর বাঙালি জাতির একান্ত নিজস্ব অব্দ।

নববর্ষের উৎসব : বাঙালিরা প্রাচীনকাল থেকেই নববর্ষ উদ্‌যাপন করে আসছে। তখন বাংলার গ্রামীণ কৃষক সমাজই ছিল এই উৎসবের মূল। যে সময় বছর শুরু হতো অগ্রহায়ণ মাস থেকে। এটি ছিল ফসল কাটার সময়। সরকারি রাজস্ব ও ঋণ আদায়ের এটিই ছিল যথার্থ সময়। পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের প্রচলন হলে বৈশাখ মাস থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয়। আর বাঙালিরা পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। বাংলাদেশে নববর্ষ উদ্‌যাপনে এসেছে নতুন মাত্রা। বর্তমানে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নববর্ষ পালন করা হয়।

পহেলা বৈশাখ : বিগত দিনের সমস্ত গ্লানি মুছে দিয়ে, পাওয়া না পাওয়ার সব হিসাব চুকিয়ে প্রতিবছর আসে পহেলা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। মহাধুমধামে শুরু হয় বর্ষবরণ। সবাই গেয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের এই গান :

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ,
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা– দূর হয়ে যাক।

বাংলা নববর্ষের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে পহেলা বৈশাখে অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলা। এটি একটি সর্বজনীন উৎসব। জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মহামিলনৰেত্র এই মেলা। এ মেলায় আবহমান গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটি পরিচিতি ফুটে ওঠে। বাউল, মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগানে মেলার আকাশ–বাতাস মুখরিত হয়। যাত্রা, নাটক, পুতুল নাচ, সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদি মেলায় বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। মেলায় পাওয়া যায় মাটির হাঁড়ি, বাসনকোসন, পুতুল; বেত ও বাঁশের তৈরি গৃহস্থালির সামগ্রী, তালপাখা, কুটিরশিল্পজাত বিভিন্ন সামগ্রী, শিশু–কিশোরদের খেলনা, নারীদের সাজ–সজ্জা ইত্যাদি। এছাড়া চিড়া, মুড়ি, খৈ, বাতাসাসহ নানা রকমের মিষ্টির বৈচিত্র্যময় সমারোহ থাকে বৈশাখি মেলায়। বৈশাখি মেলা ছাড়াও বাংলা নববর্ষের আরেকটি আকর্ষণ হালখাতা। এদিন গ্রামে–গঞ্জে–শহরে ব্যবসায়ীরা তাদের পুরোনো হিসাব–নিকাশ শেষ করে নতুন খাতা খোলেন। এ উপলৰে তাঁরা নতুন–পুরোনো খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি খাওয়ান। প্রাচীনকাল থেকে এখনো এ অনুষ্ঠানটি বেশ জাঁকজমকভাবে পালিত হয়ে আসছে।

নববর্ষের প্রভাব : বাংলা নববর্ষ বাঙালির জাতীয় জীবনে গুরবত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এদিন দেশের সর্বত্র সরকারি ছুটি থাকে। পারিবারিকভাবে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়। বন্ধু–বান্ধব, আত্মীয়–স্বজনকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। সব কিছুতে আনন্দের ছোঁয়া লাগে। আধুনিক রীতি অনুযায়ী ছোট–বড় সবাই নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড বিনিময় করে। অতীতের লাভ–ৰতি ভুলে গিয়ে এদিন সবাই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার স্বপ্ন বোনে। নববর্ষ আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগায়।

নববর্ষের তাৎপর্য : বাঙালির নববর্ষের উৎসব নির্মল আনন্দের উৎসধারা। ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে এটি আজ আমাদের জাতীয় উৎসব। নববর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আমরা আমাদের জীবনবাদী ও কল্যাণধর্মী রূপটিই খুঁজে পাই। আমাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রত্যৰ করি। আমাদের নববর্ষ উদ্‌যাপনে আনন্দের বিস্তার আছে, কিন্তু কখনো তা পরিমিতবোধকে ছাড়িয়ে যায় না। বাংলা নববর্ষ তাই বাঙালির সারা বছরের আনন্দের পসরা–বাহক।

উপসংহার : বাংলা নববর্ষ বাঙালিকে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখায়। পুরোনোকে ভুলে গিয়ে নতুনকে গ্রহণের প্রেরণা দান করে। আমাদের জীবনে নবচেতনার সঞ্চার করে, পরিবর্তনের একটা বার্তা নিয়ে আসে নববর্ষ। আমাদের মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে; জাতীয় জীবনে স্বকীয় চেতনা বিকাশে উদ্বুদ্ধ করে। প্রাচীনকাল থেকে বাঙালি জাতি বাংলা নববর্ষের এই চেতনাকে বুকে লালন করে চলেছে অবিরামভাবে। তাই বাংলা নববর্ষ আমাদের জীবনে এত আনন্দ ও গৌরবের।

❹ বাংলাদেশের কৃষক

সূচনা : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ লোক কৃষক। কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ দেশ ভরে ওঠে ফসলের সমারোহে। আমরা পাই ক্ষুধার আহার। কৃষকের উৎপাদিত ফসল বিদেশে রফতানি করে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। বলতে গেলে, কৃষকই আমাদের জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি; আমাদের জাতির প্রাণ। কবির ভাষায় :

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা।

কৃষকের অতীত ইতিহাস : প্রাচীনকালে এ দেশে জনসংখ্যা ছিল কম, জমি ছিল বেশি। উর্বরা জমিতে প্রচুর ফসল হতো। তখন শতকরা ৮৫ জনই ছিল কৃষক। তাদের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা থাকত মাছে। তাদের জীবন ছিল সুখী ও সমৃদ্ধ। তারপর এলো বর্গীর অত্যাচার, ফিরিঙ্গি–পর্তুগিজ জলদস্যুদের নির্যাতন, ইংরেজদের খাজনা আদায়ের সূর্যাস্ত আইন, শোষণ ও নিপীড়ন। এলো মন্বন্তর, মহামারি। গ্রামবাংলা উজাড় হলো। কৃষক নিঃস্ব হয়ে গেল। সম্পদশালী কৃষক পরিণত হলো ভূমিহীন চাষিতে। দারিদ্র্য তাকে কোণঠাসা করল। কৃষকের জীবন হয়ে উঠল বেদনাদায়ক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় :

স্কন্ধে যত তার চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতৰণ থাকে প্রাণ তার
তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি
... শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্ট–ক্লিষ্টপ্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

এভাবেই এককালের সুখী ও সমৃদ্ধ কৃষকের গৌরবময় জীবন–ইতিহাস অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

বর্তমান অবস্থা : বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু বাঙালি কৃষকের উদ্বাস্তু, অসহায় ও বিষণ্ন জীবনের কোনো রূপান্তর ঘটেনি। বাংলার কৃষক আজও শিৰাহীন, বস্ত্রহীন, চিকিৎসাহীন জীবন–যাপন করছে। দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে, কমেছে কৃষি জমির পরিমাণ। জমির উর্বরতাও গেছে কমে। ফলে বাড়তি মানুষের খাদ্য জোগানোর শক্তি হারিয়েছে এ দেশের কৃষক। পৃথিবীজুড়ে চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত দেশ কৃষকের শক্তি বৃদ্ধি করছে। কিন্তু এ দেশে এখনো মান্ধাতার আমলের চাষাবাদ ব্যবস্থা বহাল আছে। বাংলার কৃষকও ভোঁতা লাঙল আর কলজ্কালসার দুটো বলদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ– কোনো কিছুই মোকাবেলা করার কৌশল ও সামর্থ্য কৃষকের নেই। তবে ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগের গুরুত্ব বাড়ছে। সম্প্রতি ব্যাংক, সমবায় সমিতি বা মহাজনের ঋণের টাকায় আর উচ্চ ফলনশীল বীজের সাহায্যে কৃষিতে ফলন বেড়েছে। কিন্তু বেতের ফসল কৃষকের ঘরে ওঠার আগেই ব্যাংক, সমবায় প্রতিষ্ঠান কিংবা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করতে হয়। তাই কৃষকের সুখ–স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অবলম্বন হলেও কৃষকের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন হয় না। এখনো তারা নানা রোগ–শোক, অশিৰা–কুশিৰা, দারিদ্র্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

কৃষকের উন্নয়ন : বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। দেশীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদানও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাই দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কৃষকের উন্নয়ন সাধন করা দরকার। বাংলার কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আজ সবচেয়ে বেশি দরকার চাষাবাদে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন। নিজের জমিতে কৃষক যেন স্বল্পমূল্যে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পায় তার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে কৃষককে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করতে হবে। আবার কৃষক তার ফসলের যেন ন্যায্য

দাম পায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই অশিক্ষিত। তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার জন্য তাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সারা বছর কৃষকের কাজ থাকে না। তাই তার অবসর সময়টুকু অর্থপূর্ণ করার জন্য কুটিরশিল্প সম্পর্কে তাকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে কৃষকের চিত্তবিনোদন ও রোগ-ব্যাধির চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

উপসংহার : বাংলার কৃষকরাই বাঙালি জাতির মেরুদণ্ড। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি তারা। তবুও কৃষকরা বহুকাল ধরে অবহেলিত। বিশেষ করে তাদের সামাজিক মর্যাদা এখনো নিম্নমানের। এ বিষয়ে আমাদের সকলের সচেতন দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কৃষক ও কৃষিকে গুরুত্ব দিলেই আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল থাকবে। দেশের দারিদ্র্য দূর হবে। বাংলার ঘরে ঘরে ফুটে উঠবে স্বাচ্ছন্দ্যের ছবি। বলা যায়, কৃষকের আত্মার ভেতরই লুকিয়ে আছে আমাদের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের বীজ।

৫ বাংলাদেশের উৎসব

ভূমিকা : বাংলাদেশ উৎসবের দেশ। বাঙালি জাতি উৎসবমুখর জাতি হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। এই বাংলার বুকে নানা ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষের বসবাস রয়েছে। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই মিলেমিশে বাস করে এই বাংলায়। নানা ধর্মের মানুষের নানা উৎসবে বাংলাদেশ বর্ণিল হয়ে ওঠে। একের উৎসবে অন্যরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। বাঙালির এ উৎসব উদ্‌যাপন যেন রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়– 'আমার আনন্দ সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভ সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই, তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি– এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।'

বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎসব : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরনের উৎসবের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এসব উৎসবের কোনোটা ধর্মীয়, কোনোটা সামাজিক এবং কোনোটা পারিবারিক। বাংলাদেশে প্রচলিত নানা ধরনের এসব উৎসব সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো–

(ক) ধর্মীয় উৎসব : বাংলাদেশে নানা ধর্মের মানুষ বসবাস করে। প্রত্যেকের উৎসবও আলাদা আলাদা। ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে মুসলমানদের দুটি ঈদ, হিন্দুদের দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা, জন্মাষ্টমী, খ্রিস্টানদের ইস্টার সানডে, বড়দিন, বৌদ্ধদের বুদ্ধ পূর্ণিমা ইত্যাদি উলেরখযোগ্য।

(১) ঈদ : মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর। রমজান মাসে পুরো এক মাস রোযা রাখার পর আসে ঈদুল ফিতরের আনন্দঘন মুহূর্ত। এ দিন সবাই নতুন পোশাক পরিধান করে, ঈদের জামাতে যোগ দেয়, মিষ্টিমুখ করে এবং আরও নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঈদের আনন্দকে সবার মাঝে ভাগ করে নেয়। মুসলমানদের আরেকটি বৃহৎ উৎসব হলো ঈদুল আজহা। একে কোরবানির ঈদও বলা হয়। এটি হচ্ছে আত্মত্যাগের ঈদ। এ ঈদেও অত্যন্ত আনন্দের সাথেও জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হয়।

(২) পূজা : হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। শরৎকালে এ পূজা হয় বলে একে শারদীয় দুর্গোৎসবও বলা হয়। আশ্বিন মাসে যে চাঁদ ওঠে তার সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দশমীর দিন মাকে বিসর্জন দেওয়া হয় পুকুরে বা নদীতে। এ পূজা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। এছাড়া হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝে সরস্বতী পূজা, কালী পূজা, লক্ষ্মীপূজা পৃভৃতিতে উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

(৩) বড়দিন : বড়দিন হলো যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন। এ দিনকে ঘিরে খ্রিস্টান সম্প্রদায় বেশ আনন্দ করে থাকে। গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করার পর সকলের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে বড়দিনের উৎসব উদ্‌যাপনের সূচনা হয়।

(৪) বৌদ্ধ পূর্ণিমা : বৌদ্ধ পূর্ণিমা হলো গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন। এদিন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা উৎসব পালন করে থাকে। বৌদ্ধবিহারে এদিন অনুষ্ঠিত হয় প্রভাবফেরি, ফুলপূজা, প্রদীপপূজা প্রভৃতি। এছাড়া বিহারগুলোতে এদিন পঞ্চশীল ও অষ্টশীল প্রদান করা হয়।

(খ) সামাজিক উৎসব : সামাজিক উৎসব পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো আনন্দ উপভোগ করা। বাংলাদেশের সামাজিক উৎসবের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় উৎসবও রয়েছে।

(১) স্বাধীনতা দিবস : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরুর পথ উন্মুক্ত হয়। আমরা প্রতিবছর আনন্দের সাথে দিনটি পালন করে থাকি।

(২) বিজয় দিবস : আমরা বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে থাকি প্রতিবছরের ১৬ই ডিসেম্বরে। এ দিনই আমরা স্বাধীন দেশ ও জাতি হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছিলাম। তাই বিজয় দিবস আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যবহ।

(৩) নববর্ষ : নববর্ষ বাঙালির অন্যতম সামাজিক উৎসব। প্রতিবছর পয়লা বৈশাখের দিন আমরা নববর্ষ উদ্‌যাপন করি। নববর্ষকে ঘিরে সারা দিনব্যাপী আয়োজনের মধ্যে রয়েছে– মঙ্গল শোভাযাত্রা, বৈশাখী মেলা, হালখাতা ইত্যাদি। সর্বস্তরের জনগণ এ উৎসব অত্যন্ত আনন্দের সাথে উদ্‌যাপন করে থাকে। এটি এখন সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে।

এছাড়াও আরও যেসব সামাজিক উৎসব রয়েছে সেগুলো হলো–

(১) পহেলা ফাল্গুন : বাঙালি উৎসবমুখর জাতি। উৎসবের তালিকায় পহেলা ফাল্গুন এমনি একটি উৎসব। বসন্তকে বরণ করে নিতে এ উৎসব পালন করা হয়। বাসন্তী রঙের নিজেকে রাঙিয়ে তোলে সবাই পহেলা ফাল্গুনের দিনে।

(২) পৌষ-পার্বণ : এটি মূলত পিঠা উৎসব। এ উৎসবের মূল আকর্ষণ হলো নানা ধরনের পিঠা বানিয়ে খাওয়া। এছাড়া পুরান ঢাকার অধিবাসীরা এদিনে ঐতিহ্যবাহী ঘুড়ি উৎসবও উদ্‌যাপন করে থাকে।

(৩) বিভিন্ন ধরনের মেলা : আমাদের দেশে নানা উৎসবকে ঘিরে বিভিন্ন মেলা সকল মানুষের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে। এর মধ্যে উলেরখযোগ্য হলো– বৈশাখি মেলা, একুশের বইমেলা, বাণিজ্য মেলা ইত্যাদি।

(৪) ক্রিকেট খেলা : বর্তমান সময়ে ক্রিকেট খেলাও একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে। সকলে মিলে হইচই করে স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলা দেখার আনন্দ উপভোগ করে। ওয়ানডে ম্যাচ, টি-টোয়েন্টি এরূ প বিভিন্ন খেলা মানুষকে আনন্দ দিতেই আয়োজিত হয়ে থাকে। তাই এগুলোও এখন সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

(৫) বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্মরণোৎসব : বাংলাদেশে বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্মরণে নানা উৎসব পালন করা হয়। এসব উৎসবের মধ্যে রয়েছে– নজরুল জয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মোৎসব এবং অন্য মহান নেতাদের স্মরণেও অনুষ্ঠান করা হয়।

(৬) পারিবারিক উৎসব : পারিবারিক উৎসবে সাধারণত পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং ঘনিষ্ঠজনরাই উপস্থিত থাকে। পারিবারিক উৎসবের মধ্যে রয়েছে– বিয়ে, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, খাৎনা, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ইত্যাদি।

উৎসবের তাৎপর্য : আমাদের দেশে যেসব উৎসব উদ্‌যাপিত হয় তার সবগুলোই সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্যের কথা বলে। বিভিন্ন উৎসবে নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণ বাঙালির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকেই উপস্থাপন করে। মানুষে মানুষে আত্মিক বন্ধন স্থাপনে ভূমিকা রাখে এই উৎসব। উৎসবের মাঝেই ছড়িয়ে থাকে বাঙালির প্রাণের আকুতি। একটি উৎসবকে কেন্দ্র করেই গোটা জাতি একটি

পরিবারে রূ প নেয়। আনন্দমুখর পরিবেশে উৎসব উদ্‌যাপনে মানুষের মনের মলিনতা দূর হয়ে যায়।

উপসংহার : আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি দূর করতে উৎসব জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে। মানুষের মাঝে নির্মল আনন্দের সঞ্চার করে উৎসব। তাই সকল ব্যবধান ভুলে গিয়ে উৎসবের মূল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে হবে এবং বিশুদ্ধ আনন্দকে হৃদয় দিয়ে উপভোগ করতে হবে। উৎসবের শালীনতা ও পবিত্রতা বজায় রেখে প্রকৃত অর্থে উৎসব পালনের জন্য সকলের সচেতন থাকা আবশ্যক। তবেই উৎসবের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব হবে।

৬ বাংলাদেশের নদ-নদী

সূচনা : বাংলাদেশ একটি নদীবিধৌত বদ্বীপ। এ দেশের বুক জুড়ে জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে শত শত নদী। এই নদীগুলো বাংলাদেশের প্রাণ। বাংলার মানুষের জীবনযাপনের সাথে এগুলো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এসব নদ-নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এ দেশের মানুষে জীবনব্যবস্থা। ফলে বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে।

প্রধান নদ-নদী : বাংলাদেশে শাখা-প্রশাখাসহ নদ-নদীর সংখ্যা প্রায় ২৩০টি। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী।

পদ্মা : পদ্মা বাংলাদেশের প্রধান নদী। এটি ভারতের হিমালয় পাহাড়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। উৎপত্তির পর ভারতের ওপর দিয়ে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে রাজশাহী অঞ্চল দিয়ে পদ্মা নাম ধারণ করে এটি আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে। সেখান থেকে গোয়ালন্দের কাছে যমুনা নদী এবং চাঁদপুরে মেঘনার সাথে মিশে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

মেঘনা : মেঘনা বাংলাদেশের আরেকটি প্রধান নদী। ভারতের বরাক নদটি সুরমা ও কুশিয়ারা নামের দুটি শাখায় ভাগ হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। চাঁদপুরের কাছে এসে এ দুটি নদী মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। পরবর্তীতে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে নদীটি পতিত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী।

যমুনা : তিব্বতের সানপু নদীটি আসামের মধ্য দিয়ে যমুনা নাম নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ধরলা, তিস্তা ও করতোয়া যমুনার প্রধান উপনদী। বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী যমুনার প্রধান শাখানদী।

ব্রহ্মপুত্র : হিমালয় পর্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি। নদীটি তিব্বত ও আসামের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রামের কাছে এসে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর জামালপুরের কাছে দুভাগে বিভক্ত হয়ে প্রধান স্রোতটি জামালপুরের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে যমুনা নামে এবং অপরটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে ময়মনসিংহের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনার সাথে মিশেছে।

অন্যান্য নদী : এ নদীগুলো ছাড়াও আমাদের দেশে রয়েছে আরও অনেক নামকরা নদনদী। সেগুলোর মধ্যে কর্ণফুলী, কুশিয়ারা, বুড়িগঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলব্যা, মধুমতি, সুরমা, তিস্তা ইত্যাদি উলেরখযোগ্য। এসব নদীর কোনোটি প্রধান নদীর শাখা নদী আবার কোনোটি উপনদী।

নদীর সৌন্দর্য : বাংলাদেশের নদীগুলোর সৌন্দর্য তুলনাহীন। নদীর বুকের সোনালি স্রোত, পাল তুলে ভেসে চলা নৌকা, নদীর পাড়ের ছবির মতো ঘরবাড়ি ও গাছপালা সবকিছু মিলে অসাধারণ দৃশ্য সৃষ্টি করে। নদীর দুই ধারের কাশবন, বাড়িঘর সবকিছু ছবির মতো লাগে। বর্ষায় পানিতে ভরে গেলে নদ-নদীগুলো আরও প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নদ-নদীর প্রভাব : বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকেই নদীকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা প্রচলিত। নদীর সঙ্গে আমাদের জীবন গভীরভাবে জড়িত। আমাদের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে নদীপথ। নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এ দেশের অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র। আমাদের কৃষিৰেত্র অনেকাংশেই নদীর ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীরা নদীকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য সাহিত্যকর্ম।

নদ-নদীর উপকারিতা : বাংলাদেশকে সবুজে-শ্যামলে ভরে তোলার পেছনে নদ-নদীর ভূমিকা অপরিসীম। নদীর পানিতে বয়ে আসা পলি প্রাকৃতিকভাবে আমাদের মাটিকে উর্বর করেছে। আমাদের কৃষির অগ্রগতিতে তাই নদীর ভূমিকা বেশ গুরবত্বপূর্ণ। কৃষিৰেত্র ছাড়াও নদীগুলো মিঠা পানির মাছের অন্যতম উৎস। নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে অসংখ্য মানুষ। দেশীয় প্রয়োজন মিটিয়েও মাছ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হয়। এ ছাড়া পরিবহন-সংক্রান্ত কাজেও নদীকে ব্যবহার করা হয়। একশ্রেণির মানুষ এ কাজ করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। সর্বোপরি নদীকেন্দ্রিক বাংলাদেশে আমরা নদীর কাছ থেকে বিভিন্ন উপকার ভোগ করে থাকি।

নদ-নদীর অপকারিতা : নদীর কিছু অপকারিতাও আমাদের চোখে পড়ে। বর্ষাকালে নদীগুলো ফুলে-ফেঁপে ওঠে। তখন বন্যা দেখা দেয়। এছাড়া নদীর প্রবল স্রোতে ভাঙন শুরব হয়। কখনো কখনো কোনো কোনো গ্রাম ভাঙতে ভাঙতে নদীর মাঝে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। এর ফলে ৰতিগ্রস্ত হয় মানুষের ঘরবাড়ি, জমিজমা, গাছপালা, গবাদিপশু ও গৃহসামগ্রী। অনেক সময় নদীর প্রবল স্রোতে মানুষের জীবনহানিও ঘটে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় দশ লৰ মানুষ নদীভাঙনের শিকার হয়।

উপসংহার : বাংলাদেশ নদীর দেশ। এ দেশের মানুষের জীবন জীবিকা সর্বৰেত্রেই নদীর রয়েছে প্রত্যৰ ও পরোৰ প্রভাব। তাই এদের বাঁচিয়ে রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব। নদ-নদীর অবদানেই আমাদের এ বাংলাদেশ সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা হয়েছে।

৭ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

[রা. বো. ১৫]

ভূমিকা :

"সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।"

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। মহান এই সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি প্রমাণ করেছে যে তারা কোনো অন্যায়ের সামনেই মাথা নত করে না। সুদীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেমেছিল। আর এর ফলাফল হিসেবে আমরা পেয়েছি স্বাধীন স্বদেশ ভূমি।

পটভূমি : পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়। ১৯৫২ সালে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্যে গুলি চালানো হয়। শহিদ হন সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতসহ আরও অনেকে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি এবং যুক্তফ্রন্টের অভূর্তপূব বিজয় লাভ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ৰমতার ভিতকে নড়বড়ে করে দেয়। ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে আইয়ুব খান এক প্রহসনের নির্বাচন দিয়ে এ দেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে নেয়। তখন

থেকেই স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপিত হয়। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে আটক করা হয়। কিন্তু গণআন্দোলনের মুখে তাঁকে আটকে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে টালবাহানা শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে জাতিকে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। সারা বাংলায় শুরু হয় তুমুল আন্দোলন। আপস আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে গোপনে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র এনে শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চের গভীর রাতে পাকবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস, ইপিআর ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চলে। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তাউদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একটি প্রবাসী সরকার মুজিবনগর সরকার নামে গঠিত হয়। এই সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় চূড়ান্ত মুক্তিসংগ্রাম। দেশের মানুষ দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। বাঙালি কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, নারী, পুলিশ, আনসার, ইপিআর, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সরকারি কর্মচারী, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী।

মুক্তিসংগ্রাম : ২৫শে মার্চ গভীরাতে বাঙালির অবিসংবাদিতা নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তান সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। আহ্বান করেন বাঙালি সন্তানদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে। পাকবাহিনী তখন আরও মরিয়া হয়ে ওঠে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। অসংখ্য বাঙালি দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। পাক-বাহিনীর মুখোমুখি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিবাহিনী। যতই দিন যেতে তাকে ততই সুসংগঠিত হয় তারা। মুক্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধের রীতি অবলম্বন করে শত্রুদের বিপর্যস্ত করে। বিশাল শত্রুবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ নিয়ে, মুক্তিবাহিনীর মোকাবিলায় সক্ষম হচ্ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ দেশীয় একটি গোষ্ঠী স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের নানাভাবে সহযোগিতা করে। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বাংলার কৃতী সন্তানদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানিদের এ দোসররা রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস্ নামে বিভিন্ন ঘাতক বাহিনী গড়ে তোলে। তারা এ দেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী ও সাংবাদিকসহ বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে মুক্তিসংগ্রাম চরমরূপ ধারণ করে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ ব্যাপকভাবে হতে থাকে। আর শত্রুবাহিনীও সর্বাত্মক ধ্বংসলীলা চালাতে থাকে।

শত্রুর আত্মসমর্পণ : দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানিদের অবস্থান দুর্বল হয়ে আসে। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারত সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে হানাদার পাকবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকায় রমনা রেসকোর্স ময়দানে– বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : মুক্তিযুদ্ধের ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বীকৃতি। পেয়েছি আমাদের ন্যায্য অধিকার। তবে এত সব অর্জনের মাঝে হারানোর বেদনাও আমাদের রয়েছে। স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন ত্রিশ লক্ষ দেশপ্রেমিক জনতা। নির্যাতনের শিকার হয়েছে অসংখ্য মা-বোন। অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন চিরতরে। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের একই সাথে গর্বের ও বেদনার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগ থেকে যে চেতনা লাভ করেছে তা জাতির সকল আন্দোলন সংগ্রামে প্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। গণতান্ত্রিক অধিকার চেতনা সমাজের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করেছে ব্যাপকভাবে।

উপসংহার : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসের এক সোনালি অধ্যায়। এক নদী রক্তের বিনিময়ে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি সেদিন ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার সূর্য। এর চেতনাকে নিজেদের মাঝে ধারণ করার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই আমরা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে পারব।

৮ একুশে ফেব্রুয়ারি

[ঢা. বো. ১৪, রা. বো. ১৪, কু. বো. ১৩, চ. বো. ১২]

সূচনা : "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?"

২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের এ দিনটিতে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আন্দোলন করেছিল হাজার হাজার বাঙালি। ভাষার জন্য জীবন দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিকসহ নাম না জানা অনেকে। তাই এই দিনটি আমাদের জন্য একই সাথে গৌরবের ও বেদনার।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রেক্ষাপট : একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৪৮ সালেই। তৎকালীন সময়ে ২১ মার্চ পাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। তখনই বাংলার ছাত্র-জনতা এই ঘোষণার প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। পরবর্তী সময়ে ১৯৫০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান একই ঘোষণা দিলে ছাত্রসমাজ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এরপর আবারও ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এর প্রতিবাদে বাংলার ছাত্র-জনতা আন্দোলনের ডাক দেয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এ আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। দিনটিতে সর্বস্তরের বাঙালি সরকারি নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। পুলিশ নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালালে নিহত হয় অনেকে। এই হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে গোটা দেশের ছাত্র-জনতা। আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়। এর ফলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

শহিদ মিনার : প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ হওয়া আবুল বরকত যে স্থানে শহিদ হয়েছিলেন সেখানে ২৩শে ফেব্রুয়ারি একটি শহিদ মিনার নির্মিত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা রাতারাতি ইট দিয়ে স্মৃতিফলকটি গড়ে তোলেন। ২৬ তারিখ পুলিশ সেটি ভেঙে দেয়। অবশেষে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের কাজ শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে শহিদ আবুল বরকতের মা এটি উদ্বোধন করেন।

একুশের চেতনা : বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালি লড়াই করে তার অধিকার আদায় করেছে। তাই এ দিনটি আমাদের মাঝে অধিকার-চেতনা নিয়ে আসে। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সূচনাও ঘটে ভাষা আন্দোলন থেকেই। তাই এই দিনে আমরা সুন্দর দেশ গড়ার প্রেরণা পাই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার সাহস পাই।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি : একুশে ফেব্রুয়ারি আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। এ দিনটি পৃথিবীর সব ভাষার মানুষ মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। বাংলাদেশে ভাষার জন্য যে জীবনদানের ঘটনা ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটেছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বাঙালির এই আত্মত্যাগের স্বীকৃতি মিলেছে আন্তর্জাতিকভাবে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই স্বীকৃতির ফলে বিশ্বের দরবারে বাঙালি লড়াকু জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বিশ্ববাসী জানতে পারে বাঙালিরা অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনে জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

একুশে ফেব্রুয়ারি পালন : প্রতিবছর নানা আয়োজনে এ দিনটি সরকারি ও বেসরকারিভাবে পালন করা হয়। সারা দেশের শহিদ মিনারগুলোতে ভোরবেলা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানো হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এদিন খালি পায়ে হেঁটে শহিদ মিনারে গিয়ে ফুল দেয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে বিশেষ ক্রোড়পত্র। টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা।

উপসংহার : একুশ আমাদের অহংকার। এ দিনটি মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি আমাদের ভালোবাসা বাড়িয়ে দেয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে এই দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই দিনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতি বিভিন্ন দুঃসময়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। দেশের জন্য কাজ করেছিল। তাদের মতোই একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা দেশের জন্য কাজ করব।

৯ স্বাধীনতা দিবস

সূচনা : বাঙালি জাতির জীবনে স্বাধীনতা শব্দটি বহু প্রতীক্ষিত একটি স্বপ্নের নাম। দীর্ঘ সময় ধরে আমরা ছিলাম পরাধীন একটি জাতি। ১৯৭১ সালে ২৬শে মার্চ তারিখে সেই শৃঙ্খল থেকে চিরতরে মুক্তির লড়াই শুরু হয়। শত্রুর হাত থেকে স্বদেশ ভূমি তখনও মুক্ত না হলেও মনে মনে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবতে শুরু করি এদিন থেকেই। তাই ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।

ঐতিহাসিক পটভূমি : স্বাধীনতা দিবসের গৌরব লাভের পেছনে রয়েছে বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর হতে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগ থেকে পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের অধীন। তখন এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। এ দীর্ঘ সময় ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক- সকল দিক দিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদেরকে শোষণ করে আসছিল। এর প্রতিবাদে বাঙালিরা রুখে দাঁড়ায়। ১৯৪৭-৭১ পর্যন্ত পুরোটা সময়ই বাঙালি তার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে, ঝরেছে অনেক রক্ত।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। এরপর ২৫শে মার্চ কালো রাতে বাঙালি জাতির জীবনে নেমে আসে এক ভয়াবহ নৃশংসতা। পাক হানাদারদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয় নিরীহ বাঙালি। তারা এই রাতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার নির্দেশ দেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই সর্বস্তরের বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতাসহ সর্বস্তরের মানুষ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অনেক রক্তক্ষয়ের পর অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি।

স্বাধীনতা দিবসের চেতনা : আমরা সবাই স্বাধীন একটি দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা দিবসে এ বিষয়টি আমরা আরও ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারি। এ দেশের জন্য শহিদদের অবদানের মূল্য বুঝতে পারি। দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। নিজেদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হই। এদিন সমগ্র বাঙালি জাতি বহুকালের লালিত মুক্তি ও সংগ্রামের অঙ্গীকারে ভাস্বর। এই দিনে আমরা আত্মপরিচয়ের গৌরবে উজ্জ্বল, ত্যাগে ও বেদনায় মহিয়ান হওয়ার প্রেরণা লাভ করি। সর্বোপরি স্বাধীনতা দিবসের চেতনা আমাদের দারিদ্র্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে।

উদ্‌যাপন : প্রতিবছর নানা আয়োজনে দেশের মানুষ এই দিনটি উদযাপন করে। সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে। স্কুলগুলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সর্বস্তরের মানুষ জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানায়।

উপসংহার : ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি জাতির জীবনে স্বাধীনতা দিবস এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। মুক্তির যে বার্তা আমরা ২৬শে মার্চ তারিখে পেয়েছিলাম তা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছে অনেক তাজা প্রাণ আর রক্তের বিনিময়ে। তাই এই অর্জনকে আমরা বৃথা যেতে দেব না। দেশকে ভালোবাসব, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সদা সচেষ্ট থাকব।

১০ বিজয় দিবস

সূচনা : কাল যেখানে পরাজয়ের কালো সন্ধ্যা হয়,
আজ সেখানে নতুন করে রৌদ্র লেখে জয়।

বাঙালির জাতীয় জীবনে ১৬ই ডিসেম্বর এক মহিমান্বিত দিন। এ দিনটি আমাদের বিজয় দিবস। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম শেষে এই দিনেই আমরা চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হই।

পটভূমি : ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের দীর্ঘ ২০০ বছরের শাসনের অবসান ঘটলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তান আবার দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নতুন করে পরাধীন হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে। তাদের অত্যাচারে আমাদের মৌলিক অধিকারসমূহ ভূলুণ্ঠিত হয়। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের ওপরও তারা আঘাত হানে। এমনকি আমাদের মুখের ভাষা পর্যন্ত কেড়ে নিতে চায়। বাংলার সংগ্রামী জনতা তাদের সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয় লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু সমগ্র দেশবাসীকে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম : বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘোষণার পর আপস আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও রসদ এনে শক্তি বৃদ্ধি করে। এরপর ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। ঐ রাতেই গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

গ্রেফতারের আগে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার ঘোষণায় সমগ্র বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে সশস্ত্র লড়াইয়ে। এ দেশের অগণিত ছাত্র–জনতা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার ও সামরিক, বেসামরিক লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। তারা গেরিলা ও মুখোমুখি যুদ্ধ করে শত্রুসেনাকে পর্যুদস্ত করে তোলে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে চলতে থাকে স্বাধীনতাযুদ্ধ।

কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ : দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে বাঙালি জাতি লাভ করে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আসে বাঙালি জাতির জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সেদিন বিকেল ৫টা ১ মিনিট ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। ঐতিহাসিক এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে পালিত হয় মহান বিজয় দিবস।

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন : প্রতিবছর ১৬ ডিসেম্বর চরম উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সারা দেশে পালিত হয় মহান বিজয় দিবস। এদিন সারা দেশে সরকারি ভবনসমূহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। সারা দেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পত্রপত্রিকাগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। টিভি ও রেডিও চ্যানেলগুলো প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। এভাবে সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে বিজয় দিবস হয়ে ওঠে উৎসবের দিন।

বিজয় দিবসের চেতনা : বিজয় দিবস আমাদের দেশপ্রেমকে শাণিত করে। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে লড়াই করার প্রেরণা পাই। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হই। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে শিখি এই দিনে।

উপসংহার : লাখো মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের সেই গৌরবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে। আজ আমরা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার আনন্দ আমাদেরকে দেশপ্রেমী করে। মহান বিজয় দিবসে বাঙালি উক্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমুজ্জ্বল হয়।

১১ শহিদ বুদ্ধিজীবী

অথবা, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

সূচনা : শিক্ষাকে যদি জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়, তবে বুদ্ধিজীবীরা জাতির মস্তিষ্ক। তাঁদের মেধা, শ্রম ও দেশপ্রেম জাতিকে আলোর পথ দেখায়, জাতি গঠনে সহায়তা করে। আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মূলে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ অবদান রয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের নানা পরামর্শ, তত্ত্ব, উপাত্ত, লেখনী মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।

পাকিস্তানি হানাদারদের তাণ্ডব : স্বাধীনতাযুদ্ধে আমরা যেমন হারিয়েছি অসংখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধাকে, তেমনি হারিয়েছি শত শত দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীকে। দেশদ্রোহী রাজাকার, আল বদর ও আলশামসদের সহায়তায় পাক–হানাদার বাহিনী অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের বরেণ্য মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ১৯৭১–এর ২৫শে মার্চের কালরাত থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের একেবারে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তারা এই হত্যাকাণ্ড চালায়।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের পটভূমি : পাকিস্তানি বাহিনী যখন বুঝতে পারে তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত তখন তারা বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার এক ঘৃণ্য নীলনকশা প্রণয়ন করে। নীলনকশা অনুযায়ী ৭ থেকে ১৪ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত হত্যাযজ্ঞ চালায় তারা। বেছে বেছে শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পীদের হত্যা করে। এ ঘটনার স্মরণে প্রতিবছরই ১৪ই ডিসেম্বর আমরা 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করে আসছি।

বুদ্ধিজীবী হত্যার পর্যায় : ১৯৭১–এর বুদ্ধিজীবী হত্যাকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব ১৯৭১–এর ২৫শে মার্চ থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্ব ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। প্রথম পর্বে যাঁদের হত্যা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্বী শিক্ষক এম মুনিরুজ্জামান, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার, সুরসাধক আলতাফ মাহমুদ, ভাষাসৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা, সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডা. যোগেশচন্দ্র ঘোষ, কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ নতুনচন্দ্র সিংহ প্রমুখ। সাংবাদিক মেহেরুন্নেসা, সেলিনা পারভিন, শহীদ সাবের প্রমুখরাও এই রাতে শহিদ হন।

দ্বিতীয় পর্বের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে আলবদর বাহিনী। এ পর্বে যাঁদের হত্যা করা হয় তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ও বিশিষ্ট নাট্যকার অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক রাশীদুল হাসান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহম্মদ প্রমুখ। তাঁরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ছিলেন। সাংবাদিকদের মধ্যে শহীদুল্লা কায়সার, সিরাজুদ্দীন হোসেন, নিজামউদ্দীন আহমদ, আ ন ম গোলাম মোস্তফা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিভিন্ন পেশার বিশিষ্টজনদের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেক বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে।

উপসংহার : বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁরা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। দেশের মানুষের অধিকার আদায়ে তাঁরা নিজেদের অবস্থানে ছিলেন অটল। দেশের জন্য ত্যাগের মহা আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তাঁরা। সেই আদর্শ অনুসারে আমরা নিজেদের যোগ্য মানুষরূপে গড়ে তুলব। তবেই আমাদের পক্ষে তাঁদের ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে।

১২ শহিদ মিনার

ভূমিকা : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কী ভুলিতে পারি
ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায়ে ফেব্রু য়ারি
আমি কী ভুলিতে পারি'

প্রভাতফেরির এ গান গেয়ে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা শহিদ মিনারে যাই। ফুল দিয়ে ভাষাশহিদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। শহিদ মিনার এদিন ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। আমাদের মনে করিয়ে দেয় মায়ের ভাষা আমাদের কাছে কত আপন। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতেই বাংলার ছেলেরা রাজপথে প্রাণ দিয়েছিল। তাদের স্মৃতি রক্ষার্থেই নির্মিত হয়েছে শহিদ মিনার।

শহিদ মিনার সৃষ্টির পটভূমি : ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ডাকা অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন

ঘোষণা করেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এ ঘোষণার প্রতিবাদে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস এবং ১১ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালিত হয়। সেখান থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হবে। এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে শাসকগোষ্ঠী ২১শে ফেব্রুয়ারিতে সকল প্রকার সভা, মিছিল, মিটিং ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ছাত্রজনতা সেই বাধাকে ডিঙিয়ে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে মিছিলটি আসতেই পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত, শফিউরসহ আরও অনেকে। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে শহিদ মিনার।

প্রথম শহিদ মিনার : ২১শে ফেব্রুয়ারির শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছাত্রজনতা একটি শহিদ মিনার তৈরি করে। শহিদ শফিউরের পিতা ২৪শে ফেব্রুয়ারি এটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু কয়েক দিন পরই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ শহিদ মিনারটি ভেঙে ফেলে। তবে বাঙালির হৃদয় থেকে তারা সে মিনারের স্মৃতি মুছে দিতে পারেনি। কবি আলাউদ্দীন আল আজাদের ভাষায় :

ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক
একটি মিনার গড়েছি আমরা চার–কোটি পরিবার

আজকের শহিদ মিনার : বর্তমান শহিদ মিনারটির নকশা করেন স্থপতি হামিদুর রহমান। পরবর্তীকালে শহিদ মিনারটি আরও সংস্কার করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আমরা যে শহিদ মিনারটি দেখি সেটিই হামিদুর রহমানের চূড়ান্ত নকশার পরিপূর্ণ রূ প। প্রতিবছর মানুষ এ মিনারের সামনেই ভাষাশহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বর্তমানে এ শহিদ মিনারের আদলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

শহিদ মিনারের তাৎপর্য : শহিদ মিনারের মিনার ও তার স্তম্ভগুলো মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার তথা মা ও তাঁর শহিদ সন্তানের প্রতীক। মাঝখানের সবচেয়ে উঁচু স্তম্ভটি মায়ের প্রতীক। চারপাশের ছোট চারটি স্তম্ভ সন্তানের প্রতীক, যারা তাদের বুকের রক্ত ঢেলে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আমাদের জীবনে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শুভ তার সঙ্গে শহিদ মিনারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এটি শুধু একটি মিনার নয়, এটি আমাদের প্রেরণার প্রতীক। শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, মুক্তিযুদ্ধেও শহিদ মিনার আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। আমাদের যুদ্ধ জয়ের অন্যতম প্রেরণা একুশে ফেব্রুয়ারি। আমরা যখনই অন্যায়ের শিকার হই, তখনি শহিদ মিনার প্রতিবাদ করার জন্য আমাদের প্রেরণা জোগায়।

শহিদ মিনার ও আমাদের সংস্কৃতি : আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শহিদ মিনারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দেশে যখনই কোনো অন্যায় সংঘটিত হয়, তখনই শহিদ মিনারে হাজির হয়ে তার প্রতিবাদ করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান হয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে। কোনো জাতীয় বা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর পর তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে রাখা হয়।

উপসংহার : শহিদ মিনার আমাদের প্রেরণার অন্তহীন উৎস। আমরা শহিদ মিনারের দিকে তাকিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ অতীতের কথা ভাবি। আর বর্তমান প্রজন্মের কাছে গর্ব করে সে কথাগুলো বলি। আজ ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে। ভাষার জন্য আমাদের আত্মদানের ইতিহাস ছড়িয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী। শহিদ মিনার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বাঙালির সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষাশহিদদের অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

১৩ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

অথবা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচনা : "যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী, যমুনা বহমান,
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।"

আপন কীর্তিতে বাংলার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনটি চিরকালের জন্য অধিকার করে নিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। আমাদের জাতির জনক।

জন্ম ও শৈশব : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ (তৎকালীন ফরিদপুর) জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আদর করে বাবা তাঁর নাম রাখেন খোকা। শৈশবকাল থেকেই গরিব মানুষদের প্রতি তাঁর ছিল অসামান্য টান। মানুষের দুঃখে–কষ্টে তাদের নানাভাবে সাহায্য করতেন তিনি।

ছাত্রজীবন : সাত বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু ভর্তি হন গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪২ সালে শেখ মুজিব কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অন্যায়–অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শেখ মুজিব সবসময় থাকতেন সামনের কাতারে।

রাজনৈতিক জীবন : ছাত্রজীবন থেকেই বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে যুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁকে বহুবার গ্রেফতার ও কারাবরণ করতে হয়। কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে থাকাকালীন তৎকালীন মুসলিম লীগে যোগ দেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে শেখ মুজিবকে করা হয় দলের যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি জেলে বন্দি অবস্থায় অনশন পালন করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ঘটলে শেখ মুজিব মন্ত্রী হন। ১৯৬৬ সালে তিনি বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ১৯৬৮ সালে জেলে থাকা অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়। ১৯৬৯ সালে প্রবল আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র–জনতার বিশাল জনসভায় তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' অ্যাখ্যা দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বেই আওয়ামী লীগ বিশাল বিজয় অর্জন করে।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ : ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় দশ লাখ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে জাতিকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি দৃঢ়চিত্তে বলেন :

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

স্বাধীনতার ঘোষণা : ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ রাতে পাক হানাদার বাহিনী এ দেশের মানুষের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই বাংলার মানুষ লড়াই করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় দেশবাসীর কাছে ফিরে আসেন। এ পর্যায়ে তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনের সংগ্রাম।

মৃত্যু : মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহিদ হন।

উপসংহার : বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ দেশের মানুষের মুক্তির জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন তিনি। শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, বিশ্বের সকল মানুষের জন্যই তাঁর আদর্শ চিরস্মরণীয়।

১৪ আমাদের গ্রাম

সূচনা : 'আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।'

আমাদের গ্রামের নাম ঘোপাল। গ্রামটি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানায় অবস্থিত। গ্রামের এক পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ফেনী নদী।

সৌন্দর্য : আমাদের গ্রামটি ছবির মতো সুন্দর। আম, কাঁঠাল, বটসহ নানা রকম গাছগাছালিতে গ্রামটি ঘেরা। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। বিভিন্ন মৌসুমে ফোটে নানা রকম ফুল। গ্রামের মেঠো পথ, সোনালি ধানখেত, ছায়া ঢাকা বাঁশঝাড় দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। প্রকৃতি যেন আপন খেয়ালে গ্রামটিকে সাজিয়েছে।

গ্রামের মানুষ : আমাদের গ্রামে প্রায় দেড় হাজার লোকের বাস। এখানে আছে নানা পেশার, নানা ধর্মের মানুষ। গ্রামের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। কেউ ঝগড়া-বিবাদ করে না।

শিৰাপ্রতিষ্ঠান : আমাদের গ্রামে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জীবনের প্রথম পাঠ শুরব করে। প্রাথমিক পাঠ শেষ করে ভর্তি হয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আমাদের গ্রামে একটি স্বেচ্ছাসেবক নৈশ বিদ্যালয় আছে। যাঁরা লেখাপড়া জানেন না, গ্রামের শিৰিত যুবকেরা তাঁদের সন্ধ্যার পর লেখাপড়া শেখান। আমাদের গ্রামে কোনো নিরৰর লোক নেই।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান : আমাদের গ্রামে যেমন শিৰাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানও। যেমন- পোস্ট অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, কৃষি অফিস ইত্যাদি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : আমাদের গ্রামের পূর্ব পাশ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। গ্রামের তিন পাশে রাস্তা রয়েছে। দৰিণের রাস্তায় বড় গাড়ি চলে। সব রাস্তায় রিকশা-ভ্যান চললেও গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ হেঁটে চলাচল করে।

আর্থিক অবস্থা : আমাদের গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো। গ্রামের মাঠে মাঠে ফলে প্রচুর ধান, পাট, গম, মসুর, সরিষা, আখ ইত্যাদি। বড় বড় পুকুরগুলোতে নানা রকম মাছের চাষ হয়।

সামাজিক অবস্থা : অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের গ্রাম সচ্ছল। গ্রামের সবাই স্বনির্ভর বলে চুরি-ডাকাতি খুন-খারাবির কোনো বালাই নেই। গ্রামের শতভাগ লোকের অৰরজ্ঞান থাকায় কোনো রকমের কুসংস্কার নেই।

উপসংহার : আমাদের গ্রামকে আমরা সবাই মায়ের মতো ভালোবাসি। গ্রামের উন্নয়নে সবাই মিলেমিশে কাজ করার চেষ্টা করি।

১৫ আমাদের বিদ্যালয়

সূচনা : "বিদ্যালয়, মোদের বিদ্যালয়,
এখানে সভ্যতারই ফুল ফোটানো হয়।"

বিদ্যালয় হচ্ছে ভালো মানুষ গড়ার কারখানা। আমি যে বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করি তার নাম ঘোপাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়।

অবস্থান : আমাদের বিদ্যালয়টি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার ঘোপাল গ্রামে অবস্থিত। বিদ্যালয়ে আসার জন্য ভালো ব্যবস্থা রয়েছে। আশপাশের যেকোনো গ্রাম থেকে সহজেই আমাদের স্কুলে আসা যায়।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ : বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছ রয়েছে। বিশাল প্রাঙ্গণে দুটি দীর্ঘকায় চারতলা ভবন। তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত তিনটি শাখা রয়েছে। প্রতি শাখার জন্যই রয়েছে আলাদা ও পরিপাটি শ্রেণিকৰ। প্রধান শিৰক ও দুজন সহকারী প্রধান শিৰকের নিজস্ব মনোরম কৰ রয়েছে। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত একটি বড় অফিস রবম আছে। পঞ্চাশ জন শিৰকের জন্য রয়েছে তিনটি সুন্দর কৰ। সেখানে বিভিন্ন ধরনের বই রয়েছে। বিদ্যালয় ভবনের সামনে আছে বিশাল মাঠ।

ছাত্রছাত্রী ও শিৰকমণ্ডলী : আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৮০০। শিৰকগণ আমাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে পড়ান। আমরাও তাঁদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি।

লাইব্রেরি : আমাদের বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিটি বেশ সমৃদ্ধ। এখানে নানা ধরনের বই রাখা আছে। লাইব্রেরি থেকে বই ধার করে বাড়িতে নিয়েও পড়া যায়।

খেলাধুলা : আমাদের বিদ্যালয়ের সামনে আছে বড় একটি খেলার মাঠ। এখানে আমরা নানা রকম খেলাধুলা করি। বিদ্যালয়ে একজন ক্রীড়া শিৰক আছেন। তিনি নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা অনুশীলন করে থাকেন।

সৃজনশীল কর্মকাণ্ড : আমাদের বিদ্যালয়ে অনেকগুলো ক্লাব আছে। যেমন- বিতর্ক ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব, আবৃত্তিচর্চা ক্লাব, শরীরচর্চা ক্লাব ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকি।

অনুষ্ঠান : আমাদের বিদ্যালয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের বিদ্যালয়টির বেশ সুনাম রয়েছে। প্রতিবছর ফেব্রবয়ারি মাসে আমাদের বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন দিবসে নানা রকম আয়োজন থাকে।

ফলাফল : প্রাথমিক শিৰা সমাপনী পরীৰায় প্রতিবছর আমাদের বিদ্যালয় থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী A^+ পায়। জেএসসি ও এসএসসি পরীৰায় ফলাফলও সবার নজর কাড়ে।

উপসংহার : আমাদের বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ বিদ্যালয়। এরূ প একটি বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত।

১৬ আমার প্রিয় শিৰক

সূচনা : ছাত্রজীবনে যারা আমাদের শিৰাদানের মাধ্যমে আলোর পথ দেখান তাঁরাই আমাদের শিৰক। তারা অক্লান্ত পরিশ্রমে জ্ঞানের আলো বিলিয়ে দেন। তারা মানুষ গড়ার কারিগর। এ সকল শিৰকের মাঝে বিশেষ কিছু গুণের কারণে কোনো কোনো শিৰক আমাদের মনে আলাদাভাবে স্থান করে নেন। হয়ে ওঠেন আমাদের প্রিয় শিৰক, প্রিয় মানুষ। আমারও তেমনি একজন প্রিয় শিৰক আছেন।

আমার প্রিয় শিৰক : প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরব করে আমি অনেক শিৰকের সাহচর্যেই এসেছি। তবে সকলের মধ্যে আমার কাছে আদর্শ শিৰক হিসেবে হৃদয়ের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিয়েছেন সুলতান স্যার। তাঁর কাছে আমি বিভিন্নভাবে লাভ করেছি জীবনে চলার পাথেয়। তাঁর জ্ঞানের সীমা ছিল অসীম। তিনি হৃদয় দিয়ে ছাত্রদের চাহিদা বুঝতেন এবং পড়াশোনায় বন্ধুর মতো সাহায্য

করতেন। তাঁর পড়ানোর ধরন, গুণাবলি, চলাফেরা, কথা বলার ধরন সব কিছুই আমাকে মুগ্ধ করত। তাঁর সততা, নিষ্ঠা এবং ব্যক্তিত্ব আমার কাছে তাঁকে আদর্শ মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছে।

প্রথম পরিচয় : সুলতান স্যারের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল একটি বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়ে। আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জীবন যখন শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম তখন স্কুলের প্রথম দিনেই তাঁর সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল। আমি ফিলিপনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রথম দিন যখন বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম সেখানে সবকিছুই আমার অপরিচিত ছিল। প্রথম ক্লাসে যখন ঢুকলাম তখন সবাই নতুন মুখ। ক্লাসে এলেন বাংলা শিক্ষক। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন সুলতান স্যার বলে। প্রথম ক্লাসেই তিনি সবাইকে পাঠ্যবইয়ের কবিতা আবৃত্তি করতে দিয়েছিলেন। আমার আবৃত্তি নাকি স্যারের অনেক ভালো লেগেছিল। তাই তিনি ক্লাসের সবার সামনেই আমাকে তাঁর পকেটের কলমখানা দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। স্কুলজীবনের প্রথম দিন থেকেই সুলতান স্যার আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিলেন।

সুলতান স্যার আদর্শ শিক্ষক হওয়ার কারণ : আমার কাছে সুলতান স্যার আদর্শ শিক্ষক হওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। তাঁর পড়ানোর ধরনে ছিল স্বাতন্ত্র্য। তিনি ছাত্রদের সুশিক্ষা প্রদানের জন্য প্রচুর পড়াশোনা করতেন। সৌভাগ্যক্রমে একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলাম তাঁর ঘরটা যেন প্রকাণ্ড একটা লাইব্রেরি। বাংলার শিক্ষক হওয়ায় তাঁর ঘরে সাহিত্যের বই বেশি ছিল। সদালাপী ও মিষ্টভাষী সুলতান স্যার ছাত্রদের সকল সময় সুপরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। প্রতিটি বিষয় তিনি শ্রেণিকক্ষে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে সবকিছু নত হতে বাধ্য ছিল।

আমার জীবনে সুলতান স্যারের অবদান : আমার জীবনে সুলতান স্যার অনেক অবদান রেখেছেন। বাংলা আমার কাছে প্রিয় বিষয় হওয়ার কারণ এই সুলতান স্যার। তিনি ক্লাসের প্রথম দিন থেকেই আমার বিষয়ে আলাদা খোঁজখবর নিতেন। পড়াশোনার বিষয়ে কোনো সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে কোনো দিন নিরাশ হইনি। প্রতিটি বিষয় তিনি সময় নিয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। স্যারের কাছে আমি লাভ করেছিলাম প্রিয় ছাত্রের মর্যাদা। তাই তিনি তার সংগ্রহের বিভিন্ন বই দিয়ে আমাকে পড়তে উৎসাহিত করে আমার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। প্রায়ই তিনি আমাদের বাড়িতে এসে খোঁজ-খবর নিতেন। সর্বোপরি একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আমার জীবনে সুলতান স্যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

স্যারের চারিত্রিক গুণাবলি : একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে সুলতান স্যার ছিলেন অসাধারণ চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন খুবই নম্র ও ভদ্র একজন মানুষ। ছাত্রছাত্রীদের তিনি সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ধী-শক্তিসম্পন্ন সুলতান স্যার ছিলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাঁর দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা সকলের কাছে তাঁকে প্রিয় করে তুলেছে। তিনি ছাত্রদের দুঃসময়ে বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়াতেন। একজন ভালো মানুষ ও ভালো শিক্ষক হওয়ার জন্য যেসব গুণ থাকার প্রয়োজন তার সবই সুলতান স্যারের মধ্যে ছিল।

উপসংহার : শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক গণ্ডি পেরিয়ে আমি কেবল দ্বিতীয় সিঁড়িতে পদার্পণ করতে যাচ্ছি। আমার দেখা শিক্ষকদের মধ্যে তাঁর মতো গুণী ও আদর্শ শিক্ষক আমি আর দেখিনি। তাঁর আদর্শ প্রতিটি ছাত্রের জীবনে প্রতিফলিত হয়ে থাকার মতো। আমার জীবনেও তিনি একজন প্রিয় ও আদর্শ শিক্ষক। তাঁকে অনুসরণ করে আমি একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে চাই।

১৭ আমার জীবনের লক্ষ্য

[সি. বো. ১৪]

সূচনা : একটি সফল ও সার্থক জীবন পাওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ। মানুষের জীবন ছোট কিন্তু তার কর্মক্ষেত্র অনেক বড়। এ ছোট জীবনে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে হলে প্রত্যেক মানুষকে জীবনের শুরুতেই সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়।

লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা : জীবন গঠনের জন্য জীবনের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি। লক্ষ্যহীন জীবন হলো হালবিহীন নৌকার মতো। তাই লক্ষ্য স্থির না করলে সফলতা পাওয়া অসম্ভব। প্রতিটি মানুষকে জীবনের শুরুতে সঠিক চিন্তা ভাবনা করে লক্ষ্য ঠিক করে সেটাকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে কখনোই ব্যক্তি তার জীবনকে পরিচালনা করার সঠিক দিক পাবে না। লক্ষ্য না থাকলে জীবনকে উদ্দেশ্যহীন বিক্ষিপ্ত মনে হয়। ফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয় না।

ছাত্রাবস্থায়ই লক্ষ্য স্থির করার উপযুক্ত সময় : ছাত্রজীবন পরিণত-জীবনের প্রস্তুতিপর্ব। ছাত্রাবস্থার স্বপ্ন ও কল্পনা পরিণত-জীবনে বাস্তবের মাটিতে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে সার্থক হয়। কিন্তু স্বপ্ন কেবল স্বপ্ন হলেই, কিংবা কল্পনা, অবাস্তব ও উদ্ভট হলেই চলে না; পরিণত জীবনের লক্ষ্যবাহী ও বাস্তবঘনিষ্ঠ হওয়া চাই। সেজন্য ছাত্রবস্থাতেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে হয়। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হয়, শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সঙ্গে।

আমার জীবনের লক্ষ্য : নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায় না। লক্ষ্য ঠিক করে সে মোতাবেক এগিয়ে গেলেই জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। তাই আমিও জীবনের লক্ষ্য ঠিক করেছি। আমার লক্ষ্য আর দশজনের থেকে আলাদা। আমার ইচ্ছা বড় হয়ে আমি একজন ক্রিকেটার হব।

লক্ষ্য নির্ধারণের কারণ : সাধারণত মানুষের জীবনের লক্ষ্য থাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ইত্যাদি হওয়া। কিন্তু মানুষের যে কাজটি ভালো লাগে সেটির চর্চা অব্যাহত রাখলেই বেশি সফলতা পাওয়া যায়। ক্রিকেট খেলার প্রতি আমার ভালোলাগা অত্যন্ত প্রবল। ক্রিকেটারদের দেশপ্রেম, মনোবল ও সুশৃঙ্খল জীবন আমাকে অত্যন্ত আকর্ষণ করে। এ কারণেই আমি ক্রিকেটার হওয়ার লক্ষ্য ঠিক করেছি। ক্রিকেট খেললে আনন্দ লাভের পাশাপাশি শরীরকেও সুস্থ রাখা যায়। আর কঠোর নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে খেলতে যায় বলে এ লেখা নিয়মানুবর্তিত ও সময়জ্ঞানের শিক্ষা দেয়। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বে ক্রিকেট জনপ্রিয় খেলা। ক্রিকেটে বাংলাদেশেরও একটি শক্ত অবস্থান তৈরি হয়েছে। বর্তমানে এ দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উৎসবের অন্যতম উপলক্ষ হলো ক্রিকেট। তাই বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এখন ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেই পারে।

লক্ষ্যপূরণে করণীয় : জীবনের লক্ষ্য পূরণে আমাকে এখন থেকেই মনোযোগী হতে হবে। শুধু ভালো ক্রিকেট খেললেই ভালো ক্রিকেটার হওয়া যায়। সেই সাথে পড়াশোনায়ও ভালো হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই ক্রিকেটের সব আধুনিক দিকগুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারব। এখন থেকেই ক্রিকেটের সব খুঁটিনাটির বিষয়ে আমাকে জানতে হবে। নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে।

উপসংহার : বিখ্যাত কোনো ক্রিকেটার হতে পারলে পৃথিবীর বুকে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। বিশ্বের অনেকেই এখন বড় ক্রিকেটার হতে চায়। বাংলাদেশও ক্রিকেটে এখন ভালো অবস্থানে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ক্রিকেট অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। একজন আদর্শ ক্রিকেটার হয়ে আমি সে সম্ভাবনাকে সত্যে পরিণত করতে চাই। দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনতে চাই।

১৮ শ্রমের মর্যাদা

[ঢা. বো. ১৫, ১৪; কু. বো. ১৪; চ. বো. ১৪; য. বো.১৩;

সি. বো. ১৩; দি. বো. ১২; রা. বো. ১২; ব. বো. ১২]

সূচনা : কর্মই জীবন। সৃষ্টির সমস্ত প্রাণীকেই নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হয়। ছোট্ট পিঁপড়ে থেকে বিশাল হাতি পর্যন্ত সবাইকেই পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রম দ্বারাই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে নিজেকে আলাদা করেছে। পরিশ্রমের মাধ্যমেই মানুষ নিজের ভাগ্য বদলেছে। আর বহু বছরের শ্রম ও সাধনা দ্বারা পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বলা যায়, মানুষ ও সভ্যতার যাবতীয় অগ্রগতির মূলে রয়েছে পরিশ্রমের অবদান।

শ্রম কী : শ্রমের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মেহনত, দৈহিক খাটুনি। সাধারণত যেকোনো কাজই হলো শ্রম। পরিশ্রম হচ্ছে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার। পরিশ্রমের দ্বারাই গড়ে উঠেছে বিশ্ব ও মানবসভ্যতার বিজয়-স্তম্ভ।

শ্রমের শ্রেণিবিভাগ : শ্রম দুই প্রকার : মানসিক শ্রম ও শারীরিক শ্রম। শিক্ষক, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, অফিসের কর্মচারী শ্রেণির মানুষ যে ধরনের শ্রম দিয়ে থাকেন সেটিকে বলে মানসিক শ্রম। আবার কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, মজুর শ্রেণির মানুষের শ্রম হচ্ছে শারীরিক শ্রম। পেশা বা কাজের ধরন অনুসারে এক এক শ্রেণির মানুষের পরিশ্রম এক এক ধরনের হয়। তবে শ্রম শারীরিক বা মানসিক যা-ই হোক না কেন উভয়ের মিলিত পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা।

শ্রমের প্রয়োজনীয়তা : মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। তার এই ভাগ্যকে নির্মাণ করতে হয় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। তাই মানবজীবনে পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কর্মবিমুখ অলস মানুষ কোনো দিন উন্নতি লাভ করতে পারে না। পরিশ্রম ছাড়া জীবনের উন্নতি কল্পনামাত্র। জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে নিরলস পরিশ্রম দরকার। পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। তাই ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে মানুষকে পরিশ্রমী হতে হবে। একমাত্র পরিশ্রমই মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পারে।

শ্রমের মর্যাদা : মানুষের জন্ম স্রষ্টার অধীন, কিন্তু কর্ম মানুষের অধীন। জীবন-ধারণের তাগিদে মানুষ নানা কর্মে নিয়োজিত হয়। কৃষক ফসল ফলায়, তাঁতি কাপড় বোনে, জেলে মাছ ধরে, শিক্ষক ছাত্র পড়ান, ডাক্তার চিকিৎসা করেন, বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন। এঁরা প্রত্যেকেই মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। পৃথিবীতে কোনো কাজই ছোট নয়। আর্থসামাজিক পদমর্যাদায় হয়তো সবাই সমান নয়। কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই মেধা, মনন, ঘাম ও শ্রমে সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। তাই সকলের শ্রমের প্রতিই আমাদের সমান মর্যাদা ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত। উন্নত বিশ্বে কোনো কাজকেই তুচ্ছ করা হয় না। সমাজের প্রতিটি লোক নিজের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে করার চেষ্টা করে। তাই চীন, জাপান, কোরিয়া, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, কানাডা প্রভৃতি দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে। আমাদের দেশে শারীরিক শ্রমকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখা হয় না। তার ফলে আজও সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা দেশের অধিবাসী হয়েও আমরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করি।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি : সৌভাগ্য আকাশ থেকে পড়ে না। জীবনে সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম ও নিরন্তর সাধনার দরকার হয়। সব মানুষের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা আছে। পরিশ্রমের দ্বারা সেই সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। যে মানুষ কর্মকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে, জীবনসংগ্রামে তারই হয়েছে জয়। কর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি জীবনে সফল সৈনিক হতে পারে। কর্মহীন ব্যক্তি সমাজের বোঝাস্বরূপ। অন্যদিকে শ্রমশীলতাই মানবজীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। আমাদের জীবনে উন্নতি এবং সুখ বয়ে আনতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই।

উপসংহার : পরিশ্রম শুধু সৌভাগ্যের নিয়ন্ত্রক নয়, সভ্যতা বিকাশেরও সহায়ক। মানবসভ্যতার উন্নতি-অগ্রগতিতে শ্রমের অবদান অনস্বীকার্য। আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক। সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন ও সাধনা আমাদের। তাই কোনো ধরনের শ্রম থেকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে থাকলে চলবে না। শ্রমে বিজয়-রথে চড়ে আমাদের উন্নত সভ্যতার সিংহদ্বারে পৌঁছতে হবে।

১৯ কর্মমুখী শিক্ষা

[ঢা. বো. ১৫, রা. বো. ১৩]

সূচনা : প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু যে শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে না, সে শিক্ষা অর্থহীন। তাই জীবনভিত্তিক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত যে শিক্ষা সেটিই কর্মমুখী শিক্ষা। আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশের পাশাপাশি উদরপূর্তির সুব্যবস্থায় কর্মমুখী শিক্ষা অন্যতম।

কর্মমুখী শিক্ষা কী : কর্মমুখী শিক্ষা হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার লক্ষ্যে বিশেষ কোনো কর্মে প্রশিক্ষিত করে তোলা। অর্থাৎ যে শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ কোনো একটি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করে এবং শিক্ষা শেষে জীবিকার্জনের যোগ্যতা অর্জন করে, তাকেই কর্মমুখী শিক্ষা বলে। কর্মমুখী শিক্ষাকে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রকারভেদ : কর্মমুখী শিক্ষা যান্ত্রিক শিক্ষা নয়। জীবনমুখী শিক্ষার পরিমণ্ডলেই তার অবস্থান। তাই পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক জীবনবোধের আলোকে কর্মমুখী শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো– উচ্চতর কর্মমুখী শিক্ষা। এই শিক্ষায় বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ ইত্যাদি স্বাধীন পেশা গ্রহণ করতে পারে। আরেকটি হলো– সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষা। এর জন্য প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষাই যথেষ্ট। সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষার মধ্যে পড়ে কামার, কুমার, তাঁতি, দর্জি, কলকারখানার কারিগর, মোটরগাড়ি মেরামত, ঘড়ি-রেডিও-টিভি-ফ্রিজ মেরামত, ছাপাখানা ও বাঁধাইয়ের কাজ, চামড়ার কাজ, গ্রাফিকস আর্টস, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, মৎস্য চাষ, হাঁসমুরগি পালন, নার্সারি, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কারোরই জীবিকার জন্য ভাবতে হয় না।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : শিক্ষা মানুষের মেধা ও মননকে বিকশিত করে আর কর্মমুখী শিক্ষা মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারার উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের অশিক্ষা ও অপরিকল্পিত পুথিগত শিক্ষাব্যবস্থার কারণে প্রায় দেড় কোটি লোক কর্মহীন। এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবনসম্পৃক্ত ও উপার্জনক্ষম কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরি। কর্মমুখী শিক্ষা আত্মকর্মসংস্থানের নানা সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এ শিক্ষা ব্যক্তি ও দেশকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তিকে আমরা বিদেশে পাঠিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। তাই বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থাকে শিল্প, বিজ্ঞান, কারিগরি উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের উপযোগী করে তোলা অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার : কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা পেশাগত কাজের যোগ্যতা অর্জন করে এবং দক্ষ কর্মী হিসেবে কর্মক্ষেত্রে

যোগ দেয়। তাই কর্মমুখী শিৰার প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন ছাড়া কোনো জাতির কৃষি, শিল্প, কল-কারখানা, অন্যান্য উৎপাদন এবং কারিগরি ৰেত্রে উন্নতি সম্ভব নয়। বাংলাদেশে কর্মমুখী শিৰার ৰেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশে প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট; লেদার ও টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজ, গ্রাফিকস আর্টস্ কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো কর্মমুখী শিৰা প্রসারে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাই আমাদের দেশে সরকার ও জনগণের সক্রিয় প্রচেষ্টায় আরো অনেক কর্মমুখী শিৰাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে কর্মমুখী শিৰা প্রসারের ৰেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদৰেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে স্কুল ও মাদ্‌রাসায় নবম ও দশম শ্রেণিতে বেসিক ট্রেড কোর্স চালু, কৃষিবিজ্ঞান, শিল্প, সমাজকল্যাণ ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত; পলিটেনিক ইনস্টিটিউটে ডাবল শিফট চালু ইত্যাদি উলেৱখযোগ্য।

উপসংহার : বাংলাদেশে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের বাস। এই বিপুল পরিমাণ মানুষকে কর্মমুখী শিৰার মাধ্যমে জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। তাহলে আমাদের দেশ উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করবে অনায়াসে। দৰ জনশক্তি দেশের সম্পদ; উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। তাই আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যাপকভাবে কর্মমুখী শিৰার প্রসার ঘটানো দরকার।

২০ স্বদেশপ্রেম

[সি. বো. ১৫, য. বো. ১৫, রা. বো. ১৫, ব. বো. ১৪, দি. বো. ১৪]

সূচনা : মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার জন্মস্থানকে ভালোবাসে। জন্মস্থানের আলো-জল-হাওয়া, পশু-পাখি, সবুজ প্রকৃতির সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জন্মস্থানের প্রতিটি ধূলিকণা তার কাছে মনে হয় সোনার চেয়েও দামি। সে উপলব্ধি করে–

মিছা মণি মুক্তা-হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।

মানুষের এই উপলব্ধিই হচ্ছে স্বদেশপ্রেম।

স্বদেশপ্রেমের সংজ্ঞার্থ : স্বদেশপ্রেম অর্থ হচ্ছে নিজের দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, ভাষার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করা। দেশের প্রতি প্রবল অনুরাগ, নিবিড় ভালোবাসা এবং যথার্থ আনুগত্যকে দেশপ্রেম বলে। জন্মভূমির স্বার্থে সর্বস্ব ত্যাগের সাধনাই স্বদেশপ্রেম।

স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ : স্বদেশ অর্থ নিজের দেশ। নিজের দেশকে সবাই ভালোবাসে। মাকে যেমন সবাই নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে, তেমনি স্বদেশের প্রতিও সবার ভালোবাসা সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে। প্রত্যেক মানুষেরই কথায়, চিন্তায় ও কাজে প্রকাশ পায় স্বদেশের প্রতি নিবিড় মমত্ববোধ। এই বোধ বা চেতনা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত। তাই এডউইন আর্নল্ড বলেছিলেন, 'জীবনকে ভালোবাসি সত্যি, কিন্তু দেশের চেয়ে বেশি নয়।' সংস্কৃত শেৱাকে আছে : "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি : দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে জন্ম হয় স্বদেশপ্রেমের। পৃথিবীর সব জায়গার আকাশ, চাঁদ, সূর্য এক হলেও স্বদেশপ্রেমের চেতনা থেকে মানুষ নিজের দেশের চাঁদ-সূর্য-আকাশকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ভালোবাসে। স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয় দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে। তখন স্বদেশপ্রেমের প্রবল আবেগে মানুষ নিজের জীবন দিতেও দ্বিধা করে না। কেননা সে জানে, দেশের জন্য 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ৰয় নাই তার ৰয় নাই।"

ছাত্রজীবনে স্বদেশপ্রেম : ছাত্ররাই দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। দেশের উন্নতি ও জাতির আশা পূরণের আশ্রয়স্থল। তাই দেশ ও জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ছাত্রজীবনেই জাগিয়ে তুলতে হবে। দেশকে ভালোবাসার উজ্জীবন মন্ত্রে দীৰিত হতে হবে। ছাত্রদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই দেশের স্বার্থে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে বিদ্রোহী কবির বাণী :

আমরা রচি ভালোবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায় আকাশ-ছায়াপথ।
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল ॥

বাঙালির স্বদেশপ্রেম : পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য দেশপ্রেমিক জন্মেছেন। তাঁরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে অমর হয়ে আছেন। বাংলাদেশেও তার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে বিদেশি শক্তি প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেছে, আর স্বদেশপ্রেমিক বাঙালি দেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রৰার্থে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের হাতে বাংলা-ভাষার জন্য রফিক, শফিক, সালাম, জব্বার, বরকতের আত্মদান দেশপ্রেমের ৰেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মদান করেছে অসংখ্য ছাত্র-শিৰক, কৃষক-শ্রমিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, মা-বোনসহ সাধারণ মানুষ। অকুতোভয় শত-সহস্র এ সৈনিকের দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এখনো এ দেশের লৰকোটি জনতা দেশের সামান্য ৰতির আশঙ্কায় বজ্রকণ্ঠে গর্জে ওঠে।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম : স্বদেশপ্রেম মূলত বিশ্বপ্রেমেরই একটি অংশ। কেননা বিশ্বের সব মানুষই পৃথিবী নামক এই ভূখণ্ডের অধিবাসী। তাই স্বদেশপ্রেমের মাধ্যমে সকলেরই বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী ও বিশ্বমানবতাকে উচ্চকিত করে তুলতে হবে। কারণ বিশ্বজননীর আঁচল-ছায়ায় দেশজননীর ঠাঁই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেজন্যই গেয়েছেন–

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর – তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥

উপসংহার : দেশপ্রেম একটি নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ আত্মানুভূতি। কোনো প্রকার লোভ বা লোভের বশবর্তী হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায় না। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাছে দেশের মঙ্গলই একমাত্র কাম্য। দেশের জন্য তাঁরা সর্বস্ব দান করতে পারেন। তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তা আবহমানকাল ধরে জাতিকে প্রেরণা জোগায়। কাজেই ব্যক্তিস্বার্থ নয়, দেশ ও জাতির স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দিতে হবে। দেশ গড়ার কাজে, দেশের জন্য মঙ্গলজনক কাজে আমাদের সকলকে নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। সর্বোপরি দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। তবেই অর্জিত হবে স্বদেশপ্রেমের চূড়ান্ত সার্থকতা।

২১ ছাত্রজীবন

অথবা, ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

[ঢা. বো. ১১, রা. বো. ১১, য. বো. ১১]

সূচনা : বিদ্যাশিৰার জন্য শিশুকাল থেকে শুরব করে যে সময়টুকু আমরা শিৰাপ্রতিষ্ঠানে অতিবাহিত করি তাকেই ছাত্রজীবন বলে। ছাত্রজীবন হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতার জন্য এ সময় থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। তা না হলে কাঙ্ক্ষিত লৰ্যে পৌঁছানো যায় না। জীবনে প্রকৃত সফলতা লাভ করতে হলে ছাত্রজীবনকে গুরবত্ব প্রদান করা জরবরি।

ছাত্রজীবনের গুরবত্ব : ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতির বীজ ছাত্রজীবনেই বপন করতে হয়। ছাত্রজীবনের সুশিৰাই ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়। আমাদের জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাত্রজীবনের সাধনার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

ছাত্রজীবনের মূল উদ্দেশ্য : সকল ৰেত্রেই মানুষ একটি লৰ্য নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তেমনি ছাত্রজীবনেরও একটি লৰ্য থাকা প্রয়োজন। শুধুমাত্র পাস করে সনদ অর্জনই যেমন ছাত্রজীবনের একমাত্র লৰ্য নয়, তেমনি পরীৰায় ভালো ফলাফল করলেই ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। ছাত্রজীবনের মূল লৰ্য হওয়া উচিত জ্ঞানার্জন। জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে মানুষের মনের সকল বন্ধ দুয়ার খুলে যায়। চিত্তের সংকীর্ণতা দূর হয়ে এক উদারনৈতিক চিন্তা-চেতনার অধিকারী হয় সে। আর তখনই সে নিজেকে মহৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। নিজেকে ভদ্র, সেবাপরায়ণ, সেবাব্রতী, আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সাধনাও ছাত্রজীবনের দায়িত্বকর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ছাত্রজীবনের মূল লৰ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।

ছাত্রজীবনের কর্তব্য : অধ্যয়ন করাই ছাত্রজীবনের প্রথম ও প্রধান তপস্যা। ছাত্রসমাজই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এজন্য ছাত্রদের অন্যতম কাজ হলো শিৰা-দীৰায় সমৃদ্ধ ও আদর্শ জীবন গঠন করা। ছাত্রসমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত এবং শারীরিক শক্তিতে ও মানসিক দৰতায় বলীয়ান হতে হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন ও চরিত্রবান ছাত্রদের জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

লৰ্য নির্ধারণ : লৰ্যহীন জীবন হালবিহীন জাহাজের মতো। ছাত্রজীবনেই জীবনের লৰ্য স্থির করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে। লৰ্য নির্ধারণ না করলে জীবন উদ্দেশ্যহীন হয়ে যায়। তাই ছাত্রজীবনেই লৰ্য নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

চরিত্র গঠন : চরিত্র মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। ছাত্রজীবনই চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময়। ছাত্রদের চরিত্র গঠনে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। সৎ পথে চলা, সত্য কথা বলা, লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকা, খারাপ কাজ ও কুসঙ্গ থেকে দূরে থাকা, ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের শ্রদ্ধা করা ইত্যাদি ভালো গুণগুলো ছাত্রজীবনেই চর্চা করতে হবে।

খেলাধুলা ও স্বাস্থ্য গঠন : পড়াশোনার পাশাপাশি শরীর গঠনের প্রতিও ছাত্রদের মনোযোগী হতে হবে। স্বাস্থ্য মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। সুস্থ শরীরেই সুস্থ মনের বাস। তাই ছাত্রজীবনে নিয়মিত খেলাধুলার মাধ্যমে স্বাস্থ্য গঠনে সচেষ্ট হতে হবে।

পিতামাতা ও গুরবজনদের প্রতি কর্তব্য : পিতামাতা ও গুরবজনদের যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা ছাত্রসমাজের গুরবত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মনোভাব তাদের নৈতিক দিক থেকে আদর্শবান করে তোলে। গুরবজন যা নিষেধ করেন তা না করাও তাদের কর্তব্য। বড়দের মনে কষ্ট হয় এমন কাজ থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে। কেননা বড়দের আশীর্বাদ তাদের চলার পথের পাথেয়। পিতামাতা যেন তাদের কোনো কাজে কষ্ট না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পিতামাতার আশীর্বাদই একজন সন্তানের সবচেয়ে বড় সম্পদ। পিতামাতার আশীর্বাদ সন্তানকে উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছে দেয়। তাই তাদের এ সকল বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ : ছাত্রদের মানসিক বিকাশে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া অত্যন্ত জরবরি। এৰেত্রে যার যে কাজ ভালো লাগে সে কাজে মনোযোগ দিতে হবে। বিতর্কচর্চা, আবৃত্তিচর্চা, বই পড়া, ভ্রমণ, ছবি তোলা, বিজ্ঞানচর্চা, লেখালেখি ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলা সম্ভব।

সামাজিক দায়িত্ব : সমাজের সবচেয়ে তরবণ ও সচেতন অংশ হচ্ছে ছাত্রসমাজ। পুরাতনকে, মিথ্যাকে, জরা-জীর্ণতাকে মুছে ফেলে, প্রাচীন সংস্কার ও গোঁড়ামিকে ঝেড়ে ফেলে একটি শোষণমুক্ত সুন্দর সমাজ গড়ার দায়িত্ব আজকের ছাত্রসমাজের। ছাত্ররা তাদের সুন্দর মন এবং সুকুমার বৃত্তির অভিনব প্রকাশের সাহায্যে সমাজের পঙ্কিলতা দূর করতে পারে। বিশ্বমানবতা এবং মানবিকতার বিজয় পতাকা ছাত্রদেরই হাতে। তারা তা সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। চির বঞ্চিত, বুভুক্ষু অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তারা শোনাতে পারে সান্ত্বনার বাণী। আশাহীন বুকে জাগাতে পারে আশা। ভাষাহীন বুকে দান করতে পারে প্রাণের স্পন্দন। সভা-সমিতি, সংঘ, স্কাউটিং এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক ফোরামের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা এ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

উপসংহার : ছাত্রজীবনই জীবনের সবেচেয় গুরবত্বপূর্ণ সময়। তাই এ সময় থেকেই ছাত্রদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। ছাত্ররাই ভবিষ্যতে দেশের সকল ৰেত্রে নেতৃত্ব দেবে। তাই নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারলেই দেশ ও জাতির জন্য তারা গৌরব বয়ে আনতে সৰম হবে।

২২ বই পড়ার আনন্দ

অথবা, পুস্তক পাঠের আনন্দ

[রা. বো. ১৪, দি. বো. ১৪, কু. বো. ১৩]

সূচনা : পৃথিবীতে নির্মল আনন্দের যে কয়েকটি উৎস রয়েছে তার মধ্যে বই অন্যতম। বই পড়লে জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটে। বই পাঠের মাধ্যমে মানুষ অনাবিল শান্তি খুঁজে পায়। অনুসন্ধিৎসু মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানা যায় বই পাঠ করে। সুসময় হোক কিংবা দুঃসময়, বই কখনো মানুষকে ছেড়ে যায় না। তাই আবহমানকাল ধরে মানুষ বইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলে আসছে। তাই তো বিশ্বকে জানতে কবিগুরব লিখেছেন–

"বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ৰোতে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে
অৰয় উৎসাহে .....।"

মানবজীবনে বইয়ের অবদান : মানবজীবনে বইয়ের অবদান অপরিসীম। বই পড়ার মাধ্যমেই মানুষ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে পারে। যে ব্যক্তি যত বেশি বই পড়বে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার তত বেশি সমৃদ্ধ হবে। প্রখ্যাত দার্শনিক টলস্টয়ের উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "জীবনে তিনটি বস্তুই বিশেষভাবে প্রয়োজন, তা হচ্ছে বই, বই এবং বই।" বই মানুষের মন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করে। জীবনের আসল রহস্য উন্মোচনে এবং নিজেকে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সংযুক্ত করতে উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে বইকেই বেছে নিতে হবে। মানুষের রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-বিষাদ সবকিছুই পুস্তক পাঠের মাধ্যমে দূরীভূত করা যায়। বিশ্বের মহামূল্যবান গ্রন্থগুলো পৃথিবীরে বিচিত্র জ্ঞানের ভাণ্ডার। মানবজীবনকে সার্থক করে তুলতে চাইলে জ্ঞান আহরণ করা

জরুরি। আর এক্ষেত্রে সহায়তাকারী বন্ধু হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে বই। তাই মানবজীবনে বইয়ের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

জ্ঞানের আধার হিসেবে বই : মানুষের অর্জিত বিভিন্ন জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটেছে বইয়ের পাতায়। আমাদের চারপাশে জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। নানা বিষয়ের সকল জ্ঞানকে আমরা পুস্তক পাঠের মাধ্যমেই আত্মস্থ করতে পারি। অতীত কিংবা ভবিষ্যতের জ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, আইন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের অজানা তথ্য আমরা জানতে পারি বই পড়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "মানুষ বই দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দিয়েছে।" "মানুষ বই পড়ার মাধ্যমে সকল কালের সকল মনীষীর সংস্পর্শে আসতে পারে। তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁদের রচিত নানা ধরনের বই পাঠ করে আমরা জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হই।

চিত্ত প্রসারণে ও বুদ্ধির বিকাশ সাধনে বই : বই পড়ার উপকারিতার কথা বলাই বাহুল্য। বই কেবল নির্মল আনন্দের খোরাকই জোগায় না, মনের সংকীর্ণতাকে দূর করে বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আনাতোল্ ফ্রাঁস বই পড়ার আনন্দে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন–

"নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি,
ততই একটা একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।"

বই পড়লে আমাদের মনের দিগন্ত উন্মোচিত ও প্রসারিত হয়। আমাদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করে দেয়। প্রকৃত মানুষ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো যথার্থ জ্ঞানী হওয়া। আর প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী হতে হলে চিত্তের প্রসারণ এবং বুদ্ধির বিকাশ উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বই-ই মানুষের চিত্ত ও বুদ্ধির বিকাশের জন্য যথেষ্ট। রাশিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির মতে, "আমার মধ্যে উত্তম বলে যদি কিছু থাকে তার জন্য আমি বইয়ের কাছেই ঋণী।" তাই আমাদের চিত্তের প্রসারণ এবং বুদ্ধির স্বাধীনতার জন্য বই পাঠ করা জরুরি।

বহির্বিশ্বের সাথে সংযোগ স্থাপনে বইয়ের ভূমিকা : ভ্রমণের মাধমে নানা দেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, মানুষ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু কথায় আছে, 'সাধ থাকলেও সাধ্য নেই'। মানুষের ক্ষেত্রে এ সত্যটি বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। সে ইচ্ছে করলেই তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই তার পৃথিবী ভ্রমণের ইচ্ছা অধরাই থেকে যায়। তবে জ্ঞানপিপাসু লোকদেরকে অর্থের সীমাবদ্ধতা আটকে রাখতে পারে না। যারা ভ্রমণের ইচ্ছাকে হৃদয়ে লালন করে তাদের কাছে বই হতে পারে সকল সুখের চাবিকাঠি। একটি উত্তম বই বহির্বিশ্বের সাথে মানুষের যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে। ঘরে বসেই সে জানতে পারে নিজের দেশকে এবং বহির্বিশ্বকে। এর মাধ্যমে সে আনন্দ লাভ করে এবং জ্ঞানতৃষ্ণাকে তৃপ্ত করে। এ কারণেই ভিনসেন্ট স্টারেন্ট বলেছেন– "When we buy a book we buy pleasure." বহির্বিশ্বকে মানুষ তার হাতের মুঠোয় আনতে পারে বই পড়ার মাধ্যমে। তাই বহির্বিশ্বের সাথে মানুষের সংযোগ স্থাপনে বইয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বই পড়ার আনন্দ : মানুষ মাত্রই জগতের অফুরন্ত আনন্দের অংশীদার হতে চায়। কিন্তু জীবনে চলার পথে মানুষকে ঘিরে ধরে নানা দুঃখ-কষ্ট, হতাশা ও বিষাদ। এসব থেকে মুক্তি দিতে বই মানুষের জীবনে পথ্যের মতো কাজ করে। মনীষী বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন– "সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়ানোর প্রধান উপায় হচ্ছে মনের ভেতর আপন ভুবন তৈরি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভেতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন তৈরি করতে পারে, ভবযন্ত্রণা এড়ানোর ক্ষমতা তার তত বেশি হয়।" এই ভুবন সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে বই। বই পড়ার আনন্দ নির্মল ও নিষ্কলুষ। মানুষকে সকল সংকীর্ণতা, অজ্ঞানতা এবং সংশয়ের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় বই। বই পড়লে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি জেগে ওঠে এবং মানুষ অনাবিল আনন্দের সংস্পর্শে আসতে পারে। এ কারণেই কবি ওমর খৈয়াম বইকে ভাবতেন নিঃসঙ্গ জীবনের সহচর রূপে। নির্মল আনন্দ পাওয়ার যে কয়েকটি উৎস রয়েছে তা অনুসন্ধান করা মানুষের পক্ষে খুব সহজ নয়। কিন্তু বই সবসময় হাতের কাছেই পাওয়া যায়। তাই বই পড়ে আনন্দ লাভ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। বই পড়ে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আনন্দ অনুসন্ধান করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই কাজ।

পাঠ উপযোগী বইয়ের স্বরূপ : বই নির্মল আনন্দ ও নিষ্কলুষ জ্ঞানের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলেও সব বইয়ের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। কেবল উৎকৃষ্ট মানের বই-ই মানুষের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী হওয়ার দাবিদার। পাঠককে তাই সঠিক বই নির্বাচনের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। যদি তার পছন্দ সঠিক হয় তবেই সে বই পাঠের প্রকৃত উপকার লাভ করতে পারবে। কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল বই আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় এবং তাদের জ্ঞানকে করে আড়ষ্ট। যেসব বই বাস্তব জ্ঞান, নৈতিকতা, সামাজিকতা, জীবনাচার, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয় সেগুলোই পাঠ উপযোগী বই। এর পাশাপাশি বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী, ভ্রমণকাহিনিমূলক বই, গোয়েন্দা কাহিনিনির্ভর বই, ইতিহাস, আইন ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত বইও পাঠ করা যায়। সাধারণত বই পড়ার অভ্যাস যদি ছোটবেলা থেকেই গড়ে তোলা যায় তবে তা ভবিষ্যতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশুর পিতা-মাতাকে সঠিক ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের বই নির্বাচনের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। বিভিন্ন শিশুতোষমূলক গ্রন্থ পাঠ করানোর মাধ্যমে শিশুর মেধার বিকাশ ঘটানো যায়। বই নির্বাচন যদি সঠিক হয় তবে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায়।

উপসংহার : একটি বই আবহমানকাল ধরে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। আনন্দপ্রাপ্তি এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য বই মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। একটি উত্তম বই মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। তাই পরিপূর্ণ আত্মিক তৃপ্তি লাভে বই পড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে L A G Strong-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য–"The diversity of the books expressing different factor has created construction among the readers."

২৩ চরিত্র

ভূমিকা : চরিত্রের ওপর নির্ভর করে মানুষের ব্যক্তিত্ব। ভালো চরিত্রের মাধ্যমে মানুষ সব গুণের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। ফলে চরিত্র ভালো হলে সেই ব্যক্তি সকলের কাছে আদরণীয় হয়ে ওঠে। কোনো ব্যক্তির আচরণ ও আদর্শের উৎকর্ষবাচক গুণ বোঝাতে চরিত্র শব্দটি ব্যবহৃত হয়। উত্তম চরিত্র মানুষকে ন্যায়পথে, সৎপথে পরিচালিত করে। এই চরিত্রের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় নিহিত। চরিত্র ভালো হলে মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। আবার চরিত্র খারাপ হলে মানুষ তাকে ঘৃণা করে। চরিত্র অনুযায়ীই গঠিত হয় ব্যক্তিজীবন, যার প্রভাব পড়ে পরিবেশ ও সমাজের ওপর।

চরিত্রের ধারণা : মানুষের সামগ্রিক জীবনের কাজ-কর্মে, চিন্তা-ভাবনায়, ওঠা-বসা, আচার-আচরণে প্রকাশিত ভাবকেই চরিত্র বলে। গুরুজনের প্রতি ভক্তি, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মসংযম ইত্যাদি নানা উৎকর্ষবাচক গুণের মাধ্যমে সচ্চরিত্রের প্রকাশ পায়। অন্যদিকে মানুষের মধ্যে লুক্কায়িত অপকর্ম বা পশুত্ব চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলে তার মধ্যে দুশ্চরিত্রের ভাব প্রকাশ পায়।

চরিত্র গঠনের উপায় : সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সূত্র ধরেই শিশুর চরিত্র গঠিত হয়। মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে পাড়া-প্রতিবেশীর

পরিবেশের মধ্য দিয়েও চরিত্র গঠিত হয়। শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসতে শুরব করে এবং সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধুলা করে তখনই তার চরিত্রের রূ প বিকশিত হতে থাকে। সেজন্য এ অবস্থায় অভিভাবক এবং শিৰকদের বিশেষভাবে লৰ রাখা উচিত, এছাড়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানব চরিত্রের ৰেত্রে একটা গুরবত্বপূর্ণ ব্যাপার। সে যেরূ প পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করে, সাধারণত তার চরিত্র সেভাবেই গঠিত হয়।

চরিত্র গঠনে পারিবারিক পরিবেশ : চরিত্র গঠনে পারিবারিক পরিবেশ গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুকাল ও শৈশবকালই হচ্ছে চরিত্র গঠনের উৎকৃষ্ট সময়। তাই বাসগৃহকে চরিত্র গঠনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে মনে করা হয়। শিশুকে সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহিত করা হলে তাতে সৃজনী প্রতিভা বিকশিত হয়। শিশুরা স্বভাবতই অনুকরণপ্রিয়। তাই শৈশবে শিশুর কোমল হৃদয়ে যা প্রবিষ্ট হয় তা চিরস্থায়ী রূ প পরিগ্রহ করে। এজন্য শিশুর পরিবার যদি সৎ ও আদর্শবান হয় তাবে শিশুও সৎ ও আদর্শবান হতে বাধ্য। শিশুর জীবনে মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটাতে হলে চাই সৎ সঙ্গ। আজকাল শিশুর ভালো–মন্দ চরিত্র গঠনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখছে টেলিভিশন ও স্যাটেলাইট চ্যানেলের মতো গণমাধ্যমে। স্যাটেলাইটের বিভিন্ন চ্যানেলে যেসব অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তার মধ্যে এমন অনেক অনুষ্ঠান রয়েছে যা শিশুদের জন্য অনুপযোগী। তাই অভিভাবককে এদিকে লৰ রাখতে হবে। এভাবে পারিবারিক পরিবেশ শিশুর চরিত্র গঠনে প্রত্যৰ ভূমিকা রাখে।

চরিত্র গঠনে নিজের ভূমিকা : চরিত্র গঠনে ব্যক্তির নিজস্ব সাধনা ভূমিকা রাখতে পারে। বহুদিনের সাধনার ফলে মানুষ সচ্চরিত্রবান হয়ে উঠতে পারে। সাধনার মাধ্যমে সচ্চরিত্রবান হতে নিজেকে প্রত্যয়ী হতে হবে। বাস্তবজীবনে মানুষ নানা প্রয়োজনে তাড়িত হয়। কিন্তু প্রলোভনে পড়লে মানুষ তার অমূল্য সম্পদ চরিত্রকে হারাতে পারে। তাই চরিত্রকে মজবুত করতে হলে নিজেকে সকল প্রলোভনের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। দৃঢ় মনোবল নিয়ে তাকে সকল লোভ মোহ ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে সে সচ্চরিত্র গঠনে সফল হবে বলে আশা করা যায়।

চরিত্র গঠনে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সঙ্গীদের প্রভাব : মানবচরিত্র গঠনে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের গুরবত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি যেরূ প পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করে, সাধারণত তার চরিত্র সেভাবেই গঠিত হয়। সেজন্য সে যাতে পরিবারের বাইরে কুসংসর্গে মিশতে না পারে অথবা কুকার্যে লিপ্ত হতে না পারে, সেদিকেও অভিভাবকদের লৰ রাখা উচিত। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের ৰেত্রে তাকে অন্যের সান্নিধ্য গ্রহণ করতে হয়, বন্ধু নির্বাচন করতে হয়। সৎ চরিত্রের প্রভাবে মানুষের পশুপ্রবৃত্তি ঘুচে যায়, জন্ম নেয় সৎ, সুন্দর ও মহৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা। আবার সঙ্গদোষে মানুষ কুসংসর্গে পড়ে নিজের অজ্ঞাতে পাপের পথে পরিচালিত হয়। তাই সঙ্গ নির্বাচনে আমাদের সতর্ক হতে হবে।

মহৎ চরিত্রের দৃষ্টান্ত : পৃথিবীতে যারা স্বীয় কর্মবলে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা সবাই ছিলেন চরিত্রবান ও আদর্শ মানব। আদর্শ মহাপুরবষ হযরত মুহম্মদ (সা.), মহামানব হযরত ঈসা (আ.) বা আধুনিককালের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজী মুহম্মদ মুহসীন, জগদীশ চন্দ্র বসু, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহাপুরবষ চরিত্রবলেই জগতে অসাধ্য কর্মকে সহজতর করেছেন, অসম্ভবকে সম্ভবপর করেছেন। তাই প্রত্যেক চরিত্রবান ব্যক্তির চরিত্রে একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। তাঁদের অনমনীয় সেই ব্যক্তিত্ব দিয়ে তারা চারপাশের বিপন্ন পরিবেশকে সুস্থ করেছেন।

সমাজে চরিত্রবান ব্যক্তির অবস্থান : চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম। স্বাস্থ্য, অর্থ এবং বিদ্যাকে আমরা মানবজীবনের অপরিহার্য উপাদান বিবেচনা করি। কিন্তু জীবনৰেত্রে এগুলোর যতই অবদান থাকুক না কেন, এককভাবে এগুলোর কোনোটিই মানুষকে সর্বোত্তম মানুষে পরিণত করতে সৰম নয়। কারণ, সমৃদ্ধিময় জীবনের জন্য চরিত্র প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তি চরিত্রবান না হলে সকলে তাকে অত্যন্ত নীচু মানসিকতার লোক মনে করে।

চরিত্র গঠনের গুরবত্ব : প্রকৃত মানুষ হতে হলে অনেক সাধনা করতে হয়। তাই এ সাধনা বা প্রয়াসের প্রথম পদৰেপ হলো তার চরিত্র গঠনের সাধনা। চরিত্র গঠনের গুরবত্ব এতই ব্যাপক যে, জীবনের যাবতীয় সফলতার পূর্বশর্ত হিসেবেই একে বিবেচনা করা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে সুখী, সফল, আত্মপ্রত্যয়ী এবং জয়ী হওয়ার জন্য চরিত্রের প্রয়োজন। সামাজিক জীবনে প্রভাবশালী এবং বরণীয় হওয়ার জন্য ভালো চরিত্রের প্রয়োজন। ভালো চরিত্রের প্রয়োজন আন্তর্জাতিক জীবনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য।

উপসংহার : সমাজে ভালো চরিত্রের অবস্থান অনেক ওপরে। প্রাচুর্যের বিনিময়ে সেই চরিত্রকে কেনা যায় না। ধনসম্পত্তির অভাবে মানুষ অতৃপ্ত থাকতে পারে, কিন্তু যার চরিত্র প্রকৃত অর্থে সচ্চরিত্রের গুণ লাভ করেছে সে চিরপূর্ণ ও চিরতৃপ্ত মানুষ। নশ্বর এই পৃথিবীতে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির সার্থকতা রয়েছে চরিত্রবান মানুষের ভালো কাজের মধ্যে। চরিত্র মাধুর্য মানুষকে অনন্যতা দান করে। চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজের শ্রেষ্ঠ অলংকার। মানবজীবনে চরিত্রর মতো বড় অলংকার আর নেই। তাই আমাদের সকলকেই চরিত্রবান হওয়ার সাধনা করতে হবে।

২৪ সংবাদপত্র

[চ. বো. ১৩, য. বো. ১২]

ভূমিকা : বর্তমানে সংবাদপত্র মানুষের অপরিহার্য সঙ্গী। প্রতিদিনের সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনা, বিরহ–ব্যথার বার্তা বহন করে সংবাদপত্র। প্রতিদিন সারা বিশ্বের বার্তাসহ সংবাদপত্র আমাদের দ্বারে দ্বারে উপনীত হয় বলে, মানবজীবনের সঙ্গে সংবাদপত্রের এত বেশি সম্পৃক্ততা। সংবাদপত্র হলো সারা বিশ্বের একটা দর্পণস্বরূ প। বিশ্বের কোথায় কী ঘটছে এক পলকে তা ভেসে ওঠে আমাদের চোখের সামনে সংবাদপত্রের মাধ্যমে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বহু দল ও মতের ধারক–বাহক হিসেবে সংবাদপত্র সরকার ও জনগণের মধ্যে রচনা করে সেতুবন্ধ।

সংবাদপত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : সংবাদপত্র সর্বপ্রথম কোথায় উৎপত্তি হয়েছিল তার সঠিক তথ্য অজানা। তবে ধারণা করা হয়, চীন দেশে সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের সূচনা ঘটে। পাশ্চাত্য দেশগুলোর মধ্যে সম্ভবত ইতালি প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করে। তবে চীনেই প্রথম কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল শাসনামলে রাজ্য পরিচালনার সুবিধার্থে হস্তলিখিত সংবাদপত্রের প্রচলন ঘটেছিল। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে সংবাদপত্র জগতে অভাবনীয় পরিবর্তন আসে।

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাস : বাংলাদেশে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে 'বেঙ্গল গেজেট' নামে সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের জন্য সংবাদপত্রের প্রচলন করা হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন' ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। বাঙালি পরিচালিত প্রথম পত্রিকা 'সাপ্তাহিক গেজেট' গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৩১ সালে সাপ্তাহিক এবং ১৮৩৯ সালে দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রের প্রকাশিত বিষয়সমূহ : সংবাদপত্রে বিশ্বের খবরাখবরের পাশাপাশি রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক পরিস্থিতি প্রভৃতি নিয়ে নিয়মিত ফিচার, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। চিঠিপত্র, ব্যবসা–বাণিজ্যের হালচাল, শেয়ারবাজার,

নানা বিজ্ঞাপনও সংবাদপত্রে সন্নিবেশিত হয়। এছাড়া আজকাল বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন, ফটো ফিচার সংবাদপত্রে নতুন মাত্রা এনেছে। নিয়মিত খবরাখবর পরিবেশনের পাশাপাশি বর্তমানে সংবাদপত্রগুলোতে থাকে নানা সাপ্তাহিক আয়োজন।

আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব : আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব পরিলৰিত হচ্ছে। সংবাদপত্র একদিকে যেমন জাতীয় তেমনি আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশন করছে। ফলে এর মাধ্যমে জনগণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা তথ্যের সাথে পরিচিত হয়। আবার এর সম্পাদকীয় মন্তব্য তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এভাবে জনগণ নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়। ফলে জনমত গঠনের সুযোগ পাওয়া যায়। সুষ্ঠুভাবে গণতন্ত্র পরিচালনায় সংবাদপত্র গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে জনসাধারণ রাষ্ট্রের নীতি ও কর্মপন্থার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে, আবার সংগঠনমূলক আলোচনা করার সুযোগও পায়।

বাংলাদেশের সংবাদপত্র : বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮০০-এর বেশি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাক, প্রথম আলো, যুগান্তর, সমকাল, দৈনিক ইনকিলাব, সংবাদ, জনকণ্ঠ, আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, দিনকাল, মানবজমিন, যায়যায়দিন, নয়াদিগন্ত, বাংলাদেশ অবজারভার, মর্নিং নিউজ ইত্যাদি পত্রিকা এবং বেগম, বিচিত্রা, আনন্দভুবন, আনন্দ আলো, সচিত্র বাংলাদেশ, রোববার, সপ্তাহের বাংলাদেশ, অনন্যা, অন্যদিন, আনন্দধারা ইত্যাদি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা বিশেষ উলেরযোগ্য।

জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের গুরবত্ব : একটি জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে সংবাদপত্র গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সংবাদপত্র মানুষকে বিশ্ব-পরিস্থিতি ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে আধুনিক যোগ্য নাগরিকে পরিণত করে। দেশ-দেশান্তরের রাজনীতি-অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়কসংক্রান্ত আলোচনা তার চিন্তার বিকাশ ঘটিয়ে সৃষ্টিশীল কাজে উদ্বুদ্ধ করে। অশিৰিত, অসচেতন মানুষের দেশে গণতন্ত্র কখনও সফল হতে পারে না। সংবাদপত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভালোমন্দ দিক বিশেরষিত ও আলোচিত হয়, যা দেশের নাগরিককে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বা পছন্দের রাজনৈতিক দল বেছে নিতে সহায়তা করে। সংবাদপত্র দেশে নানা নীতিনির্ধারণী বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে; সে সম্পর্কে বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের মতামত প্রকাশ করে। সরকার ও বিরোধী দলের ভালোমন্দ কাজ নিয়ে সমালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা দেখেছি আমাদের ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংবাদপত্র কি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। উলিরখিত প্রতিটি ৰেত্রেই সংবাদপত্রসমূহ জনমত গড়ে তুলে এ দেশবাসীকে নানা আন্দোলনে সক্রিয় করে তুলেছে।

সংবাদপত্রের ৰতিকর দিক : সংবাদপত্রের মধ্যে মহত্তর সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ জনসেবার মহৎ উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে সংবাদপত্রের পরিচালকবৃন্দ ও সাংবাদিকগণ দলগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির মানসে সংবাদপত্রকে কখনো কখনো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। জাতীয় জীবনে এর প্রভাব তখন মারাত্মক হয়ে ওঠে। আবার দেশের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা, কোন্দল ও বিদ্বেষের ভাব, নানা রূ প কুৎসা ও মিথ্যা রটনার জন্য অনেক ৰেত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীন সংবাদপত্রই দায়ী। ক্ষুদ্র তুচ্ছ স্বার্থ সাধনের বশবর্তী হয়ে সাংবাদিকগণ যখন বিবেক বিসর্জন দেয়। তখন সংবাদপত্র জনসাধারণের অকল্যাণের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়? স্বার্থবুদ্ধির ফলে সাংবাদিকরা মিথ্যাচার করলে এর পরিণাম কী ভয়াবহ হতে পারে তা অনুমান করা যায় না।

উপসংহার : বর্তমানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে সংবাদপত্র গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে আধুনিক যুগে স্যাটেলাইট, টিভি, ইন্টারনেট প্রভৃতি সংবাদপত্রের প্রতি যোগী হয়ে উঠেছে। আজ যে ঘটনা ঘটছে তা মুহূর্তেই মানুষ জানতে পারছে বিবিসি কিংবা অন্য কোনো সংবাদমাধ্যমে, যা খবরের কাগজে পাওয়া যায় পরের দিন। তাই বলে ইলেকট্রনিক মিডিয়া সংবাদপত্রের জন্য হুমকিস্বরূ প তা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। বরং এগুলো প্রায়ই সংবাদপত্রের সহায়করূ পে কাজ করে। তাই আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শীর্ষে অবস্থানকারী দেশগুলোতে সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা বরং তুলনামূলকভাবে বেশি। সংবাদপত্র সচেতন মানুষ গড়ার কাজে একনিষ্ঠ থাকে, সুবিধাবাদী মানুষের হাতিয়ারে পরিণত না হয় তাহলে এর প্রয়োজন কখনও শেষ হবে না।

২৫ দেশ ভ্রমণ

ভূমিকা : মানুষ জন্মসূত্রেই স্বাধীনচেতা। মানুষ সীমাবদ্ধ গন্ডির বাইরে গিয়ে অজানাকে জানতে চায়। এ পৃথিবীতে প্রকৃতির অফুরন্ত সম্ভার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, বন-বনানী সৌন্দর্যের অপরূ প ডালি সাজিয়ে রেখেছে এ পৃথিবীতে। মানুষ অসীম আগ্রহ আর অনন্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে এ নৈসর্গিক দৃশ্যকে অবলোকন করার জন্য দেশ ভ্রমণে ছুটে চলছে। এ যেন এক দুরন্ত নেশা। এর মাঝে যে রোমাঞ্চ রয়েছে তার স্বাদই আলাদা। জীবনের আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগের জন্য, জীবন ও জগৎকে জানার জন্য, দেশে দেশে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দেশ ভ্রমণ অপরিহার্য।

প্রাচীনকালে দেশ ভ্রমণ : ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রাচীনকাল থেকেই দেশভ্রমণের অস্তিত্ব লৰণীয়। প্রাচীনকালে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল না। সমুদ্রপথে তখন পাল তোলা জাহাজ চলত আর স্থলপথে ঘোড়ায় চড়ে অথবা পায়ে হেঁটে দেশ ভ্রমণ করতে হতো। প্রাচীনকালে আকাশপথে চলাচলের কথা মানুষ ভাবতেও পারত না। এ সকল দিক বিবেচনা করলে অনুধাবন করা যায় যে, প্রাচীনকালে দেশ ভ্রমণ অনেক কষ্টসাধ্য ছিল। একমাত্র দুঃসাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু সাহসীরাই দেশ ভ্রমণ করে জ্ঞানার্জন করেছেন।

আধুনিককালে দেশ ভ্রমণ : দেশ ভ্রমণের জন্য আধুনিক যুগ মানুষকে অত্যন্ত সুবিধা এনে দিয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে জল, স্থল ও আকাশপথে মানুষ স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারে। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মানুষ পাড়ি দিতে পারে হাজার হাজার মাইল পথ। তাই দেশ ভ্রমণ এখন আনন্দদায়ক ও আরামদায়ক। ফলে আধুনিককালে দেশ ভ্রমণের গন্ডি হয়েছে প্রসারিত। প্রতিদিনই মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য ও জ্ঞানার্জনের জন্য ছুটে যাচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। শুধু সৌন্দর্য উপভোগের জন্য হাজার হাজার মানুষ সুদূর ইউরোপ থেকে ছুটে আসছে ভারতীয় উপমহাদেশে। অবলোকন করছে তাজমহল, উপভোগ করছে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের অপার সৌন্দর্য। আবার এশিয়া থেকেও মানুষ ইউরোপ অমেরিকাসহ পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা : পৃথিবীতে অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদায়ের বাস। এ জাতিগুলো পৃথিবীর সর্বত্র বিৰিপ্তভাবে বাস করছে। এমন বহু জাতি আছে, যাদের সঙ্গে দৈহিক বর্ণ, আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি প্রভৃতিতে আমাদের কোনো মিল নেই। দেশ-ভ্রমণ ব্যতিরেকে আমরা তাদের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে পারি না। শুধু গ্রন্থ পাঠ করেই আমরা যথাযথ ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক জ্ঞান অর্জন করতে পারি না। এ সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য দেশ ভ্রমণ আবশ্যক। কবি, শিল্পী ও চিত্রকরগণেরও কর্তব্য দেশ ভ্রমণ করে নানা দেশের প্রাকৃতিক রূ পবৈচিত্র্য সম্বন্ধে প্রত্যৰ জ্ঞান লাভ করা। এতে তাঁরা নিজে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন। দেশ পর্যটনের ফলে ভূগোলতত্ত্ব ও ভূবিদ্যা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা যায়।

প্রাচীনকাল হতে বহু পর্যটক, ভূতত্ত্ববিদ নানা দেশ ভ্রমণ করে ঐ সকল দেশ সম্বন্ধে নানা কথা লিপিবদ্ধ করে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়েন, ইবনে বতুতা প্রভৃতি বিখ্যাত পর্যটক সেকালের ভারত পরিভ্রমণ করে যে সকল মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, সেগুলো ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে বিভিন্ন জনপদ, দুস্তর মরুভূমি দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ, গভীর অরণ্য পর্যটন করেছেন বলে আমরা জগতের বহু তথ্য জানতে পেরেছি।

দেশ ভ্রমণের উপায় : অতীতের তুলনায় বর্তমানে দেশ ভ্রমণ সহজ, তবে ব্যয়সাপেক্ষ। প্রচুর পরিমাণ অর্থ থাকলে পৃথিবীর ঐতিহাসিক স্থানগুলো সহজেই দেখে আসা যায়। কিন্তু এ অর্থ জোগাড় করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। দেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বে আর একটি জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। তাহলো বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা। আগেকার দিনে দেশ ভ্রমণের জন্য কোনো পাসপোর্ট ভিসার দরকার হতো না। বিশ্ব বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, হিউয়েন সাঙ, ফাহিয়েন প্রমুখ ব্যক্তিগণ দেশের পর দেশ মুক্ত বিহঙ্গের মতো চষে বেড়িয়েছেন। যেসব দেশে তাঁরা গিয়েছেন সেসব দেশের মানুষের কাছে তাঁরা প্রচুর সমাদর পেয়েছেন। আজকের বিশ্বে বেড়ানোর সুবিধা হয়তো আছে, কিন্তু সেকালের মানুষের মতো প্রাণের অমন অফুরন্ত ভান্ডার আজ নেই। আজকাল বাইসাইকেলে করেও অনেকে বিশ্বভ্রমণ করছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, ইবনে বতুতা কিংবা হিউয়েন সায়ের সুযোগ্য উত্তরসূরিরা বসে নেই।

দেশ ভ্রমণের উপকারিতা : দেশ ভ্রমণ করলে আমাদের অনেক উপকার হয়। দেশ ভ্রমণ করলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, কার্যদক্ষতা বাড়ে এবং মনের সংকীর্ণতা দূর হয়। যারা কূপমন্ডূক, তারা আপনার গৃহ সীমার বাইরে গমন করে না; ফলে তাদের জ্ঞান প্রসারিত হয় না, হৃদয় সংকীর্ণ ও অনুদার থাকে। পক্ষান্তরে, নানা দেশ ভ্রমণ করলে বহুদর্শিতা লাভ করা যায়। বহুদর্শিতা থাকলে সাহস বৃদ্ধি পায় এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে সে কার্যে সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারি।

দেশ পর্যটনের ফলে আমরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের কৌশল ও তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত হতে পারি। কোন্ দেশে কোন্ দ্রব্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, কোন্ দেশে কোন্ দ্রব্যের চাহিদা বেশি দেশ ভ্রমণের ফলে তা বিশেষভাবে জানা যায়। দেশ পর্যটনের ফলে এ সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে।

দেশ ভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ : শিক্ষার সত্যিকারের বিষয় জীবন ও প্রকৃতি। প্রকৃতির অফুরন্ত পাঠশালা থেকে পাঠ গ্রহণ করতে হলে মানুষকে অবশ্যই ঘর থেকে বেরোতে হয়। বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ আঙিনা কিংবা নিজস্ব গন্ডির বাইরেও রয়েছে বিরাট পৃথিবী। বৈচিত্র্যময় এ অনন্ত পৃথিবী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে মানুষের জ্ঞান পূর্ণ হয় না। এ সুন্দর ভুবনের নানা স্থানে রয়েছে যে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, অসংখ্য জনপদে ছড়িয়ে আছে যে বিচিত্র পরিবেশ, বহুমাত্রিক জীবন তা নিজের চোখে না দেখলে অভিজ্ঞতার ঝুলি কখনোই পূর্ণ হয় না। মানুষের জ্ঞানইন্দ্রিয় প্রধানত দুটি– চোখ এবং কান। চোখ দিয়ে আমরা দেখি আর কান দিয়ে শুনি। দেখা ও শোনা ছাড়া শিক্ষা বা জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া কখনো সম্পূর্ণ হয় না। একমাত্র ভ্রমণই আমাদের জন্য এ দুর্লভ সুযোগ এনে দিতে পারে। তাই ভ্রমণ শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এজন্য ইউরোপ এবং আমেরিকায় ভ্রমণকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপসংহার : প্রযুক্তির উৎকর্ষতার ফলে আধুনিককালে রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীনকালের ন্যায় দেশ পর্যটনে অধিক অর্থ বা সময় ব্যয় হয় না, কষ্টও করতে হয় অনেক কম। আজকাল আমরা অনায়াসে পৃথিবীর যেকোনো অংশ ভ্রমণ করে এর প্রাকৃতিক রূপ-বৈচিত্র্য দর্শন করে অভিজ্ঞতা ও আনন্দ লাভ করতে পারি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশভ্রমণের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। তা হলে ছাত্র-ছাত্রীগণ নানা দেশ ভ্রমণ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারবে।

২৬ কুটিরশিল্প

[য. বো. ১১]

ভূমিকা : কুটিরশিল্প বাংলাদেশের গৌরব ও ঐতিহ্যের পরিচায়ক। যখন কলকারখানা তৈরি হয়নি বা ভারী যন্ত্রপাতি ছিল না তখন কুটিরশিল্প আমাদের জাতীয় জীবনের নানা অভাব দূর করত। মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুই তখন নিজ হাতে তৈরি করত। অতি প্রাচীনকালেই কুটিরশিল্প লাভ করেছিল বিশ্বখ্যাতি। আজ বাংলার সেই স্বর্ণময় গৌরবের দিন ইতিহাসের দূস্তরতায় হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে ঢাকাই-মসলিন। বাংলার কৃষিজীবনে ভাঙনের কারণে ভাঙন ধরেছে কুটিরশিল্পেও। কুটিরশিল্পী এখন তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে ক্লান্ত-প্রাণ, হতোদ্যম।

কুটিরশিল্প কী : 'কুটির' শব্দের অর্থ পত্র নির্মিত ছোট ঘর আর 'শিল্প' অর্থ গৃহকার্যে ব্যবহার্য সুন্দর সামগ্রী। কুটিরশিল্প বলতে মূলত বোঝায় পরিবারভিত্তিক বা পরিবারের ক্ষুদ্রাকার ও সামান্য মূলধনবিশিষ্ট শিল্প-কারখানা। এর উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রধানত স্থানীয় কাঁচামাল এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কারিগরি দক্ষতা ও সহজ দেশজ প্রযুক্তিনির্ভর দ্রব্যাদি। কুটিরশিল্প গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই বিদ্যমান।

কুটিরশিল্পের বৈশিষ্ট্য : কুটিরশিল্পের কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এতে অল্প খরচে দ্রব্য উৎপাদন করা যায় বলে পুঁজি কম লাগে এবং খরচ কম বলে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যও কম। তাছাড়া ঘরে বসেই কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করা যায়। কুটিরশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে শিল্পপ্রতিভার ছাপ মেলে। শিল্পীর স্বহস্তে তৈরি দ্রব্য দেখতে সুন্দর এবং টেকেও বেশি দিন।

কুটিরশিল্পের পরিচিতি : কুটিরশিল্পের পরিচয় বিস্তৃত। ঘরে বসে বোনা তাঁতের কাপড়, মাটির হাঁড়ি-পাতিল, পিতলের বাসন-কোসন, বাঁশ বেত, খেলনার জিনিস, সোনা-রুপার গয়না, সুতি শিল্প, শীতল পাটি, মোড়া, চাটাই ইত্যাদি সামগ্রী আমাদের উলেরখযোগ্য কুটিরশিল্প। আমাদের কুটিরশিল্পের মধ্যে এক সময় মসলিন কাপড় ছিল বিশ্ববিখ্যাত।

নিচে আমাদের উলেরখযোগ্য কুটিরশিল্পের পরিচয় তুলে ধরা হলো :

তাঁত শিল্প : ঢাকার মসলিন কাপড়ের একসময় দুনিয়াজোড়া খ্যাতি ছিল। বর্তমানেও আমাদের দেশের তাঁতিরা লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি, গেঞ্জি, বিছানার চাদর, মশারির কাপড় প্রভৃতি উৎপাদন করে থাকে। তাছাড়া পাবনা ও টাঙ্গাইলের শাড়ি, মিরপুরের জামদানি, কুষ্টিয়া ও রাজশাহীর সিল্ক গুণগত মানের দিক থেকে খুবই উন্নত।

মৃৎশিল্প : তাঁতশিল্পের পরেই আমাদের দেশে মৃৎশিল্পের অবস্থান। এ দেশের গ্রামের মানুষ এখনো মাটির তৈরি হাঁড়ি, পাতিল, বাস-কোসন, কলস ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। আগে শৌখিন দালান, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতিতে টেরাকোটার কাজ খুব চোখে পড়ত। এখন টেরাকোটা বিলুপ্তপ্রায়। বর্তমানে মাটির তৈরি গৃহসজ্জার সামগ্রী ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ঢাকা, কুষ্টিয়া, খুলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় মৃৎশিল্পের ব্যাপক সুনাম রয়েছে।

বাঁশ ও বেতশিল্প : সিলেটের বেতের চেয়ার, সোফা, শীতল পাটি ও অন্যান্য হস্তশিল্প আমাদের দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়। বাঁশের তৈরি গৃহস্থালি সামগ্রী ছাড়া গ্রামীণ জীবন অচল। তাছাড়া বাঁশ দিয়ে আরও নানা ধরনের কুটিরশিল্পজাত সামগ্রী তৈরি করা হয়।

ধাতুশিল্প : তামা, কাঁসা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু দিয়ে নিত্যব্যবহার্য, হাঁড়ি, পাতিল, জগ, গ্লাস প্রভৃতি তৈরি করা হয় আমাদের দেশে। পিতলের ধাতু

দিয়ে তৈরি গৃহসজ্জামূলক জিনিসগুলো এখানো জনপ্রিয়তা হারায়নি। এগুলোর গুণগত মান ভালো।

চামড়াশিল্প : বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের মধ্যে চামড়াশিল্প বিশেষভাবে উলেরখযোগ্য। চামড়ার তৈরি জুতা, সুটকেস, হ্যান্ডব্যাগ প্রভৃতি উলেরখযোগ্য। শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও এ সকল পণ্যের সমান চাহিদা রয়েছে।

অন্যান্য কুটিরশিল্প : বাংলাদেশে অন্যান্য কুটিরশিল্পজাত পণ্যের মধ্যে নকশিকাঁথা, ঝিনুকের তৈরি সামগ্রী, চুড়ি, পুতুল প্রভৃতি উলেরখযোগ্য।

কুটিরশিল্পের সোনালি অতীত : এ দেশের কুটিরশিল্পের অতীত ইতিহাস গৌরবময়। ইউরোপে আঠারো শতকে শিল্পবিপরবের আগে কুটিরশিল্পই ছিল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তি। এ দেশে ইংরেজদের আগমনের আগে কুটিরশিল্প যে বাজার ও সুনাম অর্জন করেছিল তা ইতিহাসে স্বীকৃত। ঢাকাই মসলিনের সুনাম ছিল পৃথিবীজোড়া। আজকের দিনে তা স্মৃতি হয়ে আছে।

কুটিরশিল্পের বর্তমান অবস্থা : আঠারো শতক থেকে শুরব হয় ইউরোপে শিল্পবিপরব। দিকে দিকে ঘটল তার কালকারখানা সম্প্রসারণ। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে ৰীণপ্রাণ কুটিরশিল্প অসম প্রতিযোগিতায় পরাজয়ের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিল। রাজনৈতিক চক্রান্ত, হীন ব্যবসায়-বুদ্ধি দিনের পর দিন আমাদের কুটিরশিল্পকে বিধ্বস্ত করেছে। বৃহদায়তন শিল্পের ব্যাপক প্রসারের ফলে কুটিরশিল্পজাত সামগ্রী আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। যন্ত্রের সাহায্যে কম সময়ে বেশি দ্রব্য উৎপাদন করা যায় বলে মূল্যও কম পড়ে। তাছাড়া কারখানায় তৈরি পণ্য নিখুঁত হয়। তার জন্য কারখানায় তৈরি পণ্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সৰম হয়েছে।

কুটিরশিল্পের প্রতিযোগিতা : আমাদের মতো দরিদ্র দেশে কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। কুটিরশিল্প তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য বৃহদায়তন শিল্পের পাশে অস্তিত্ব রৰার অধিকার রাখে। হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি জনসাধারণের যেমন চাহিদা পূরণ করতে পারে তেমনি বিদেশি দ্রব্যাদির আমদানি কমিয়ে স্বনির্ভর হতে পারে। তাছাড়া আমাদের দেশের শ্রমিকের অনুপাতে কলকারখানা কম থাকায় কুটিরশিল্প প্রসারে দেশের বেকার নারী-পুরবষের কর্মসংস্থানের পথ সুগম হবে। তাই দেশের আর্থিক সংকট দূর করতে হলে আমাদের কুটিরশিল্পের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

কুটিরশিল্পকে বাঁচানোর জন্য গৃহীত পদৰেপ : কুটিরশিল্পের উপযোগিতা বিবেচনা করে কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয় উৎকর্ষ সাধানের জন্য ইতোমধ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদৰেপ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থার কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্রায়তন ও বৈচিত্র্যময় কুটিরশিল্পের উন্নয়নের লৰ্যে কারিগরদের প্রশিৰণ দান, উৎপাদন প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন, বাজার ব্যবস্থাপনা, মূলধন সরবরাহ ইত্যাদি ৰেত্রে গুরবত্বপূর্ণ পদৰেপ নেওয়া হয়েছে। তবে এৰেত্রে আরও একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে শুধু কুটিরশিল্পের পুনরবজ্জীবনই সব নয়, প্রয়োজন পণ্য-বৈচিত্র্য ও উৎপাদন-উৎকর্ষের সাধনা।

উপসংহার : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কুটিরশিল্প গুরবত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সৰম। ইতোমধ্যে আমাদের কুটিরশিল্প বিশ্ববাজারে কৌতূহলী ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। তাছাড়া জনবহুল বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানের ৰেত্রেও কুটিরশিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কুটিরশিল্পের সঙ্গে আমাদের লাখ লাখ দরিদ্র জনগণের ভাগ্য জড়িত। তাই কুটিরশিল্পের গৌরবময় ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে পারলেই আমাদের অর্থনীতিতে বৈপরবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব। এ জন্য দরকার সরকার ও জনগণের সম্মিলিত ঐকান্তিক চেষ্টা। মোট কথা, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেৰাপটে দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্য পরিবর্তনে কুটিরশিল্পের প্রয়োজন ও গুরবত্ব অপরিসীম।

২৭ খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা

[য. বো. ১৪, চ. বো. ১২, সি. বো. ১২]

ভূমিকা : মানুষ চায় সকল একঘেয়েমি দূর করে জীবনকে আনন্দে ভরে তুলতে। খেলাধুলা এৰেত্রে উৎকৃষ্ট নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। সুস্থ দেহেই বাস করে সুস্থ মন। আর দেহকে সুস্থ ও সুঠামরূ পে গড়ে তোলার জন্য খেলাধুলার বিকল্প নেই। খেলাধুলা থেকে যে নির্মল বিনোদন লাভ হয় তা মানসিক প্রফুল্লতার পথকে প্রশস্ত করে। এর ফলে মানুষ বলবান ও উদ্যমী হয় এবং যেকোনো কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য অফুরন্ত প্রেরণা খুঁজে পায়।

খেলাধুলার উদ্ভব : প্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে সুস্থদেহী, সবল ও কর্মৰম করে রাখার জন্য বিভিন্ন খেলার প্রচলন ছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ বছর আগে থেকে প্রাচীন মিশরের খেলা ছিল ডালকুকুর নিয়ে শিকার। কুস্তি খেলার প্রথম সূচনা হয় ইরাকে, ৪০০০ বছরেরও বেশি আগে। এছাড়া মুষ্টিযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, দৌড়-ঝাঁপ ইত্যাদির ইতিহাসের সূচনাও প্রায় ৪০০০ বছর আগে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশে শারীরিক সামর্থ্য পরীৰার জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়েজিত হতো। খেলাধুলার ইতিহাসে অনন্য ঘটনা খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে প্রাচীন গ্রিসে অলিম্পিক খেলার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে খেলাধুলার জগতে নৌকা চালনা, বক্সিং, স্কেটিং, পোলো, সাঁতার, ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি অসংখ্য খেলার উদ্ভব হয়েছে এবং আরও নতুন নতুন খেলা উদ্ভাবিত হচ্ছে।

বিভিন্ন বয়সে খেলাধুলা : শিশুকাল থেকেই মানুষ খেলাধুলার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে দৌড়-ঝাঁপ আর বিভিন্ন খেলাধুলার মাধ্যমে শরীরের শ্রমের চাহিদা পূরণ করতে হয়। শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়ার পর নিয়মিত ব্যায়াম ও খেলাধুলা করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, কারণ এটাই শরীর গঠনের প্রকৃষ্ট সময়। কৈশোর থেকে যৌবনে পৌঁছতে পৌঁছতে খেলাধুলার উপকরণ অনেক বদলে যায়।

মানসিক উন্নয়নে খেলাধুলা : মানসিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্যও খেলাধুলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলা ও আনন্দময় পরিবেশে বেড়ে উঠলে শিশুর মন হয় উচ্ছল ও প্রাণবন্ত। মনের সতেজতা ও প্রাণময়তা বৃদ্ধিতে খেলাধুলার ভূমিকা যথেষ্ট। তাই দেখা যায়, শিশুদেরকে পুতুল খেলতে না দিয়ে যদি বয়স্কদের জগতে আবদ্ধ করে রাখা হয় তবে তাদের মানসিক বিকাশ হয় না। বরং তারা অভিমানী, অস্থির ও বদমেজাজি হয়ে ওঠে। খেলাধুলা অনেক ৰেত্রে মানসিক দুশ্চিন্তা লাঘবের উপায়। তাছাড়া দাবা, তাস ইত্যাদি চিন্তামূলক খেলা মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে বিকশিত করে।

শিৰায় খেলাধুলা : ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাশিৰাকে চিত্তাকর্ষক করতে এবং পাঠ্য বিষয়ের প্রচণ্ড চাপ লাঘব করতে শিৰার সাথে সাথে খেলাধুলাকে গুরবত্ব দেওয়া হচ্ছে। দেখা গেছে, ক্লাস করতে করতে শিৰিকা হঠাৎ করে ছাত্রছাত্রীদের ব্যায়াম করার নির্দেশ দিলেন। এতে অঙ্ক কষায় ছাত্রছাত্রীদের একঘেয়েমি কেটে যায়। আধুনিক শিৰাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে টেবিল টেনিস, ব্যায়াম, দাবা, বাস্কেটবল ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা থাকে।

মানব মৈত্রী গঠনে খেলাধুলা : খেলাধুলা দেশে-দেশে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করায়ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। উদাহরণস্বরূ প বলা যায়, ভারত ও পাকিস্তানের কথা। ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট বা হকি উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনে অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের সবচেয়ে বড় সম্মেলন অলিম্পিক গেমস্। এই বিশাল ক্রীড়া সম্মেলনে সারা বিশ্বের প্রায় সব দেশের হাজার হাজার খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের

মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষ উপলব্ধি করেন যে মানবজাতি এক এবং অবিচ্ছিন্ন। অলিম্পিক ছাড়াও বহু খেলার আসর আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি রবায় সহায়তা করে।

স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও রোগ প্রতিরোধে খেলাধুলা : স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উচ্ছল পরমায়ু।" জীবনকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হলে সবার আগে নিজের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হবে। আর সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। শরীরের কোষগুলোর পুষ্টিসাধন, সহজ ও স্বাভাবিক রক্তচালনা, পরিপাক যন্ত্রকে কর্মরম রাখা প্রভৃতির জন্য প্রত্যেকের উচিত প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো শারীরিক খেলায় অংশ নেওয়া বা ব্যায়াম ও শরীরচর্চা করা। একজন সুস্থ সবল নাগরিক তার দেশের ও জাতির জন্য যে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে তা একজন অসুস্থ ও রবগ্ণ নাগরিকের দ্বারা অসম্ভব।

চরিত্র গঠনে খেলাধুলা : খেলাধুলা মানুষের চরিত্র গঠনেও সাহায্য করে। খেলাধুলার নিয়মকানুন মেনে চলতে গিয়ে মানুষ শেখে নিয়মানুবর্তিতা। খেলাধুলা মানুষকে করে সুশৃঙ্খল। দলপতি, কোচ ও রেফারির কথা মেনে চলে, দলপতির অধীনে দলবদ্ধ হয়ে খেলতে গিয়ে খেলোয়াড়রা সকলে মিলেমিশে কাজ করার শিবা পায়। এভাবে যৌথ পরিকল্পনা, যৌথ কাজ ও যৌথ শ্রমের মধ্য দিয়ে মানুষ নৈতিকভাবে সবল হয়ে ওঠে। তাছাড়া সাঁতার, ফুটবল ইত্যাদি খেলা মানুষকে সময় সচেতন করে তোলে। এভাবে খেলাধুলা মানুষের চরিত্রকে আরও উন্নত ও মহৎ করে।

উপসংহার : খেলাধুলায় প্রতিযোগিতার মনোভাব মানুষকে দৃঢ়সংকল্প করে, চলার পথে দেয় সহিষ্ণুতার দীবা, অনমনীয় পৌরবষকে দীপ্ত করে, ছিন্ন করে সংকীর্ণতার আবরণ। জয়ে-পরাজয়ে, সাফল্যে-ব্যর্থতায় সেখানে মানুষ লাভ করে এক সুশৃঙ্খল জীবনবোধ। খেলার মাঠও মানুষের অন্তহীন সাধনার পীঠস্থান। বর্তমানে আমাদের দেশেও সার্বিক প্রগতির জন্য প্রয়োজন দেহ-মনের স্বাভাবিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করা। প্রয়োজন সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া। খেলাধুলার অঙ্গনে নতুন প্রতিভার সাদর আমন্ত্রণ, পরিচর্যা এনে দেবে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তার প্রতিশ্রবতি। তবেই দেশ নবজাগরণের চেতনায় আবার উদ্বুদ্ধ হয়ে ফিরে পাবে তার হৃত গৌরব, পারবে সাফল্যের বিজয়মালা ছিনিয়ে আনতে।

২৮ সততা

ভূমিকা : সততাই শ্রেষ্ঠ নীতি। মানব চরিত্রের অন্যতম একটি মহৎ গুণ হলো সততা। এই গুণ অর্জনের চেষ্টা ও চর্চা একজন মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে মর্যাদা ও গৌরবের শ্রেষ্ঠতম শিখরে। নিষ্ঠার সঙ্গে নিরলস অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার নৈতিক উৎকর্ষতা বাড়িয়ে এই গুণ অর্জন করতে পারে। সততার গুণ না থাকলে কেউ আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সততাই মানব চরিত্রের অলংকার এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

সততা কী : মানবচরিত্রে অনেক সদগুণের সমষ্টিই সততা। সত্যের অনুসারী মানুষের সৎ থাকার প্রবণতার মধ্য দিয়ে সততার প্রকাশ ঘটে। অন্যায়, অবৈধ কাজ না করে ন্যায় ও সত্যের পথে জীবন পরিচালনা করাই সততার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সৎ চিন্তা ও সৎ কাজের মধ্য দিয়েই সততার মহৎ গুণের বিকাশ ঘটে। যারা পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়তে চায় সেই সব মানুষ সততার চর্চা করে সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে।

সততার সুফল : সততার সুফল শতদলের মতো শত ধারায় বিকশিত। জীবনকে সুন্দর, সফল ও সার্থক করে তুলতে হলে সততার বিকল্প নেই। সৎ গুণসম্পন্ন মানুষ কখনও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতে পারে না। সততার অলংকার ছাড়া কোনো মানুষ চরিত্রবান ও মহৎ হতে পারে না। সততার আলোকরশ্মি দেশ সমাজে ছড়িয়ে পড়লে সমাজ থেকে অন্যায়ের কুৎসিত অন্ধকার দূর হয়। সৎ লোক সমাজে সবার বিশ্বাসভাজন হয়ে থাকেন। যে সমাজে এমন বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা যত বেশি সেই সমাজ তত সমৃদ্ধ। সমাজের নেতৃত্ব সততার গুণে গুণান্বিত লোকদের হাতে থাকলে মানুষের জান, মাল, মান, সম্পদ নিরাপদ থাকে। তাই মানুষ চায় তাদের নেতা সৎ, সাহসী ও যোগ্য হোক।

মানুষের নৈতিক উন্নতি এবং মুক্তির বাণী নিয়ে পৃথিবীতে যত ধর্ম এসেছে তার সবগুলোতেই সততা, সত্যবাদিতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ধর্মের মূল কথাই হলো সততা।

সততার প্রভাব : সত্য হলো আলো আর মিথ্যা অন্ধকার। সত্যের আলোর প্রভাবে মিথ্যা দূর হয়। মিথ্যার সাথে জড়িয়ে থাকা পাপও দুর্বল হয়ে পালানোর পথ খুঁজতে থাকে। সততার প্রভাব উপলব্ধি করার জন্য সত্যসাধক হতে হবে। কারণ এর জ্যোতির্ময়তা অজ্ঞ লোকদের চোখে ধরা পড়ে না। কারণ তারা চোখ থাকতেও অন্ধ। তাদেরকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হয়। কিন্তু এর বিপরীতে একজন সৎ লোকের সততার আলো শুধু তাকে নয়, তার সংস্পর্শে আসা অন্যরাও উপকৃত হয়।

সৎ লোকের সততার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অসৎ-মন্দলোক ও জীবনের গতি বদলে যায়।

সত্যের অনুসারী ব্যক্তির চিন্তায়, বিশ্বাসে ও প্রকাশে যে অভিব্যক্তি সেই সততাই মানবজীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চারিত্রিক দিক। এটি দুটি মানবীয় গুণ যাদের মূল্যবোধে ছড়িয়ে আছে, তারা কেবল মানুষ-ই নয়, বলা যায় মহামানুষ। বিশ্বাসের দৃঢ়তায় তারা বলিষ্ঠ, জগতে তাদেরই জয়-জয়কার। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, 'আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করতে পেরেছি যে একমাত্র সততা ও ভালোবাসা দ্বারা পৃথিবীকে জয় করা যায়।'

◆ **মহৎ মানুষের জীবন সততার দৃষ্টান্ত :** মহামানবগণ সত্যের অনুসরণে তাঁদের জীবনের মহান সাধনাকে সফল করেছেন। মহৎ ও বরণীয় মানুষ মাত্রই সততার মূর্ত প্রতীক। সত্যবাদিতার জন্য যেমন তাঁরা লব্য অর্জনে সাফল্যলাভ করেছেন, তেমনি সত্যের বলে বলীয়ান হয়ে তাঁরা প্রবল শত্রবকেও পরাজিত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছেন। সর্বকালের মহামানব, মহাপুরবষ, মানব মুক্তির অগ্রদূত হযরত মুহম্মদ (সা.) সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সমস্ত জীবন নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে কঠোর সাধনা মগ্ন ছিলেন। সত্যের সাধনার বলেই তিনি সবার কাছে আল-আমিন বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত হন। সত্যের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন যিশুখ্রিস্ট। সত্যকে সমুন্নত রাখতে হেমলক বিষপানে জীবন দিতে হয়েছে জ্ঞানপ্রেমিক দার্শনিক সক্রেটিসকে। এমনি করে সত্যের সাধনায় মহাপুরবষগণ জীবনকে যেভাবে গৌরবান্বিত করে গেছেন তেমনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন সততার মহান আদর্শ।

◆ **বর্তমান অবস্থার প্রেবাপটে সততার মূল্যায়ন :** সততা বাস্তব জীবনের একটি মহত্তর দিক হলেও বাস্তব জীবনে বিশেষত দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা যথার্থ মর্যাদা লাভ করতে পারছে না। সততা পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। ফলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিকেই তারা প্রাধান্য দিয়ে নানা রকমের অত্যাচার, অনাচার ও দুর্নীতি করে চলেছে। অসততার প্রতি মানুষের তেমন প্রতিবাদ বা বিরূ পতা দেখা যাচ্ছে না। ফলে ঘরে-বাইরে সর্বত্রই আজ মনুষ্যত্বের দীনতার চিত্র। আমাদের যুবসমাজ প্রতিনিয়ত অবরয়ের দিকে অগ্রসরমান। একদিকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহ, অন্য দিকে অর্থনৈতিক দুর্দশা, শিবাজগতে নৈরাজ্য, সমাজসেবার নামে নিজের স্বার্থ হাসিল এবং স্বেচ্ছাচারিতা যুবসমাজকে বিপথগামী করছে। সমাজে সমাজবিরোধীর যে সম্মান, যে প্রতিপত্তি, সেখানে একজন জ্ঞান, সৎ মানুষের মূল্য তুচ্ছ। সততা সেখানে লাঞ্ছিত, অসহায়। বিবেক সেখানে বিবর্জিত। আজ তাই মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধও গৌণ হয়ে উঠেছে। বস্তুত সমাজের সর্বস্তরে

আজ যে সততা, সত্যবাদিতা ও মূল্যবোধের অভাব, তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া যুবকদের মাঝে প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হচ্ছে।

➧ **আমাদের কর্তব্য :** জীবনকে অবশ্যই সততার মাধুর্যে মণ্ডিত করতে হবে। অন্যায়ের মাধ্যমে বা অবৈধ উপায়ে কেউ যতই বিত্তশালী হোক না কেন তা যে পাপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অসত্যের পরাজয় আসবেই ও ন্যায়ের পথ চির উজ্জ্বল থাকবেই। সৎ ব্যক্তি নৈতিক শক্তির বলে বলীয়ান। পরোপকারই তার জীবনের ব্রত। কখনো সে অন্যের ৰতির চিন্তা করেন না। মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় সততার গুণে। যে সমাজে সত্য ও সততার মূল্যায়ন নেই, সেই সমাজে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সেই সমাজ ক্রমে নানা পাপাচারে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে। সেজন্য সততা ও সত্যবাদিতার অনুশীলন করতে হবে এবং জীবনে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে হবে। বর্তমান অবস্থার প্রেৰাপটে সমাজে আজ সৎ মানুষের প্রয়োজন খুব প্রকট। তাই আমাদের সকলের প্রয়োজন সত্যের সাধনা।

উপসংহার : সততা সুন্দর, সততা মহান। আমাদের চরিত্রকে মহিমান্বিত করার জন্য, জীবনকে সফলতায় ভরে দেওয়ার জন্য সততার চর্চা অপরিহার্য। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সততার পরিচয় দিতে ছোটবেলা থেকেই সৎ থাকার অভ্যাস গঠন করতে হবে। সততার অনুশীলন করতে হবে।

২৯ অধ্যবসায়

[কু. বো. ১৫, চ. বো. ১৫, দি. বো. ১৫, ব. বো. ১৫, রা. বো. ১৪,ঢা. বো. ১৩, সি. বো. ১২]

সূচনা : সকল ৰেত্রেই সফলতা মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু অনেকেই সব কাজে একবারে সফল হয় না। সফলতার জন্য বার বার চেষ্টা করতে হয়। কোনো কাজে সাফল্য লাভের জন্য বারবার এই চেষ্টার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় ছাড়া জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় না। কঠোর অধ্যবসায় ব্যক্তিকে তার কাঙ্ক্ষিত লৰ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। অধ্যবসায়ই হচ্ছে মানবসভ্যতার অগ্রগতির চাবিকাঠি।

অধ্যবসায় কী : অধ্যবসায় শব্দের আভিধানিক অর্থ অবিরাম সাধনা, ক্রমাগত চেষ্টা। কোনো নির্দিষ্ট লৰ্যে পৌঁছানোর জন্য অবিরাম সাধনা বা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াকে বলে অধ্যবসায়। ব্যর্থতায় নিরাশ না হয়ে কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্যের সাথে অভীষ্ট লৰ্যে পৌঁছানোর মধ্যেই অধ্যবসায়ের সার্থকতা নিহিত।

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা : ব্যর্থতাই সফলতার প্রথম সোপান। ব্যর্থতা থেকে সাধনার শুরু, আর সফলতার মাধ্যমে তার শেষ। তাই মানবজীবনে সাধনা বা অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। অধ্যবসায়ী মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। এমনকি অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করতে পারে। তাই মানবজীবনে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ছাত্রজীবনে অধ্যবসায় : ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কেননা ছাত্রজীবনই ভবিষ্যৎ গড়ার উপযুক্ত সময়। এ সময় ব্যর্থ হলে সম্পূর্ণ মানবজীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যে ছাত্র অধ্যবসায়ী, সাফল্য তার হাতের মুঠোয়। অলস ছাত্র–ছাত্রী মেধাবী হলেও পড়াশোনায় কখনো সফল হতে পারে না। ছাত্রজীবনেই এই সত্য উপলব্ধি করে নিজেকে অধ্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে কবি কালীপ্রসন্ন ঘোষের বিখ্যাত উক্তি :

পারিব না একথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার,
একবার না পারিলে দেখ শতবার।

অধ্যবসায় ও প্রতিভা : অধ্যবসায় প্রতিভার চেয়ে অনেক বড়। অধ্যবসায়ের জোরেই নিজেকে প্রতিভাবান হিসেবে সকলের মাঝে তুলে ধরা যায়। মনীষী ভল্‌তেয়ারের ভাষায়, 'প্রতিভা বলে কোনো কিছু নেই। পরিশ্রম ও সাধনা করে যাও তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।' ডালটন বলেছেন, 'লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে; কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু জানি না।' বিজ্ঞানী নিউটনের উক্তি, 'আমার আবিষ্কার প্রতিভা–প্রসূত নয়, বহু বছরের অধ্যবসায় ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফল।' এ থেকেই বোঝা যায়, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ছাড়া শুধু প্রতিভার কোনো মূল্য নেই। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা অধ্যবসায় দ্বারাই নিজের কাজকে সুসম্পন্ন করে তোলেন। আবার অধ্যবসায়ের দ্বারা অনেকে প্রতিভাবান হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত : পৃথিবীতে যেসব মনীষী সাফল্যের উচ্চ শিখরে অরোহণ করে অমরত্ব লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন অধ্যবসায়ী। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ও ফ্রান্সের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কার্লাইল অধ্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রবার্ট ব্রুস বারবার ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েও যুদ্ধ–জয়ের আশা ও চেষ্টা ত্যাগ করেননি। ষষ্ঠবার পরাজিত হয়ে তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়ে বিশ্রামের সময় দেখতে পেলেন একটি মাকড়সা বারবার কড়িকাঠে সুতা বাঁধার চেষ্টা করছে এবং ব্যর্থ হচ্ছে। এইভাবে ছয়বার ব্যর্থ হয়ে সপ্তমবারে মাকড়সাটি সফল হলো। এই দেখে রবার্ট ব্রুসও সপ্তমবার যুদ্ধ করে ইংরেজদের পরাজিত করেন এবং স্কটল্যান্ডের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। মনীষী কার্লাইল তাঁর লেখা ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি এক বন্ধুকে পড়তে দিয়েছিলেন। বন্ধুর বাড়ির কাজের মহিলা সেটিকে বাজে কাগজ ভেবে পুড়িয়ে ফেলেন। কার্লাইল এতে একটুও দমে যাননি। তিনি আবার চেষ্টা করে বইখানা লিখে বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। সম্রাট নেপোলিয়ান, আব্রাহাম লিংকন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস প্রমুখ মনীষীর জীবনও অধ্যবসায়ের এক বিরাট দৃষ্টান্ত। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অধ্যবসায়ের গুণেই আজ বিশ্ববিখ্যাত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা বাঙালিমাত্রই তাঁদের জন্য গর্বিত।

উপসংহার : সফলতা লাভে অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। অধ্যবসায় হচ্ছে জীবনসংগ্রামের মূল প্রেরণা। এ সংগ্রামে সফলতা ও ব্যর্থতা উভয়ই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে অধ্যবসায়ী মানুষ জীবনের সব ব্যর্থতাকে সাফল্যে পরিণত করতে পারে। ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে চেষ্টা ও অধ্যবসায় চালিয়ে গেলে সাফল্য একসময় ধরা দেবেই। যুগে যুগে এ ধরনের অধ্যবসায়ীরাই অমরত্ব পেয়েছেন।

৩০ শিষ্টাচার

[য. বো. ১১]

ভূমিকা : আচরণে ভদ্রতা ও সুরবচিবোধের যৌক্তিক মিলনের নাম শিষ্টাচার। শিষ্টাচার আমাদের মনের সৌন্দর্যের মহৎ উপস্থাপনা। অন্যকথায় সুন্দর আচরণ বা ব্যবহারই হলো শিষ্টাচার। সে আচরণ–কথাবার্তায়, কাজকর্মে, চলনে–বলনে, রীতিনীতিতে সর্বোপরি জীবনের প্রতিটি ৰেত্রে। যাকে বলে আদব–কায়দা মেনে চলা বা ভদ্র ব্যবহার ও সৌজন্যবোধ দেখানো; তাই মূলত শিষ্টাচার। বস্তুত সত্যিকারের মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় তার সুন্দর, সংযত ও বিনয়ী ব্যবহার অর্থাৎ, শিষ্টাচার প্রদর্শনে।

মানবজীবনে শিষ্টাচারের গুরবত্ব : দেহের সৌন্দর্য অলংকার কিন্তু আত্মার সৌন্দর্য শিষ্টাচার। মানুষ যত দিন অরণ্যচারী ছিল, তত দিন সে শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ প্রকাশের প্রয়োজনবোধ করেনি। যখন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হলো, তখন থেকে শিষ্টাচার ও ভদ্রতাবোধের প্রয়োজন অনুভূত হয়। শিষ্টাচার শুধু

আমাদের ব্যক্তিজীবনের সৌন্দর্যই নয়, আমাদের সমাজজীবনেরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। শিষ্টাচারের গুণেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যেকোনো সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয়। বড় ও বয়স্কদের সম্মান করা, সকলকে আচরণে তুষ্ট করা, ঔদ্ধত্যকে পরিহার করা এবং সবার সঙ্গে প্রীতিময় সম্পর্ক গড়ে তোলাই মানবিক বৈশিষ্ট্য। মার্জিত রবচি ও সুন্দর মনের পরিচয় দিতে হলে কথাবার্তায় ও আচার-আচরণে আমাদের হওয়া উচিত নম্র ও বিনয়ী। আচরণে যে জাতি যত বেশি সভ্য সে জাতি তত বেশি সুশৃঙ্খল ও উন্নত। কেবল পশুপাখির মতো বেড়ে ওঠাই মানুষের লব্য নয়। আত্মোন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ ও জাতীয় জীবনে কোনো-না-কোনো ভাবে অবদান রাখা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। আর তা করতে হলে শিষ্ট আচরণের অনুশীলন ছাড়া বিকল্প নেই।

ছাত্রজীবনে শিষ্টাচারের গুরবত্ব : ছাত্রজীবন হলো মানুষের প্রস্তুতিপর্ব। এরই ওপর নির্ভর করে সফলতা ও ব্যর্থতা, ভবিষ্যৎ জীবনের গতি-প্রকৃতি। এ সময়ই হলো তার শিষ্টাচারও সৌজন্য শিৰার যথার্থ কাল। শিষ্টাচার ও সৌজন্যের ছোঁয়াতেই ছাত্র হয় বিনীত, ভদ্র। শিষ্টাচার ও সৌজন্য শিৰা তার মনুষ্যত্ব অর্জনেরই সোপান। এরই মধ্যে আছে নিজেকে সুন্দর ও সার্থকতায় পরিপূর্ণ করে তোলার মহাশক্তি। জ্ঞানার্জনে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ আর শৃঙ্খলাবোধের পাশাপাশি শিষ্টাচার অনুশীলন খুবই জরবরি। নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষের জন্য ছাত্রজীবনেই ব্যবহারে ভদ্রতা আর শিষ্টতার সম্মিলন ঘটানোর কোনো বিকল্প নেই। জ্ঞানের সাথে শিষ্টাচারের সম্পর্ক প্রত্যৰ। একজন ছাত্র যদি শিষ্টাচার বর্জিত হয় তবে সে সকলের কাছেই নিগৃহীত হয়। ফলে একদিকে সে যথার্থ শিৰা থেকে যেমন বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে তেমনি ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত হয়। শিষ্টাচার-বিবর্জিত ছাত্র দুর্বিনীত হয়ে থাকে। সে বিভিন্ন ধরনের অন্যায় কাজের সাথে যুক্ত হতে পারে। যা শুধু তার নিজের জন্যই নয় অনেকেরই ৰতির কারণ হতে পারে।

শিষ্টাচার অর্জনের উপায় : মহত্ত্ব মানুষকে উদার করে। মানুষের মাঝে এই মহত্ত্বের পরিশীলিত প্রকাশই শিষ্টতা। সাধারণভাবে চালচলন, কথাবার্তায় যে ভদ্রতা, শালীনতা আর সৌজন্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা-ই শিষ্টতা। আচরণে যদি মানুষ শিষ্ট না হয় ব্যবহারে উগ্রতা যদি পরিহার না করে তবে কখনো শিষ্টাচারী হওয়া সম্ভব নয়। স্বভাবে কৃত্রিমতা পরিহার করতে না পারলে কখনো পবিত্র মনের অধিকারী হওয়া যায় না। ঔদ্ধত্য আর উচ্ছৃঙ্খলতা শিষ্টাচারের কাছে পরাজিত হয়। অহংকার অন্যকে ছোট ভাবতে শেখায়। শিষ্টতা বিপরীতভাবে মানুষকে সম্মান করতে শেখায়। কদর্যতা আর অশরীলতা শিষ্টাচারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। কাজেই শিষ্টাচারী হতে গেলে ব্যক্তিকে হতে হয় আচরণে মার্জিত, বক্তব্যে সৎ, সরল আর স্পষ্ট। বিনয় মানুষকে ছোট করে না, বরং পরায় সম্মানের কুকুট। এই বিনয় শিষ্টতার অঙ্গাভূষণ।

শিষ্টাচারহীন জীবনের কুফল : শিষ্টাচারের গুণেই ব্যক্তি মানুষ হয়ে ওঠে সহজ-সরল, স্পষ্ট, সৎ ও মার্জিত। আজ সমাজের নানা ৰেত্রেই অশিষ্টাচার ও সৌজন্যহীনতার নিষ্ঠুর চিত্র। দিন দিন মানুষের উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়ছে। বাড়ছে তার সীমাহীন ঔদ্ধত্য। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে মানুষে মানুষে বিরোধ। শিষ্টাচারের অভাবে সমাজ অন্তঃসারশূন্য, বিবেকহীন হয়ে পড়ছে। চারদিকে আজ বিত্তবানের নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য, প্রবলের সীমাহীন অত্যাচার। আজ শিষ্টাচার ও সৌজন্য দুর্বলের ভীরৰতারই অসহায় প্রকাশ যেন। দুর্ব্যবহার ও দুর্মুখতাই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের সৌন্দর্য হারিয়ে মানুষ আজ নিঃস্ব, হৃদয়হীন।

উপসংহার : শিষ্টাচার অসংখ্য মানবিক গুণের সমষ্টি। প্রত্যেকেরই এ গুণের অধিকারী হওয়া উচিত। কারণ শিষ্টাচারের গুণের মধ্যে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের কল্যাণ নিহিত। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যদি এ গুণের অধিকারী হয় তাহলে সমাজ ও জাতিকে সভ্যতার শীর্ষে পৌঁছতে খুব কম সময় লাগবে। মানুষ সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। তাই বলা যায়, শিষ্টাচার উন্নত জীবনের সিঁড়ি।

৩১ গ্রন্থাগার

ভূমিকা : শিৰান্বেষী মানুষের কাছে গ্রন্থাগার এক চির-কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান-তীর্থ, সেখানে সে তার মুক্তির সন্ধান পায়। খুঁজে পায় এক দুর্লভ ঐশ্বর্যের খনি। গ্রন্থাগারেই পাঠক সভ্যতার এক শাশ্বত ধারার স্পর্শ পায়, অনুভব করে মহাসমুদ্রের শত শত বছরের হৃদয় কলেরাল, শুনতে পায় জগতের এক মহা ঐকতান ধ্বনি। দেশে দেশে হৃদয়ে হৃদয়ে রচিত হয় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সেতুবন্ধ।

গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা : গ্রন্থাগারের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Library'-এর উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ Liber থেকে। যার অর্থ 'পুস্তক'। Liber শব্দটি এসেছে Libraium শব্দ থেকে। যার অর্থ 'পুস্তক রাখার স্থান'। অ্যাংলো ফ্রেঞ্চ শব্দ Librarie অর্থ হলো পুস্তকের সংগ্রহ। গ্রন্থাগার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে পাঠক-গবেষকদের ব্যবহারের জন্য বই, পত্র-পত্রিকা, পাণ্ডুলিপি, সাময়িকী, জার্নাল ও অন্যান্য তথ্যসামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষিত করে রাখা হয়। প্রাচীনকালে গ্রন্থাগার রাজন্যবর্গ ও অভিজাতগণ ব্যবহার করতেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। সময়ের বিবর্তন, মুদ্রণযন্ত্র ও কাগজ-কালির আবিষ্কার, গ্রন্থের সহজলভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের চর্চা সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে তথ্য ও গ্রন্থাগারের গুরবত্ব অনেক।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস : মুদ্রণ প্রযুক্তি আবিষ্কারের আগে বই-পুস্তক, চিঠিপত্র, দলিলাদি লেখা হতো গাছের পাতা ও বাকল, পাথর, মাটির পাত্র, পশুর চামড়া প্রভৃতির ওপর। এসব উপাত্ত-উপকরণ গ্রন্থাগারে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হতো। মেসোপটেমিয়া বা বর্তমান ইরাক অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রায় ৩০ হাজার পোড়ামাটির ফলক নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, এগুলো প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। মেসোপটেমীয় উপত্যকায় যথাক্রমে সুমেরীয় ব্যাবিলনীয় এবং এশিরীয়রা বসতি গড়ে তোলে এবং সে সময়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করে তারা সভ্যতার অগ্রগতিতে অবদান রাখে।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের ইতিহাস : বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে পুথি-পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের প্রথা ছিল। ১৭৮০ সালে শ্রীরামপুর মিশন মুদ্রিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে। এরপরই কলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পুথি ও মুদ্রিত গ্রন্থের সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়। ১৯২০-এর দশক থেকে গ্রন্থাগার একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে শুরব করে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এখানে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় বেসরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের এক জরিপে দেখা যায় সারা দেশে প্রায় ১,৬০০ বেসরকারি গণগ্রন্থাগার আছে।

গ্রন্থাগারের প্রকারভেদ : গ্রন্থাগার বলতে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের সংগ্রহশালা বোঝায়। এ সংগ্রহ ব্যক্তিগত হতে পারে আবার জনসাধারণ বা রাষ্ট্রেরও হাতে পারে। গ্রন্থাগার তিন প্রকার- ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাধারণ। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যক্তিমনের খেয়ালমতো গড়ে ওঠে। তা হয়ে ওঠে ব্যক্তিমনের প্রতিবিম্ব। ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাই বিশেষ ধরনের গ্রন্থের প্রতি পৰপাতিত্ব থাকা স্বাভাবিক। পারিবারিক গ্রন্থাগার পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রতিচ্ছায়া। দশজনের রবচির দিকে নজর রেখেই এ গ্রন্থাগার সাজাতে হয়। আর সাধারণ গ্রন্থাগার আধুনিক জিনিস। এর গ্রন্থ নির্বাচনে বহুজনের

পছন্দ–অপছন্দকে গুরবত্ব দিতে হয়। তাই এ ধরনের লাইব্রেরিতে গ্রন্থের বৈচিত্র্য ও সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে।

গ্রন্থাগারের গুরবত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : একটি লাইব্রেরির বার্ষিক সভায় পঠিত প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'আমি লাইব্রেরিকে স্কুল–কলেজের ওপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিৰিত হবার সুযোগ পায়। লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়, তার কারণ আমাদের শিৰার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।' গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরবত্ব পর্যায়ক্রমে তা তুলে ধরা হলো।

১. জ্ঞানের সংগ্রহশালা : গ্রন্থাগার হলো জ্ঞান–বিজ্ঞানের সংরৰণাগার। এখানে এসে জ্ঞানপিপাসু মানুষ খুব সহজেই তার পিপাসা মেটাতে পারে। একজন মানুষের পৰে সকল বিষয়ের গ্রন্থ সংগ্রহ এবং সংরৰণ করা কঠিন। মানুষ যাতে সহজেই বই সংগ্রহ করে জ্ঞানার্জন করতে পারে সেজন্যই গড়ে তোলা হয় গ্রন্থাগার।

২. বর্তমান ও ইতিহাসের সেতুবন্ধ : গ্রন্থাগার অনন্তকালের সাৰী। অতীতের ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা, রহস্য, আবিষ্কার সমস্ত কিছুই গ্রন্থাগারে রাখা বইয়ের কাগজে বাঁধা পড়েছে। সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আমরা নির্মাণ করে আমাদের আগামী। এভাবেই লাইব্রেরি অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে যোগসূত্র রচনা করে।

৩. আলোকিত মানুষ গড়ার হাতিয়ার : আলোকিত ব্যক্তি গঠন করতে গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই। গ্রন্থাগারে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যচিত্তে নিজের রবচিমাফিক বই পড়তে পারে। এভাবে মানুষ স্বশিৰিত তথা সুশিৰিত হয়। মানুষের মাঝে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটে। মনুষ্যত্বের উদ্দীপ্ত মানুষেরাই দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর কাজে ব্রতী হয়।

৪. পরিবার গঠনে ভূমিকা : কোনো পরিবারে যদি গ্রন্থাগার থাকে, তাহলে সেই পরিবারের মানুষের চালচলনে এর একটি প্রভাব লক্ষ করা যায়। সন্তানের মানসিক বিকাশের জন্য চাই বই। ভালো মানের বই। সন্তানের অবসর সময় কাটানোর জন্য বই হতে পারে তার ভালো বন্ধু। হাতের কাছে বই থাকলে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছাই হোক সে বই পড়বেই। জানার ক্ষুধা সবারই আছে। ছোটদের মধ্যে নতুনকে জানার ইচ্ছা আরও প্রবল। একটি পারিবারিক গ্রন্থাগার আদর্শ পরিবার গঠনে ভূমিকা রাখে।

৫. চিন্তার জগৎ প্রসারিত হয় : বই পড়লে মানুষের চিন্তার জগৎ প্রসারিত হয়। মানুষ ভালো গুণাবলি আয়ত্ত করার কৌশল শেখে। একজন সৎ মানুষ আরও সৎ হয়। মানুষের সচেতনতা বাড়ে, দায়িত্বশীল ও জ্ঞানী মানুষ হিসেবে সে গড়ে ওঠে। একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার মানুষকে সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

৬. চরিত্র গঠনের ভূমিকা পালন করে : একটি ভালো বই শিৰকের ভূমিকা পালন করে। আদর্শ চরিত্রবান মানুষ তৈরি করতে বইয়ের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। একটা সময় পর মানুষ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় না। কিন্তু গ্রন্থাগারের দুয়ার সব বয়সের মানুষের জন্য খোলা।

৭. সমাজ বিপরবের হাতিয়ার : সমাজ থেকে অজ্ঞতা, কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করতে গ্রন্থাগার বাতিঘরের ভূমিকা পালন করে। আর অজ্ঞতা কুসংস্কার দূর করতে না পারলে সমাজের পরিবর্তন সম্ভব নয়।

৮. দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি করে : আদর্শ চরিত্রবান দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি করতে না পারলে আমাদের স্বাধীনতা অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হবে না। সম্ভব হবে না দেশের প্রতিটি নাগরিকের মুখে হাসি ফোটানো। আর এজন্য শিক্ষিত ও চরিত্রবান নাগরিক তৈরির কোনো বিকল্প নেই। মানুষকে সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দরকার তাদের মাঝে শিক্ষার আলো ব্যাপ্ত করা।

উপসংহার : গ্রন্থাগার জ্ঞান–বিজ্ঞানের তীর্থস্থান। অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এর বিকল্প নেই। তাই এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন প্রতিটি মানুষের জন্যই অপরিহার্য। বর্তমানে জ্ঞান–বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সাথে সাথে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। তরবণ সমাজের একটা বড় অংশ গ্রন্থাগারে নিয়মিত যাতায়াত করছে। আমাদের দেশে শহর ও গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দিকে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে মনোযোগী হতে হবে। তাহলেই আমরা একটি জ্ঞানভিত্তিক আধুনিক সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে যেতে পারব।

৩২ পিতা–মাতার প্রতি কর্তব্য

[ব. বো. ১৩, ঢা. বো. ১০]

ভূমিকা : স্রষ্টার পরেই প্রতিটি মানুষের জন্য তার সৃষ্টির উৎস হলো পিতা–মাতা। তাদের কারণেই আমরা পৃথিবীর আলো–বাতাস গ্রহণ করে বেঁচে থাকতে পারি। পিতা–মাতা ছাড়া আমাদের অস্তিত্বই কল্পনাতীত। তাই পিতা–মাতার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলাই বাহুল্য।

পিতা–মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য : সন্তানের প্রতি পিতা–মাতা যেভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন তেমনি তাদের প্রতিও প্রতিটি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও এ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে– 'তোমরা আলরাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না এবং মাতাপিতার সাথে উত্তম আচরণ কর।' মহানবি হযরত মুহম্মদ (সা.) বলেছেন, 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।' হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে– 'জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরীয়সী'। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে– 'মাতা–পিতার সেবা করাই সবচেয়ে উত্তম।' ধর্মগ্রন্থগুলো সর্বাবস্থায় পিতা–মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশনা প্রদান করে। পিতা–মাতার প্রতি কর্তব্য করা থেকে কখনও বিরত হওয়া উচিত নয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবনের সবচেয়ে বৃহৎ অংশজুড়ে থাকে পিতা–মাতা। কোনো অবস্থাতেই তাদের সাথে অসদাচারণ করা উচিত নয়। পিতা–মাতার মনে কষ্ট দিলে সে অপরাধের কোনো ৰমা হয় না। এ সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন, "আলরাহতায়ালা তার ইচ্ছামতো বান্দার সকল গুনাহ মাফ করে দেন। কিন্তু পিতা–মাতার অবাধ্যতার গুনাহ মাফ করেন না বরং এই গুনাহগারকে পার্থিব জীবনে মৃত্যুর পূর্বেই শাস্তি দিয়ে থাকেন।"

সন্তানের কাছে পিতা–মাতার প্রত্যাশা : প্রত্যেক পিতা–মাতাই সর্বদা তাদের সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। সন্তানকে সুখে রাখতে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেন। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই পিতা–মাতার মনে সন্তানের মঙ্গলের চিন্তা ঠাঁই পেয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সেই বিখ্যাত উক্তিতে– 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে–ভাতে।' পিতা–মাতা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান, তাদেরকে আরাম আয়েশে রাখার সকল ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বিনিময়ে সন্তানের কাছে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করেন না। সন্তানের সুখেই তারা সুখী হন। পিতা–মাতার এসব অবদানের পরিবর্তে তাদের প্রতি সন্তানের কর্তব্য হয়ে ওঠে সীমাহীন। পিতা–মাতার ভালোবাসার কোনো বিনিময় মূল্য হয় না। কিন্তু সন্তানের ভালোবাসা তাদেরকে যে মানসিক প্রশান্তি দিতে পারে তা অমূল্য। তাই পিতা–মাতার প্রত্যাশাকে পূরণ করতে প্রত্যেক সন্তানেরই তৎপর থাকা উচিত।

পিতা–মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের ধরন : সন্তানরা পিতা–মাতার প্রতি নানাভাবে কর্তব্য পালন করতে পারে। তারা যেভাবে পিতা–মাতার প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে তা নিচে তুলে ধরা হলো –

(১) পিতা–মাতার প্রতি অনুগত থাকা : প্রতিটি সন্তানের অন্যতম কর্তব্য হলো পিতা–মাতার প্রতি অনুগত থাকা। কোনো অবস্থাতেই তাদের অবাধ্য হওয়া

উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, পিতা–মাতা কখনো আমাদের খারাপ পরামর্শ দেন না। তাই তাদের কথা অবরে অবরে মেনে চলা উচিত।

(২) পিতা–মাতার ভরণ–পোষণের ব্যবস্থা করা : আমাদের ছোট থেকে বড় করে তোলার পেছনে পিতা–মাতার অবদান অপরিসীম। তারা যেভাবে আমাদের সকল দায়িত্ব নিয়ে বড় করে তোলেন তেমনি আমাদেরও উচিত তাদের ভরণ–পোষণের ব্যবস্থা করা, তাদের সুস্থতা বিধান করা এবং যেকোনো বিপদে–আপদে সাহায্য করা। কোনো অবস্থাতেই পিতা–মাতার দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থাকা যাবে না।

(৩) পিতা–মাতার বৃদ্ধকালীন পরিচর্যা : ছোটবেলায় প্রতিটি শিশু অসহায় থাকে। সে সময় পিতা–মাতা আমাদের আদর–যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন। পিতা–মাতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তারাও তেমনি অসহায় হয়ে পড়েন। এ সময় আমাদেরও উচিত পিতা–মাতাকে আগলে রাখা। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে দোয়া প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে যে, "হে আলরাহ, আমার পিতা–মাতা শৈশবে যেমন স্নেহ–মমতা দিয়ে আমাকে লালন–পালন করেছিলেন, আপনি তাঁদের প্রতি তেমনি সদয় হোন।"

(৪) পিতা–মাতার সন্তুষ্টি বিধান : সর্বাবস্থায় পিতা–মাতার সন্তুষ্টি বিধান করা প্রত্যেক সন্তানের পরম কর্তব্য। তাদেরকে কোনো অবস্থাতেই রাগান্বিত করা যাবে না। পিতা–মাতার মনে কষ্ট দিলে সন্তানের মঙ্গল হয় না। তাই তাদের মনে আঘাত দিয়ে কোনো কথা বলা অনুচিত। সর্বদা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতে হবে।

(৫) পিতা–মাতার দেখানো পথ অনুসরণ করা : পিতা–মাতা আমাদের জীবনে সবচেয়ে উত্তম পথপ্রদর্শক। তাদের দেখানো পথ কখনো ভুল হয় না। তাই সবসময় তাদের কথামতো পথ চলতে হবে যেন সুন্দরভাবে জীবন কাটানো যায়।

মহান ব্যক্তিদের পিতা–মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের দৃষ্টান্ত : এই বিশ্ব চরাচরে যাঁরা মহামানব এবং জ্ঞানী–গুণী ব্যক্তি তাঁরা সকলেই পিতা–মাতার প্রতি অনুগত ছিলেন। হযরত বায়োজিদ বোস্তামি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হযরত আবদুল কাদির জিলানী, হাজি মুহম্মদ মহসীন, জর্জ ওয়াশিংটন, আলেকজান্ডার প্রমুখ ব্যক্তিগণ পিতা–মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমাদেরও উচিত এ সকল মহান ব্যক্তির অনুসৃত পথে চলা এবং পিতা–মাতার প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করা।

উপসংহার : পিতা–মাতা এই পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে থাকেন। তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করলে স্রষ্টার প্রতিই দায়িত্ব পালন করা হয়। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, "যে ব্যক্তি পিতা–মাতাকে পেল, অথচ তাদের সেবা করে বেহেশত লাভ করতে পারল না, সে ধ্বংস হোক।" পিতা–মাতার প্রতি কর্তব্য পালনে কখনো অবহেলা করা ঠিক না। সেদিনই পিতা–মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য পালনের সার্থকতা প্রকাশ পাবে যেদিন সকল বৃদ্ধাশ্রমে তালা ঝুলবে। ইহলোক ও পরলোকের সুখ নিশ্চিত করতে আমাদের সকলকে পিতা–মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

৩৩ শৃঙ্খলা অথবা নিয়মানুবর্তিতা

ভূমিকা : শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতার মাঝেই লুকিয়ে আছে মুক্তি আর সাফল্যের চাবিকাঠি। এই মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে চলছে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়মের ছকে। পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারা নিজ নিজ কবপথে চলছে সুশৃঙ্খলভাবে। এর একটু ব্যত্যয় ঘটলেই শুরব হবে মহাপ্রলয়। শৃঙ্খলা আর নিয়মের সমষ্টিই হলো এই জীবন আর জগতের অস্তিত্ব।

নিয়মানুবর্তিতা কী? মানুষ সামাজিক জীব বিধায় সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে হলে অবশ্যই কিছু নিয়ম–কানুন মেনে চলতে হয়। নিয়মের কারণেই মানুষ সমাজ সৃষ্টি করে একত্রে বসবাস করতে অভ্যস্ত হয়েছে। সমাজজীবনে যেমন ব্যক্তিজীবনেও তেমনি নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন। জগতের প্রতিটি কাজের জন্যই রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম–কানুন। এ নিয়মকেই বলা হয় শৃঙ্খলা। নিয়ম মেনে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করাকেই নিয়মানুবর্তিতা বলে। ব্যক্তির কল্যাণে, জাতির কল্যাণে এবং দেশের কল্যাণে নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন। নিয়মানুবর্তিতা শৃঙ্খলাবোধের জন্ম দেয় এবং মানুষকে কর্তব্য পালনে সচেতন করে তোলে। আমরা যদি বাল্যকাল হতেই নিয়মানুবর্তিতা শিবা লাভ করি, তাহলে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা কষ্টকর নয়।

নিয়মানুবর্তিতা সফলতার সিঁড়ি : একজন মানুষ নিয়মানুবর্তিতার সিঁড়ি বেয়েই সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছতে পারে। আর সত্যিকারের আনন্দ সফলতা ছাড়া আসে না। শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনই আসলে সত্যিকার আনন্দের, উপভোগ্য জীবন। শৃঙ্খলাহীন ও পরিকল্পনাহীন আনন্দ বা বিনোদনের মানে উচ্ছৃঙ্খল জীবন। যার পরিণতি বিষণ্ণতা, একঘেয়েমি, বিরক্তি। শৃঙ্খলা ছাড়া সাফল্য দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। সুশৃঙ্খল জীবনের গুরবত্ব কবির ভাষায়,

'নিয়মের পথ ধরে গড়লে জীবন
সফলতা নিয়ে আসে সুখের স্বপন।
গুণাবলি ফুটে ওঠে ছড়ায় যে খ্যাতি
কতনা সুনাম পায় দেশ ও জাতি।'

প্রকৃতি জগতে শৃঙ্খলা : শৃঙ্খলা প্রাকৃতিক, বিশৃঙ্খলা কৃত্রিম। মহাবিশ্বের সর্বত্র শৃঙ্খলা বিরাজমান। সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহ, নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষপথে চলছে। তাদের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই, কোনো বিরোধ নেই। আমাদের শরীরটাও শৃঙ্খলার বন্ধন মেনে চলছে। যেমন– ফুসফুস, হৃদপিন্ড একই ছন্দে ২৪ ঘণ্টা কাজ করে যাচ্ছে। খাবারের পুষ্টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রক্তের মাধ্যমে কোষে কোষে পৌঁছে যাচ্ছে। পাকস্থলী খাবার হজম করছে। এই কাজগুলোর মধ্যে কোনো বিরতি নেই, বিশৃঙ্খলা নেই, কোনো সিস্টেম লস নেই। একটু অনিময় করলেই শরীর বিদ্রোহ করে। আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

ছাত্রজীবনে নিয়মানুবর্তিতা : ছাত্রজীবন হলো মানবজীবনের ভিত্তি গড়ার সময়। ছাত্রজীবনের শিবার আলোকে একজন মানুষের বাকি জীবন পরিচালিত হয়। কর্মজীবনেও তার প্রভাব থাকে। লেখাপড়ার সাথে সাথে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একজন ছাত্রকে বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। এই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার প্রতি যে ছাত্র যত বেশি নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক থাকে সে ছাত্রজীবনে যেমন সফল হয় কর্মজীবনেও সাফল্যের বিজয়মালা তার গলায় শোভা পায়।

নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গের কারণ : প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে মানুষ ইচ্ছা ও পছন্দের স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নিয়মানুবর্তিতা ভেঙে নিজেই নিজের সর্বনাশ যেভাবে করে তা তুলে ধরা হলো :

১. খেয়ালিপনা : সাময়িক সুখ ভোগের জন্য মানুষ খামখেয়ালিপনার মাধ্যমে বাস্তবতাকে ভুলে থাকতে চায়। কিন্তু এর মাধ্যমে বাস্তবতাকে ভুলে থাকা বা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যেকোনো বিপদ–আপদে ধৈর্যধারণ করে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করলে সাফল্য একদিন আসবেই এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু উদ্দেশ্যহীনতায় ভেসে বেড়ানো কিংবা যা খুশি তাই করার মধ্য দিয়ে একজন মানুষ অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারবে না।

২. পরিকল্পনাহীন জীবন : একটি সুন্দর পরিকল্পনা হচ্ছে যেকোনো কাজ সুন্দরভাবে শেষ করার অর্ধেক। পরিকল্পনা ছাড়া অনেক কাজ হয় তো করা যায়। কিন্তু কাজের ফসল পরিপূর্ণভাবে ঘরে তোলা যায় না। তাই সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। পরিকল্পনাহীন জীবন ব্যর্থতাকেই ডেকে আনে।

৩. সময়ের মূল্য বুঝতে না পারা : এই পৃথিবীতে প্রতিটি কাজের একটি উদ্দেশ্য, একটা কাল ও একটা সময় আছে। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ শেষ করতে হবে তা না হলে শেষে কাঁদলে কাজ হবে না। এই উপলব্ধির অভাবে মানুষ বিশৃঙ্খলভাবে সময় নষ্ট করে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনে।

নিয়মানুবর্তিতার গুরবত্ব : পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন অর্থাৎ জীবনের সব ৰেত্রে নিয়মানুবর্তিতার গুরবত্ব অপরিসীম। কলকারখানা, দোকান, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, সর্বত্রই নিয়মানুবর্তিতা একান্ত প্রয়োজন। নিয়ম-শৃঙ্খলা না থাকলে কোনো প্রতিষ্ঠানই গড়ে উঠতে পারে না। সুশৃঙ্খল নিয়ম জাতিকে উন্নত করে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাব যে, সুশৃঙ্খল নিয়মই তাদের উন্নতির প্রধান কারণ। নিয়মের অভাবের ফলে ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। অনেক ৰেত্রে অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে। তাই মানুষের জীবনে নিয়মানুবর্তিতার গুরবত্ব অপরিসীম।

নিয়মানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনার উপায় :

১. কাজের পরিকল্পনা করতে হবে : গুরবত্ব অনুসারে প্রতিদিনের কাজের তালিকা তৈরি করে সবার আগে সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ কাজটি করতে হবে। ধীরস্থিরভাবে একে একে কাজগুলো শেষ করলে সঠিক সময়ে সঠিক কাজ শেষ হবে। কাজে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

২. আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখা যাবে না : প্রতিদিনই মানুষের কিছু না কিছু কাজ করতে হয়। তাই প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন শেষ করার অভ্যাস করতে হবে। তা না হলে ধীরে ধীরে কাজের বোঝা বেড়ে যাবে। অলসতা ও ভয় ঘিরে ধরে ব্যর্থতাকে ডেকে আনবে।

৩. অলসতা পরিহার করতে হবে : কবির ভাষায়,

'অলস অবোধ যারা
কিছুই পারে না তারা।'

অলস লোকদের জীবনে কোনো শৃঙ্খলা থাকে না। অলসতা আর সফলতা একসাথে থাকতে পারে না। তাই জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনতে হলে অলসতাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

৪. কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে : শুধু অলসতা পরিত্যাগ করলেই হবে না। সাথে সাথে কঠোর পরিশ্রমীও হতে হবে। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাপূর্ণ জীবন অনুশীলন ছাড়া হঠাৎ অর্জন করা যায় না। অনুশীলন কঠোর পরিশ্রমের বিষয়।

৫. অধ্যবসায়ী হতে হবে : অধিকাংশ মানুষের বড় সমস্যা হলো তারা কাজ শুরব করে কিন্তু লেগে থাকতে পারে না। উল্টা-পাল্টা চিন্তা এবং অলসতা তাকে গ্রাস করে। এই জাল ছিন্ন করতে নিজেকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তাহলে সাফল্য একদিন আসবেই।

উপসংহার : কথায় আছে, সাধনায় অসাধ্য লাভ হয়। বিনা সাধনায় কিছুই পাওয়া যায় না। জীবনকে নিয়মানুবর্তিতার ছকে পরিচালনা করার জন্য অবশ্যই কঠোর সাধনা করতে হবে। শাস্তির ভয়ে নয়, সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন গড়ার প্রত্যাশায় আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতায় অভ্যস্ত হতে হবে। শাস্তি দিয়ে সাময়িক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা গেলেও সুযোগ পেলেই মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তখন অতীতের সকল অর্জন রসাতলে যায়। তাই ইতিবাচক বোধ থেকেই উন্নত জীবন গঠন করে মানবসমাজে নিজেকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার চর্চা করতে হবে।

৩৪ ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ

ভূমিকা : মানুষের যোগাযোগে ইন্টারনেট একটি আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা। এই প্রযুক্তির কল্যাণে সারা বিশ্বই চলে এসেছে মানুষের হাতের মুঠোয়। এর সাহায্যে মানুষ উন্নীত হয়েছে এমন এক স্তরে যেখানে সারা বিশ্বের সকল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী একটি সমাজে পরিণত হয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ সময় ও দূরত্বকে কমিয়ে এনেছে। ফলে মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসে যেকোনো জায়গায় যোগাযোগ করতে পারে এর মাধ্যমে। বাংলাদেশেও বর্তমানে ব্যাপকভাবে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরব হয়েছে। এতে দেশের বিভিন্ন ৰেত্রে যোগাযোগে বেড়েছে গতি।

ইন্টারনেটের ধারণা : ইন্টারন্যাশনাল কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সার্ভিস ইন্টারনেট নামে পরিচিত। এটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কসমূহের একটি বিশ্বব্যবস্থা। কেনো নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারের সঙ্গে অন্য নেটওয়ার্কযুক্ত কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলাই ইন্টারনেটের কাজ। বিভিন্ন নেটওয়ার্ক একত্র হয়ে পৃথিবীব্যাপী যে নেটওয়ার্ক সিস্টেম তৈরি হয় তাকেই ইন্টারনেট বলে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্তের কম্পিউটার থেকে অন্য প্রান্তের আরেকটি কম্পিউটারে ছবিসহ যাবতীয় তথ্য দ্রবত সংগ্রহ ও প্রেরণ করা যায়। বিশ্বের লাখ লাখ বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসহ কোটি কোটি লোকের ব্যক্তিগত কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে ইন্টারনেট।

ইন্টারনেটের জন্মকথা : ইন্টারনেটের উদ্ভবের ইতিহাস বেশি দিনের নয়। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরৰা বাহিনী প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহার করে। প্রতিরৰা বিভাগের কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা চারটি কম্পিউটারের মধ্যে গড়ে তোলে প্রথম অভ্যন্তরীণ এক নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা। এ যোগাযোগ ব্যবস্থার নাম ছিল 'ডপার্নেট'। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে 'ডপার্নেটের' নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'অর্পানেট'। ক্রমশ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ১৯৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন সর্বসাধারণের জন্য এ রকম অন্য একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে। এর নাম রাখা হয় 'নেস্ফোনেট'। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে 'নেস্ফোনেট'-এর বিস্তার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে গড়ে ওঠে আরো অনেক ছোট মাঝারি 'নেটওয়ার্ক'। ফলে এ ব্যবস্থাপনায় কিছুটা হলেও অরাজকতা দেখা দেয়। এ অরাজকতা থেকে রৰা পাওয়ার প্রয়োজনেই গড়ে তোলা হয় 'কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক'। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে এ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। বিশ্ববাসী পরিচয় লাভ করে ইন্টারনেট নামক এক বিস্ময়কর ধারণার সঙ্গে।

বাংলাদেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার : সম্প্রতি বাংলাদেশ সম্পৃক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রবাহের সাম্রাজ্য ইন্টারনেটের সঙ্গে। ১৯৯৩ সালের ১১ নভেম্বর বাংলাদেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরব হয়। শুরবরদিকে ইন্টারনেট অফলাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ রৰা ছাড়াও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মেইন সার্ভিস দিয়ে আসছিল। ১৯৯৬ সালের ৪ জুনে VSAT চালুর মাধ্যমে প্রথম অনলাইন ইন্টারনেট চালু করে ISN (Information Service Network), এরপর গ্রামীণ সাইবার নেট BDONLINE, BRAC BDMAIL, PRADESHTA NET, AGNI SYSTEM ইত্যাদি সংস্থাসহ মোট ২২টি সংস্থা বর্তমানে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে কাজ করছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে ইন্টারনেটের ভূমিকা : তরবণ সমাজ দেশের প্রাণ ও ভবিষ্যৎ। এ তরবণ সমাজকে কম্পিউটার ও আইসিটি বিষয়ে শিৰিত করে গড়ে তোলার লৰ্যে ৬৪ জেলার ১২৮টি সরকারি শিৰাপ্রতিষ্ঠানে ১৬টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্টার, ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং ইন্টারনেট সংযোগসহ একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগসহ কৃষি, শিৰা, স্বাস্থ্য, আমদানি-রপ্তানি, সরকারি-বেসরকারিসহ সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হবে অটোমেটিক ডিজিটাল

পদ্ধতিতে। তথ্য প্রযুক্তিসেবায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচন ও ৰমতায়নের লৰ্যে দেশের ৫টি এলাকায় কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কমিউনিটি ই-সেন্টারের উলেৱখযোগ্য সেবাসমূহ হচ্ছে : কম্পিউটার ব্যবহার, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ওয়েবসাইট ব্রাউজিং, কৃষিস্বাস্থ্য ও শিৰাসংক্রান্ত তথ্য, ইন্টারনেট বা অনলাইন ভিডিও কনফারেন্স, কৃষিপণ্যের বাজারসংক্রান্ত তথ্য, চাকরিসংক্রান্ত তথ্য ইন্টারনেট বা অনলাইনে আবেদনপত্র জমা, সরকারি বিভিন্ন ফরম, হজসংক্রান্ত ফরম, জাতীয় পরীৰার ফল, অনলাইনে পণ্য বেচাকেনা, দেশি-বিদেশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিসংক্রান্ত তথ্য, ডিজিটাল ফটো ও ভিডিও এবং শিৰক ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিৰণ। এসব কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারি পর্যায়ে ১৪টি ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র, ২০টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগকেন্দ্র এবং ২১টি মৎস্য তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রসহ সারা দেশে এখন হাজারেরও বেশি অনুরূ প কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বিভাগ, জেলা ও উপজেলার মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য 'গভনেট' প্রকল্প চালু হয়েছে। এর আওতায় মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা ও ৬৪টি উপজেলার মধ্যে নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে সমগ্র বাংলাদেশকে পরিণত করা হবে ডিজিটাল বাংলাদেশে।

ইন্টারনেটের সুফল : ইন্টারনেটের মাধ্যমে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। ইন্টারনেটে নিউজগ্রুপ ব্যবহার করে বিশ্বের খবরাখবর জানা যায়। গবেষণাধর্মী বইয়ের জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাংলাদেশে বসে বিশ্বের যেকোনো লাইব্রেরির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় এবং দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি জানা যায়। এর সাহায্যে এক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কিত লেনদেন সম্পাদন করা যায়। জটিল কোনো মামলার ৰেত্রে আইনের পরামর্শের জন্য বিদেশের আইনজ্ঞদের শরণাপন্ন হয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই যেকোনো পরামর্শ লাভ করা যায়। ভ্রমণের ৰেত্রেও ইন্টারনেট অত্যন্ত সহজ সন্ধান এনে দিয়েছে। অফিসের হাজারো ফাইলের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় ফাইলটি খুঁজে বের করা যায় ইন্টারনেটের 'Archi' পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে। ইন্টারনেটের সুবাদে ঘরে বসেই উন্নত চিকিৎসা লাভ করা যায়। বর্তমানে ব্যাংকেও ইন্টারনেট ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের খেলা, গান শোনা, সিনেমা দেখা, রান্না শেখা, ফ্যাশন সম্পর্কে জানা এমনকি বিয়ের সম্পর্কও করা যায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এভাবেই ইন্টারনেট বিভিন্ন কাজের এক সহজ মাধ্যম হিসেবে সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

ইন্টারনেটের কুফল : সকল জিনিসেরই ভালো খারাপ দুটো দিক রয়েছে। ইন্টারনেটেরও ভালো দিকের পাশাপাশি কিছু খারাপ দিক রয়েছে। এর মাধ্যমে কিছু অসাধু ব্যবহারকারী বা ভোক্তা মিথ্যা তথ্য প্রদান, পর্নোগ্রাফির চিত্র আদান-প্রদান, কিংবা জুয়া খেলার মতো অনুচিত কাজ করে থাকে। কেউ কেউ কম্পিউটারে ভাইরাস তৈরি করে তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে বিশ্বের লাখ লাখ কম্পিউটার ৰতিগ্রস্ত হচ্ছে। ১৯৮৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে 'ইন্টারনেট ওয়ার্ম' নামক ভাইরাস প্রবেশ করিয়ে কয়েক হাজার কম্পিউটার ৰতিগ্রস্ত করে। 'চেরোনোবিল ভাইরাস' ইন্টারনেট ভাইরাস বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে আক্রমণ চালিয়ে সারা বিশ্বে লাখ লাখ কম্পিউটার অকেজো করে দেয়।

উপসংহার : ইন্টারনেট আধুনিক প্রযুক্তির এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এটি বিজ্ঞানের আধুনিক জয়যাত্রায় সৃষ্টি করেছে নতুন মাত্রা। ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহার আজ মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। জীবনকে করেছে স্বাচ্ছন্দ্যময়, পৃথিবীকে করেছে ছোট থেকে ছোটতর। তাই তো ইন্টারনেট এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জয়মাল্য পরিধান করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

৩৫ চিকিৎসা ৰেত্রে বিজ্ঞান

[কু. বো. ১৫, রা. বো. ১২, সি. বো. ১০]

ভূমিকা : মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম। মানুষ তার মেধা ও মননশীলতাকে কাজে লাগিয়ে আবিষ্কার করেছে অনেক কিছু। এ আবিষ্কার আর বিজ্ঞান অন্যান্য ৰেত্রের মতোই মানুষ চিকিৎসা ৰেত্রেও ব্যবহার করে এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রাচীনকালের চিকিৎসা ব্যবস্থা : মানুষের রোগ আরোগ্যের জন্য প্রাচীনকাল থেকেই চিকিৎসা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থায় মানুষ কখনো ঝাড় ফুঁক, গুণীন কিংবা বৈদ্য কবিরাজদের শরণাপন্ন হতো। চিকিৎসার অভাবে তখন কলেরা বসন্ত প্রভৃতির মতো রোগেও শত শত এমনকি হাজার হাজার লোক মারা গিয়ে উজাড় হয়ে যেত গ্রামের পর গ্রাম চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তখন গাছ-গাছড়া, পানি পড়া, ঝাড় ফুঁক প্রভৃতির মাধ্যমে এসব রোগের চিকিৎসা করা হতো।

চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি : ক্রমে ক্রমে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নয়ন ঘটেছে। এৰেত্রে বিজ্ঞানীদের যুগ যুগ ধরে গবেষণার ফসল হলো আজকের আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান। রোগ চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ বর্তমান চিকিৎসায় বেশি গুরবত্ব পাচ্ছে। বিজ্ঞান চিকিৎসার এই দিকটিতে বিরাট সাফল্য বয়ে এনেছে। নানা প্রকার টিকা আর ভ্যাকসিন নানা জটিল ও ভয়াবহ রোগ প্রতিরোধে এখন সাফল্যজনকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যক্ষ্মা, হাম, হুপিংকাশি, বসন্ত, কলেরা, ডিপথেরিয়া আজ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

চিকিৎসা ৰেত্রে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার : আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় নানা আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বিজ্ঞান বিরাট ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে এক্সরে, ইসিজি, এনজিও গ্রাম প্রভৃতির আবিষ্কার মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকেও আশা দেখায়। চিকিৎসা ৰেত্রে বিজ্ঞানের অবদানের ফলে বৈদ্য কবিরাজের চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্তে হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক আর সার্জারির মতো আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছে। বিজ্ঞানের অবদানে পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিন, স্টেপ্টোমাইসিন ইত্যাদি কঠিন সব ব্যাধির ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে।

রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞান : চিকিৎসার ৰেত্রে রোগ নির্ণয় একটি গুরবত্বপূর্ণ ব্যাপার। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে পারলে সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করে রোগীকে সুস্থ করা যায়। এৰেত্রে বিজ্ঞান অভিনব আবিষ্কারের সাহায্যে রোগ নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করছে। এক্সরে, ইসিজি, সিটিস্ক্যান, মাইক্রোস্কোপ, আলট্রাসনোগ্রাফি, এমআরআই ইত্যাদি যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পরীৰা করে শরীরের রোগ নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে ও মানুষের চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে।

রোগ নিরাময়ে বিজ্ঞান : রোগ নিরাময়ে আধুনিককালে বিজ্ঞান যে সাফল্য অর্জন করেছে তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। আধুনিক শল্য চিকিৎসা বা সার্জারির এখন এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আধুনিক বিশ্বে এখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করাও সম্ভব হচ্ছে।

মানবদেহে হৃৎপিণ্ড, কিডনি প্রভৃতি সংযোজন করা হচ্ছে বর্তমানে। ক্যান্সারজাতীয় ভয়ংকর সব রোগের চিকিৎসাও বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের বদৌলতে। রেডিয়াম ব্যবহার করে বর্তমানে ক্যান্সারের চিকিৎসা করা হচ্ছে রেডিও থেরাপির মাধ্যমে। ল্যাপরোস্কপির মাধ্যমে আধুনিককালে চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। শরীরে ছোট্ট একটি ছিদ্র করে বড় বড় অপারেশন হচ্ছে বর্তমানে। এইডস রোগ কয়েক দিন আগেও ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের সামনে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। কিন্তু অধুনা সেই এইডসেরও ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান জিনের গঠন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে। এটি চিকিৎসা ৰেত্রে বিজ্ঞানের একটি বড় অবদান। বিজ্ঞান চিকিৎসা ৰেত্রে আরও কয়েকটি নতুন

সংযোজন ঘটিয়েছে। কস্‌মেটিক সার্জারির মাধ্যমে মানুষের দেহের অসুন্দর অংশকে বর্তমানে সুন্দর করা সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞান জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা জগৎকে নিয়ে এসেছে এক আধুনিক জগতে। ভবিষ্যতে এর মাধ্যমে বিশ্বে চিকিৎসা জগতে আরো নতুন নতুন ঘটনা আমরা দেখতে পাব। আধুনিক বিজ্ঞান ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে চিকিৎসা জগৎকে অনেক রহস্যের সমাধান করতে দিয়েছে।

উপসংহার : বিজ্ঞানের আশীর্বাদে চিকিৎসা ৰেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। পূর্বে যা চিকিৎসকদের কাছে অসম্ভব ছিল বর্তমানে তা সম্ভব। তাই বিজ্ঞান কোনো একসময় সব ধরনের রোগ ব্যাধিকে পরাজিত করতে সৰম হবে একথা বললে বেশি হবে না। মানুষের গড় আয়ু আজ সারা বিশ্বেই বেড়ে গেছে, কমেছে শিশুমৃত্যু হারসহ নানা জটিল রোগও। তাই এ কথা বলা যায় যে, বিজ্ঞান চিকিৎসা জগৎকে এক উন্নত ও আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

৩৬ বিদ্যুৎ ও আধুনিক জীবন

[য. বো. ১৫, সি. বো. ১৩, কু. বো. ১১, ঢা. বো. ১১]

ভূমিকা : জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব অগ্রগতি ও অবদানে আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের। সব বাধা ও প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে মানুষ অসাধ্যকে সাধন করে চলেছে; তা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের কল্যাণেই। আর সেই বিজ্ঞানের সোনার কাঠি হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে পৌঁছে দিয়েছে উত্তরাধুনিক যুগে এবং জৈব প্রযুক্তির অসীম সম্ভাবনাময় যুগের দ্বারপ্রান্তে। বিদ্যুৎকে ছাড়া সভ্যতার সমস্ত গতি ও প্রযুক্তি নিমেষে থমকে যায়। আর সেই জন্যই বিদ্যুৎকে বলা হয় আধুনিক প্রযুক্তির ধাত্রী।

সভ্যতার অগ্রগতিতে বিদ্যুৎ : আজকের এ সভ্যতার গৌরবদীপ্ত মহিমা একদিনে গড়ে ওঠেনি। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সভ্যতা আজ চরম সীমায় পৌঁছেছে। এ মহিমাদীপ্ত সভ্যতা বিজ্ঞানের দান। আর বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় উপকরণ বিদ্যুৎ হলো বর্তমান সভ্যতার চালিকাশক্তি। বলতে গেলে বর্তমান সভ্যতা বিদ্যুৎশক্তির ওপর নির্ভরশীল। বিদ্যুৎশক্তিকে বাদ দিয়ে আজকের দিনে মানুষের পৰে এক পা-ও চলা সম্ভব নয়। জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রতিটি ৰেত্রে কলকারখানার উৎপাদনের জন্য, ঘরে আলো জ্বালানোর জন্য, গরম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য নিত্যদিনের প্রায় সকল কাজই বিদ্যুতের সাহায্যে হয়ে থাকে।

আধুনিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যুৎ : আধুনিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের মূলে বিদ্যুতের ভূমিকা অনন্য। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে রয়েছে বিদ্যুতের অপরিহার্য ব্যবহার। সুইচ টিপলেই জ্বলে ওঠে আলো। সে আলোর এমনই শক্তি যে স্টেডিয়ামে রাতের বেলায় ফুটবল-ক্রিকেট খেলা যায়। প্রচণ্ড গরমে স্বাচ্ছন্দ্য আনে বৈদ্যুতিক পাখা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ শীতল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে ঘরবাড়িতে, গাড়িতে, ট্রেনে, বাসে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় টেলিফোন, টেলিগ্রাফের মাধ্যমে বিপরবের সূচনা করেছে বিদ্যুৎ। তারই সর্বাধুনিক উদ্ভাবন ই-মেইল, যা মুহূর্তেই পৃথিবীর অপর বিভিন্ন সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছে। বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষ খাবার সংরৰণ করতে পারছে ফ্রিজে। শুনতে পারছে বেতার অনুষ্ঠান। মানুষের বিনোদন চাহিদা মেটাতেও গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বিদ্যুৎ। রিমোট টিপেই মানুষ ঘরে বসে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারছে। বিশ্ব চলে এসেছে মানুষের হাতের মুঠোয়। এভাবে আধুনিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের ৰেত্রে বিদ্যুৎ রাখছে অসামান্য অবদান।

শিল্পোৎপাদনে বিদ্যুৎ : দেশে দেশে আজ স্বল্প খরচে উৎপাদিত বিদ্যুৎকে কাজে লাগানো হচ্ছে শিল্পোৎপাদনে। বিশাল বিশাল সব যন্ত্রদানব আজ বিদ্যুৎশক্তির বলে পরিণত হয়েছে মানুষের ক্রীতদাসে। বৈদ্যুতিক তথা ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ঢেলে সাজানো হচ্ছে সারা বিশ্বের উৎপাদন-ব্যবস্থা। এর ফলে শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বহু গুণে বেড়েছে। বিদ্যুতের সাহায্যেই গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক বিমান ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প। বিশালাকৃতি যেসব জাহাজ সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে, যেসব ডুবোজাহাজ সমুদ্রতলে বিচরণ করছে সেগুলো চলছে বিদ্যুৎশক্তিতে। সভ্যতার পুরোভাগে যন্ত্রশিল্প যত বিকশিত হচ্ছে বিদ্যুতের ব্যবহারও ততই বাড়ছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিদ্যুতের অবদান : আজ মানুষের আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে তা সম্ভবপর হয়েছে বিদ্যুতের সাহায্যেই। দেহাভ্যন্তরে কোনো স্থান ব্যধিগ্রস্ত হলে যখন কোনো কিছুতেই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না তখন অনুমাননির্ভর চিকিৎসা না চালিয়ে এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে দেহাভ্যন্তরের ছবি তুলে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব হয়। এছাড়া, বৈদ্যুতিক-রশ্মির সাহায্যে ক্যান্সারের মতো নানা দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসাও করা হচ্ছে। তাছাড়াও রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে ইসিজি, কার্ডিওগ্রাফ ইত্যাদি। এগুলো চিকিৎসা জগতে বিপরব এনেছে। পঙ্গু, অসমর্থ ও মুমূর্ষু মানুষের জীবনে এনেছে আশার আলো।

মহাকাশ অভিযানে বিদ্যুৎ : মহাকাশ অভিযান ও মহাকাশ বিজয়ে মানুষের সমস্ত সাফল্যের মূলে বিদ্যুতের অবদান বিস্ময়কর। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গণনা, নির্ভুল দিকস্থিতি নির্ণয়, পরিমিত তাপমাত্রা সংরৰণ এবং মহাকাশ অভিযানের হুবহু ছবি পৃথিবীতে প্রেরণ ইত্যাদির মতো অকল্পনীয় কাজ এখন বাস্তবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করছে বিদ্যুৎ। গ্রহে-উপগ্রহে বিভিন্ন নভোযান ও স্যাটেলাইট উৎৰেপণও চলছে বিদ্যুতের সাহায্যে। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা নাসা (NASA) সম্পূর্ণভাবে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক প্রযুক্তিনির্ভর। বিদ্যুতের বিস্ময়কে কাজে লাগিয়ে প্রতিনিয়ত তারা আবিষ্কার করছে মহাকাশের অজানা দিগন্তকে।

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ : এতকাল যোগাযোগের ৰেত্রে বিদ্যুতের দুটি অসামান্য অবদান ছিল টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ। এখন তাকেও ছাড়িয়ে গেছে বিদ্যুৎনির্ভর তথ্যপ্রযুক্তি। বর্তমানে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল, মোবাইল ফোন, ফ্যাক্স ইত্যাদি বিদ্যুৎনির্ভর তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষকে পরস্পরের এত কাছে নিয়ে এসেছে যে পৃথিবী পরিণত হয়েছে বিশ্বগ্রামে।

যাতায়াতের ৰেত্রে বিদ্যুৎ : যাতায়াত ব্যবস্থায় অভাবনীয় উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করছে বিদ্যুৎ। বৈদ্যুতিক ট্রেন ও পাতাল রেল দিনকে দিন আয়ত্ত করেছে অভাবনীয় গতি। বুলেট ট্রেন, বিলাসবহুল আরামপ্রদ এয়ারবাস ও সুপারসনিক বিমান পৃথিবীর এপ্রান্ত এবং ওপ্রান্তের দূরত্ব কমিয়ে দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এনেছে বিপরব।

বিদ্যুৎ ও বাংলাদেশ : বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে খুব দ্রবতই এগিয়ে যাচ্ছে দেশটি। এই ধারাকে বহমান রাখতে সবচেয়ে বেশি জরবরি পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ। কিন্তু অধিক জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক মেরবকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিরতাপীড়িত বাংলাদেশের বিদ্যুতের ঘাটতি একটা বড় সমস্যা। এ ঘাটতি সমাধানে কিছু কিছু পদৰেপ নেওয়া হলেও বিদ্যুৎ ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে এবং চাহিদা দিনকে দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে অনুৎপাদনশীল খাতে বিদ্যুতের অপচয়ও একটা বড় সমস্যা। ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ৰেত্রে আমরা পিছিয়ে থাকছি।

উপসংহার : সভ্যতা ও বিদ্যুৎ একে অপরের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিলে তাই অপরটি হয় অর্থহীন ও নিষ্ফল। বিপদসংকুল এ পৃথিবীতে বিদ্যুতের সাহায্যেই মানুষ হয়ে উঠেছে বিপুল শক্তির অধিকারী; জল, স্থল ও অন্তরীৰের অধিপতি।

বিদ্যুতের সাহায্যেই মানুষ এগিয়ে চলেছে কল্পনাতীত বাস্তবে। কিন্তু বিদ্যুতের আশীর্বাদ পৃথিবীর সব শ্রেণির লোক সমানভাবে লাভ করতে পারছে না। এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, বিজ্ঞানের রাজ্যে সবারই এতে সমান অধিকার। তাই বিদ্যুতের সহজলভ্য এবং এর অপরিমেয় শক্তিকে সর্বসাধারণের সেবায় উৎসর্গ করতে হবে।

৩৭ মানবকল্যাণে বিজ্ঞান/প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও আধুনিক সভ্যতা

[রা. বো. ১৫, দি. বো. ১৫, ব. বো. ১৫, সি. বো. ১৪, ঢা. বো. ১৩, য. বো. ১৩, চ. বো. ১৩]

ভূমিকা : মানুষের জীবনে বিজ্ঞান চেতনার দীপশিখা প্রথম জ্বলে উঠেছিল প্রায় দশ হাজার বছর আগে। সে সময় সভ্য মানুষ শুধু প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনে নয়, নিছক জানার বা বোঝার আগ্রহেই নানা বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করতে শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় জীবন আমাদের অসংখ্য বিজ্ঞানের আশীর্বাদে ধন্য। আলো ঝলমল একটা আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞানের অবদান। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের এ সর্বজয়ী স্বরূপটি মানুষই নিরন্তর সাধনায় গড়ে তুলেছে। আদিমকালে জীবনকে আয়েসপূর্ণ, সুখময় ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে মানুষ যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিল, আজকের দিনের বিজ্ঞান তারই সুনিয়ন্ত্রিত এবং বিকাশমান প্রয়াস। তাই বিজ্ঞান আজ শত ধারায় ও শত শাখায় বিস্তৃত।

বিজ্ঞান কী? : বিজ্ঞান অর্থ হলো বিশেষ জ্ঞান। ভৌত বিশ্বে যা কিছু পরীক্ষাযোগ্য ও যাচাইযোগ্য তার সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের নাম বিজ্ঞান। হারবার্ট স্পেন্সারের মতে, 'বিজ্ঞান হলো সংঘবদ্ধ জ্ঞানের সমষ্টি।' বিজ্ঞানী মাদাম কুরী বলেছেন, 'আমার চোখে বিজ্ঞান হলো অনিন্দ্য সুন্দর।'

বিজ্ঞান চেতনার প্রসার : আদিম যুগে গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর মানুষের জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল আগুনের আবিষ্কার এবং কৃষিকাজের প্রচলন। উদ্ভাবিত হয়েছিল আদি কৃষি যন্ত্র লাঙল। পরবর্তীকালে মানুষ শস্য সংরক্ষণ, ফসল থেকে আরও নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী বানাতে শিখল, চাকা ঘুরিয়ে মানুষ বানাতে শুরু করল নানা ধরনের মাটির পাত্র। ইরাকের লোকেরা প্রথম চাকাযুক্ত গাড়ি বানিয়ে পরিবহন ব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তন আনল। পানি তোলার উপযোগী বিশেষ ধরনের পাম্প এবং যন্ত্রচালিত ঘড়ি প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীনদেশে। গ্রিসের লোকেরা প্রথম পৃথিবী ও মহাকাশের মানচিত্র বানায়। এভাবেই মানুষের অদম্য কৌতূহল ও উদ্ভাবনী শক্তি বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়েছে যুগে যুগে।

আধুনিক বিজ্ঞান : সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞান বর্তমানে পূর্ণরূপে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বিজ্ঞানের অসীম শক্তিতে মানুষ আজ প্রকৃতিকে যেন হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। শিল্প জগতে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করল বিজ্ঞান। দ্রুত উৎপাদনের তাগিদে নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় নামে বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানের মহিমায় এখন সব কাজকর্মই হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে। বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে মানুষ উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল নদীর স্রোতকে বশীভূত করেছে। উষর মরু-প্রান্তরকে করেছে জলসিক্ত। ভূগর্ভের সঞ্চিত শস্য সম্ভাবনাকে করেছে উজ্জ্বল। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বলেই মানুষ এখন সমগ্র পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

মানবজীবনে বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক অবদান : বিজ্ঞান পৃথিবীকে শুধু ছোট করেই দেয়নি, একটি বৃহত্তর গেরাবাল ভিলেজে পরিণত করেছে। যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশলসহ জীবনে হাজারো ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। নিচে এর কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান : প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বিজ্ঞানের নানাবিধ আবিষ্কার ও উপকরণ নিয়ে আমাদেরকে চলতে হয়। সকালে ঘড়ি দেখে ঘুম থেকে উঠে যে পেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করি, তা বিজ্ঞানেরই অবদান। তারপর রান্নার চুলায় ভূগর্ভের গ্যাস, খাবারের টেবিলে পুষ্টি নির্দেশক খাদ্য, অফিস গমনে যান্ত্রিক যান, হিসাব করার জন্য ক্যালকুলেটর, দাপ্তরিক কাজে কম্পিউটার, অবসর বিনোদনে বিভিন্ন উপকরণ ইত্যাদি ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন অচল। মোট কথা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

পরিবহন ও যোগাযোগে বিজ্ঞান : আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দিয়েছে অভাবনীয় সুবিধা। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে মানুষের সমান পদচারণ। স্থলপথে দ্রুতগামী গাড়ি, বুলেট ট্রেন, জলপথে জাহাজ, আকাশপথে শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী সুপারসনিক বিমান মানুষ আবিষ্কার করছে। রকেটে চড়ে পাড়ি দিচ্ছে ভিন গ্রহে। মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়ন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থারই ফল।

চিকিৎসা জগতে বিজ্ঞান : চিকিৎসা জগতে বিজ্ঞান এনেছে এক যুগান্তকারী সাফল্য। চিকিৎসাক্ষেত্রে একদিকে প্রতিষেধকের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ হচ্ছে, অন্যদিকে ওষুধ ও শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় করা হচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ভাইরাস তথা রোগ-জীবাণু শনাক্তকরণ দ্বারা তা নির্মূলে কার্যকর উপায় বের করা হয়েছে। উন্নত চিকিৎসাসেবার ফলে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের গড় আয়ু। কম্পিউটারকেন্দ্রিক টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে যেকোনো ব্যক্তি উন্নত দেশের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। এক্সরে, ই.সি.জি, আলট্রাসনোগ্রাম, ইটিটি, এন্ডোস্কপিসহ সূক্ষ্ম রোগ নির্ণয় পদ্ধতিতে মানবদেহের জটিলতম রোগগুলো নির্ণয় করে সহজেই নিরাময় করা হচ্ছে। ব্রেইন সার্জারি ও ওপেন হার্ট সার্জারির মতো জটিল শল্য চিকিৎসায় সাফল্যের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবিষ্কৃত হয়েছে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞান : মানুষের জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ উৎপাদনে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্প কারখানায় কোনো একসময় সমস্ত কাজই হাতে করা হতো। ফলে মানুষের কাজে সময় ও শ্রম লেগেছে বেশি, কিন্তু উৎপাদন হয়েছে ন্যূনতম। বিজ্ঞানের বলে আজ সেসব কাজ যন্ত্র দ্বারা করানো হচ্ছে। ফলে খরচ ও সময় কম ব্যয় হচ্ছে এবং উৎপাদন হচ্ছে অধিক। বিজ্ঞানের বদৌলতে শিল্পবিপ্লবের ফলে আজ বৃহদায়তনের শিল্পকারখানা স্থাপিত হচ্ছে এবং পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান : কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্র শিক্ষাক্ষেত্রে এনে দিয়েছে বিস্ময়কর অগ্রগতি। জ্ঞান ও শিক্ষণীয় কথাবার্তা মুদ্রণ যন্ত্রের কল্যাণে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রচারিত হওয়ায় জ্ঞানের আদান-প্রদান সহজতর হয়েছে। দূরশিক্ষণের মাধ্যমে ঘরে বসেই উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলাফল তৈরি ও প্রচার সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান : আধুনিক বিজ্ঞান কৃষিক্ষেত্রে অশেষ কল্যাণ সাধন করে আসছে। প্রাচীন ভোঁতা লাঙলের পরিবর্তে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে উন্নতমানের কলের লাঙল ও ট্রাক্টর। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ উদ্ভাবিত হয়েছে। গবাদি পশু, মৎস্য, হাঁস, মুরগি পালনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সুফল দিয়েছে। খাদ্যশস্য ও ফলমূল পরিবহন এবং সংরক্ষণে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল প্রয়োগ হচ্ছে। এককথায় কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান মহাবিপ্লব এনে দিয়েছে।

তথ্যপ্রবাহে বিজ্ঞান : বর্তমান যুগ তথ্যবিপ্লবের যুগ। কম্পিউটার, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট সারা পৃথিবীকে একটি অভিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্কে আবদ্ধ করেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে যেকোনো মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে অন্য কারো সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। কম্পিউটারকেন্দ্রিক তথ্যপ্রযুক্তি (Information Technology-IT) জটিল গণনা থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে নির্ভুল গতি। স্যাটেলাইট যোগাযোগের কল্যাণে তাৎক্ষণিকভাবে যেকোনো ঘটনা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে।

মহাশূন্যের গবেষণায় বিজ্ঞান : মানুষের কৌতূহলী মন আজ বিজ্ঞানের বলে মহাশূন্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত হয়েছে। মানুষ চাঁদে, মঙ্গল গ্রহে অভিযান চালিয়েছে। মানুষ বিভিন্ন গ্রহ সম্পর্কে জ্ঞান আরোহণের জন্য মহাশূন্যে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করছে। মহাকাশে পাঠিয়েছে বিভিন্ন উপগ্রহ যান, রোবট ও অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিকস সরঞ্জাম।

আবহাওয়ায় বিজ্ঞান : আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিজ্ঞানীরা মহাকাশে প্রেরণ করছে কৃত্রিম উপগ্রহ। যার ফলে আবহাওয়ার খবরাখবর মুহূর্তের মধ্যেই নির্ভুলভাবে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ এবং অন্যান্য সম্পদের ক্ষতি কম হচ্ছে। তাছাড়া ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে খনিজ ও জলজ সম্পদের এ উৎস সম্পর্কে জানা যাচ্ছে।

বিনোদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান : মানুষকে মানসিক প্রফুল্লতা দানের জন্য বিজ্ঞান দিয়েছে রকমারি উপকরণ। বিজ্ঞান আজ মানুষের বিনোদন সঙ্গী। বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, ভিসিডি, ক্যামেরা, স্যাটেলাইট চ্যানেল, বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্র বিনোদন জগতে এনেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। আজকের দিনে বিজ্ঞানের কল্যাণে গড়ে উঠছে বিশ্ব সংস্কৃতি। আজকের দিনে চলছে আকাশ সংস্কৃতির জোয়ার। যেকোনো অনুষ্ঠান একই সঙ্গে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারে টেলিভিশনের পর্দায়। মুহূর্তের মধ্যেই জনপ্রিয় গান বা সিনেমা পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে ইন্টারনেটের কল্যাণে।

অপকারিতা : বিজ্ঞান কেবল আশীর্বাদই বহন করে আনে না, অভিশাপও বহন করে আনে। এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, ডিনামাইট, বোমারু বিমান, ট্যাংক, বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানবজীবনে বিজ্ঞান আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপেরও কাজ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা কর্তৃক হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমা ও তার ধ্বংসলীলা এর জলন্ত প্রমাণ।

উপসংহার : মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের দান সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের কাছে মানুষ ঋণী। বিজ্ঞানের দানে মানুষ আজ বিশ্বজয়ী। সভ্যতার ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের তুলনা নেই। কিন্তু কতগুলো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের যুগ-যুগান্তরের কীর্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দুই বিশ্বযুদ্ধে বিজ্ঞানের শক্তির ভয়াবহ ধ্বংসলীলা মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে না লাগিয়ে যদি কল্যাণের কাজে প্রয়োগ করা যায়, তাহলেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

৩৮ কম্পিউটার

অথবা, কম্পিউটার বিজ্ঞানের বিস্ময়

সূচনা : যুগে যুগে বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেক অভাবনীয় প্রযুক্তির সাথে মানুষের পরিচয় ঘটেছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো কম্পিউটার। কম্পিউটারের শাব্দিক অর্থ হিসাবকারী যন্ত্র। তবে কেবল যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির মধ্যেই এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে নিতান্ত সাধারণ মানুষের জীবনে কম্পিউটার আজ একটি প্রয়োজনীয় জিনিসে পরিণত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে একক আবিষ্কার হিসেবে কম্পিউটার মানবজীবনকে যতটা প্রভাবিত করেছে, তা বোধ হয় অন্য কিছু পারেনি। কম্পিউটারে অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মস্তিষ্কের অনুকরণ করা হয়েছে। তবে কাজের দ্রুততা, বিশুদ্ধতা এবং নির্ভরশীলতার দিক থেকে কম্পিউটার মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত। আধুনিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিচিত্র ও বহুমুখী সব কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার জীবনকে সহজ করে তুলেছে বহুগুণে।

উদ্ভাবন : কম্পিউটার উদ্ভব ও বিকাশের পেছনে বহু শতাব্দীর সাধনা বিদ্যমান। মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল এই কম্পিউটার। যোগ-বিয়োগ করতে সক্ষম গণনাযন্ত্র প্রথম তৈরি করেন গণিতবিদ ব্লেইজ প্যাসকেল ১৬৪২ সালে। ১৬৭১ সালে গটফ্রাইড লেবনিট্জ প্রথম গুণ ও ভাগের ক্ষমতা সম্পন্ন যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর তৈরি করেন। আধুনিক কম্পিউটার উদ্ভাবনের সূত্রপাত হয় ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ গণিতবিদ চার্লস ব্যাবেজের গণকযন্ত্র অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন থেকে। চার্লস ব্যাবেজকে তাই কম্পিউটারের জনক বলা হয়। প্রথমদিকের কম্পিউটারগুলো আকার ও আয়তনে ছিল বিশাল। কয়েকটি রুমে রাখতে হতো এর যন্ত্রপাতি। পরবর্তীকালে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কার হওয়ায় এর আকার ছোট হয়ে আসে। বর্তমানে হাতের তালুর আকারের কম্পিউটারও বাজারে পাওয়া যায়।

গঠন : একটি কম্পিউটারে অনেক ধরনের যন্ত্রাংশ থাকলেও এর গঠনরীতির প্রধান দুটি দিক লক্ষ করা যায়। একটি হলো যান্ত্রিক সরঞ্জাম বা হার্ডওয়্যার অন্যটি প্রোগ্রাম সম্পর্কিত বা সফটওয়্যার। হার্ডওয়্যারের মধ্যে পড়ে তথ্য সংরক্ষণের স্মৃতি, অভ্যন্তরীণ কার্যের জন্য ব্যবহৃত তাত্ত্বিক দিক, তথ্য সংগ্রহের কাজে ইনপুট অংশ, ফলাফল প্রদর্শনের জন্য আউটপুট অংশ এবং সকল বৈদ্যুতিক বর্তনী। এসব যান্ত্রিক সরঞ্জামের কাজ হলো প্রোগ্রামের সাহায্যে কম্পিউটারকে কর্মক্ষম করে তোলা।

প্রকারভেদ : কম্পিউটারের ভিতরের গঠন আকৃতি, কাজের গতি ইত্যাদি বিচারে এটাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো : ১. সুপার কম্পিউটার, ২. মেইন ফ্রেম কম্পিউটার, ৩. মিনি কম্পিউটার ও ৪. মাইক্রো কম্পিউটার। গঠন ও আকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও এদের মূলনীতিতে বিশেষ পার্থক্য নেই বললেই চলে।

উপকারিতা : বাস্তবিক অর্থে কম্পিউটার পারে না এমন কোনো কাজ নেই। ঘরবাড়ি, অফিস, কলকারখানা সব জায়গাতেই অনেক বড় বড় কাজ নিমেষেই কম্পিউটারে করে নেওয়া যাচ্ছে। এতে অনেক দৈহিক ও মানসিক শ্রম সাশ্রয় হচ্ছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে কম্পিউটার আশীর্বাদরূপে আবির্ভূত হয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার, রোগ নির্ণয় ইত্যাদিতে এর ব্যবহার করা হচ্ছে। নকশা করা, গণনা করা, ছবি আঁকা, লেখা, পড়া, বিনোদন- এককথায় জীবন যাপনের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি কাজেই কম্পিউটার আমাদের নিত্যসঙ্গী। কম্পিউটারে ইটারনেট ব্যাবহার করে মুহূর্তের মধ্যেই আমরা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারছি। এভাবে কম্পিউটার পুরো বিশ্বটাকেই আমাদের হাতের মুঠোয় বন্দি করেছে।

কম্পিউটারের ক্ষতিকর দিক : কম্পিউটারের অসংখ্য উপকারি দিকের পাশাপাশি কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। এক কম্পিউটার একই সাথে অনেক মানুষের কাজ করে দেওয়ায় বেকারত্ব বাড়ছে। তাছাড়া অনেকে কম্পিউটারে কাজের বদলে গেমস খেলে বা অপ্রয়োজনীয় কাজ করে সময় নষ্ট করে। এটি শিশুদেরকে শারীরিক পরিশ্রম ও খেলাধুলা থেকে বিমুখ করছে।

কম্পিউটার ও বাংলাদেশ : যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার একটি অগ্রগণ্য খাত। বাংলাদেশেও কম্পিউটারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যে কারণে পাঠ্যসূচিতে কম্পিউটারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কম্পিউটার ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সরকার এর যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম শুল্ক ধার্য করেছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি স্কুল কলেজে কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ খোলার পরিকল্পনা সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। তাছাড়া কম্পিউটার বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ খোলাসহ আলাদাভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। কম্পিউটারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বিপুল কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেনসহ উন্নত দেশসমূহে দক্ষ কম্পিউটার প্রকৌশলীর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আমেরিকায় সিলিকন ভ্যালিতে প্রচুর বাংলাদেশি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সাফল্যের সাথে কাজ করছেন। বাংলাদেশে কম্পিউটারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হওয়ায় বিরাট বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সফটওয়্যার শিল্প বিদেশে বাজার দখল করতে শুরু করেছে।

উপসংহার : কিছু নেতিবাচক দিক থাকলেও আধুনিক জীবনে কম্পিউটারের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের দিকে বিশেষভাবে মনযোগী হতে হবে। আমাদের তরুণ প্রজন্মকে কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তথ্য প্রযুক্তিকে উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করলে খুব দ্রুতই আমরা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারব।

৩৯ কৃষিকাজে বিজ্ঞান

[রা. বো. ১৪, দি. বো. ১৪, সি. বো. ১১]

সূচনা : মানুষের সবচেয়ে আদি পেশা হলো কৃষি। মানবসভ্যতার ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে কৃষির ক্রমবিবর্তন ধারা। এই পেশায় নিয়োজিতদের কৃষক বলা হয়। কৃষকরা মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা খাদ্যের সরাসরি জোগানদাতা। সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে কৃষিতে যোগ হয়েছে নতুন নতুন পদ্ধতি। এ কথা কারো অজানা নয় সভ্যতার অগ্রগতি আর উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ 'বিশেষ জ্ঞান'। কৃষিতে এই বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োগ না হলে এত দিনে মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেত। কারণ প্রতিদিন মানুষ বাড়ছে, কিন্তু আবাদযোগ্য জমি বাড়ছে না। সময়ের এই দাবি পূরণ বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি ছাড়া সম্ভব নয়।

অধিক ফলনের মূলমন্ত্র : অধিক ফলন, উন্নত জাত উদ্ভাবন, সময়ের সাথে পালরা দিয়ে বৃদ্ধি পাওয়া চাহিদা পূরণ করতে কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত ২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৬১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত চলিরশ বছরে দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। এই বাড়তি সংখ্যার খাদ্যসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়েছে বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতির কারণেই। এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি অধিক ফলনের মূলমন্ত্র।

কৃষিকাজে বিজ্ঞানের পরিধি : বীজ বাছাই, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, রোপণ থেকে শুরু করে মাঝের পরিচর্যা বীজতলা তৈরি এবং ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ই হতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক। উন্নত বিশ্বে কৃষি এখন আর অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কৃষকের হাতের নিয়তির ভাগ্যচক্র কিংবা প্রকৃতির জুয়াখেলার ওপর নির্ভরশীল নয়। কৃষির প্রতিটি পর্যায়েই রয়েছে জ্ঞান, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির স্পর্শ। উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণেও তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেয়। এতে দ্রুত ফসল ভোক্তার কাছে পৌঁছে এবং অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা নিচের উপশিরোনামগুলোতে তুলে ধরা হলো।

মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা : ফসল রোপণের আগে অবশ্যই মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করা অপরিহার্য। মাটির বিভিন্ন ধরনের উপাদান যেমন খনিজ লবণ, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রজেন, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি পরিমাণমতো আছে কি না, তা জানা থাকলে সার প্রয়োগ ও ফসলের জাত নির্ণয়ে সুবিধা হয়। মাটির গুণাগুণ এবং অঞ্চল ভেদে অনুপাতের তারতম্য নির্ণয়ে এখন কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

চাষের জমি তৈরি : ফসল রোপণের আগে হাল-চাষের মাধ্যমে জমি তৈরি করতে হয়। সনাতন পদ্ধতিতে এ কাজে গরু ও কাঠের লাঙল ব্যবহার করা হতো। আধুনিক বিজ্ঞান জমির হাল-চাষের জন্য তৈরি করেছে ট্রাক্টর বা কলের লাঙল। এর মাধ্যমে দিয়ে কম সময়ে বেশি জমি গভীরভাবে কর্ষণ করা যায়। ফলে এতে কৃষকের শ্রম, সময় ও অর্থ যেমন বাঁচে উৎপাদনও বেশি হয়।

সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা : আধুনিক কৃষি আজ আর প্রকৃতির বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল নয়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে সেচ দিয়ে ফসলকে খরার কুপ্রভাব থেকে রক্ষা হয়। বীজ রোপণ, বীজতলা তৈরি, আগাছা পরিষ্কার ও সার-কীটনাশক ছিটানোসহ অন্যান্য পরিচর্যাও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে করলে সনাতন পদ্ধতির চেয়ে বেশি ফলন পাওয়া যায়।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস : কৃষিকাজের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়া অনুকূল হলে অধিক ফসল কৃষকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে। এক্ষেত্রে বর্তমানে কৃষকরা আধুনিক প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল।

জিন গবেষণা : জিনের মধ্যে জীবের বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে থাকে। জিন গবেষণা কৃষি জগতে এক ধরনের বিপ্লব এনে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং প্রয়োজন বুঝে একই প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের আদান-প্রদান করছেন। এতে অল্প জায়গায় অধিক ফসলের পাশাপাশি প্রতিকূল পরিবেশেও ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে।

খামার পরিচালনা : খামার ব্যবস্থাপনার বৈজ্ঞানিক মডেল খুব গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য খরচ, উৎপাদন, কর্মী নির্বাচন, বিপণন, আবহাওয়া, ফসল বাছাই এগুলোর গাণিতিক সূক্ষ্ম হিসাব জানা জরুরি। এজন্য উন্নত বিশ্বে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খামারের প্যারামিটারগুলো হিসাবের জন্য সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

প্রযুক্তি বিনিময় : উন্নত বিশ্বে কৃষকদের মাঝে কম্পিউটারনির্ভর নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টি করা। এজন্য ইন্টারনেটের পাশাপাশি মোবাইল ফোন, ল্যান্ড ফোন, ফ্যাক্স, সিডি, পত্রিকা, বুলেটিন, জার্নাল ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার দরকার। বাংলাদেশেও কয়েকটি মোবাইল অপারেটর ইতোমধ্যেই কৃষি তথ্যসেবা সার্ভিস চালু করেছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা : আমাদের কৃষি এখনও সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। এর অন্যতম কারণগুলো হলো : ১. কম্পিউটার ও প্রযুক্তি শিক্ষার অভাব, ২. পর্যাপ্ত প্রশিক্ষক, যন্ত্রপাতি এবং সংগঠনের অভাব, ৩. ইন্টারনেট ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা, ৪. তথ্যকেন্দ্রের অভাব, ৫. ভাষাগত সমস্যা। কারণ অধিকাংশ তথ্যই থাকে ইংরেজিতে, যা সাধারণভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জটিল।

আমাদের করণীয় : কৃষিপ্রধান অর্থনীতির এই দেশের অবস্থার পরিবর্তন উলিরখিত সমস্যাসমূহের সমাধান ছাড়া সম্ভব নয়। বিশেরষকদের মতে এ জন্য আমাদের করণীয় হলো :

১. কৃষকদের কম্পিউটারের সাধারণ ব্যবহার বিষয়ে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া।

২. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষকদের মধ্যে প্রযুক্তি বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৩. গ্রামে গ্রামে কৃষি তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা।
৪. মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে জটিল তথ্য সহজ করে কৃষকের মাঝে উপস্থাপন করা।
৫. কৃষকের ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য স্থানীয়, এনজিও এবং সরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ নেওয়া।

উপসংহার : বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে। কৃষিই তাদের প্রধান জীবিকা। কৃষকরা চাষাবাদের মাধ্যমেই দেশের উন্নয়নে অবদান রাখে। কিন্তু দুঃখের কথা এখনও এ দেশের কৃষক সম্প্রদায় সেই চিরাচরিত প্রাচীন পদ্ধতিতেই কৃষিকাজ করে চলছেন এবং তাদের জীবনযাত্রা এখনও খুব নিম্নমানের। এর অবসান খুবই জরুরি। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষিকে এগিয়ে নিতে হলে অবশ্যই কৃষিতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়াতে হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। কৃষি বিশেরষকদেরকে মাঠপর্যায়ে কৃষকদের সাথে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলেই আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ সার্বিক উন্নতি লাভ করতে পারব।

৪০ বিশ্ব যোগাযোগে ইন্টারনেটের ভূমিকা

[কু. বো. ১১, ব. বো. ১০]

ভূমিকা : বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে অভাবনীয় উন্নতি, প্রগতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। বিজ্ঞানের যেসব আবিষ্কার মানুষকে সভ্যতার স্বর্ণশিখরে আরোহণ করতে সহায়তা করেছে তার অন্যতম হলো ইন্টারনেট। বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত গতিময়তার এক মাইলফলক এই ইন্টারনেট। বর্তমান বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তির কর্মকাণ্ডকে এটি এমন এক সুতোয় গেঁথেছে যে, সে সুতো ছিঁড়ে গেলে হয়তো সমগ্র বিশ্বব্যবস্থাই অচল হয়ে পড়বে।

ইন্টারনেট কী : ইন্টারনেট হলো ইন্টারন্যাশনাল কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সার্ভিস। অসংখ্য নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত বিশ্বব্যাপী সুবিশাল কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে ইন্টারনেট বলা হয়। অর্থাৎ ইন্টারনেট হলো কম্পিউটারের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক, যাকে ইংরেজিতে বলা যায়- World Wide Electronic Network. ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সব ধরনের কম্পিউটার অতি দ্রুততার সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে।

ইন্টারনেট উদ্ভাবনের ইতিহাস :

ইন্টারনেট উদ্ভাবনের প্রাথমিক কারণ ছিল সামরিক। বিশ্বের দুই পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চরম স্নায়ুযুদ্ধের কারণে দুই পরাশক্তির সমরবিশারদরাই পারমাণবিক বোমার ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাদের সন্দেহ ছিল ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হলে পুরো যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। এজন্য যোগাযোগ মাধ্যমকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার চিন্তায় টেলিফোনের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ইন্টারনেট উদ্ভাবন করা হয়। মার্কিন সামরিক সংস্থা ১৯৬৯ সালে প্রথম ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু করে। তখন এটি পরিচিত ছিল 'MILNET' নামে। এ প্রযুক্তিকে আরও জনকল্যাণমুখী করে তোলার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেওয়া হলে তারা শিক্ষা, গবেষণা এবং তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। তখন শিক্ষাজগতে এর নামকরণ হয় 'অ্যাপারনেট'। পরবর্তীকালে এটি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, যা বর্তমানে ইন্টারনেট নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

ইন্টারনেটের প্রকারভেদ : ব্যবহারকারীরা দুভাবে ইন্টারনেটের গ্রাহক হতে পারে। প্রথমটি হলো অনলাইন ইন্টারনেট। টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে সরাসরি কম্পিউটারে ইন্টারনেটের অন্য যেকোনো সার্ভিস প্রোভাইডারের সঙ্গে যুক্ত করার পদ্ধতিকে অনলাইন ইন্টারনেট বলা হয়। তাতে ব্যবহারকারীরা যেকোনো সময় অন্য যেকোনো প্রোভাইডারের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। এছাড়াও IPACCES পদ্ধতিতে সরাসরি অনলাইন ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় হলো অফলাইন ইন্টারনেট নামে পরিচিত। এ প্রক্রিয়ায় গ্রাহকরা নিকটবর্তী কোনো সার্ভারকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে বলেই এটাকে অফলাইন ইন্টারনেট বলা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে গ্রাহকরা কম খরচে যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের পদ্ধতি : ইন্টারনেটের ব্যবহার পদ্ধতি বিভিন্ন রকম। যেমন, ক. ওয়েব : ওয়েব হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত কম্পিউটারগুলোতে যে তথ্য রাখা হয়েছে সেগুলো ব্যবহারের পদ্ধতি। খ. চ্যাট : চ্যাটের সাহায্যে একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির সাথে কথা বলা যায়। গ. ই-মেইল : এ পদ্ধতি হচ্ছে সংবাদ আদান-প্রদানের এক সহজ ব্যবস্থা। এ পদ্ধতিতে অতিদ্রুত তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব। ঘ. নেট নিউজ : এ পদ্ধতিতে ইন্টারনেটে সংরক্ষিত সংবাদ যেকোনো সময় উন্মুক্ত করা যায়। ঙ. ই-ক্যাশ : ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ই-ক্যাশ পদ্ধতি বলে। চ. আর্কি : আর্কি হচ্ছে নেটওয়ার্ক তথ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি পদ্ধতি, যা তথ্যগুলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সূচি আকারে সমন্বয় করতে সক্ষম।

ইন্টরনেট ব্যবহারের সুফল : ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা নানা রকম কাজ অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে পারি। তবে ইন্টারনেটে একেক রকম কাজ করার জন্য একেক রকম সফ্টওয়্যারের (Software) প্রয়োজন হয়। যেমন Net News protocol-এর মাধ্যমে আমরা অতি সহজে ও দ্রুততার সাথে বিশ্বের যেকোনো দেশের খবরাখবর জানতে পারি। Telenet ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা অতি দ্রুত দেশ-বিদেশের যেকোনো স্থানে অবস্থানরত আপনজনের সাথে কথা বলতে পারি বা যেকোনো ধরনের তথ্য আদান-প্রদান করতে পারি। File transfer protocol ব্যবহার করে আমরা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারের ফাইল আদান-প্রদান করতে পারি। Internet relay chat protocol ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন স্থানে বসে বিভিন্নজনের সাথে গল্পগুজব করতে পারি, আড্ডা দিতে পারি। E-mail ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা তথ্য আদান-প্রদান করতে পারি। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব ধরনের কাজকর্ম থেকে শুরু করে ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা, অফিস-আদালত, গবেষণা-প্রযুক্তি, শিক্ষা-দীক্ষাসহ সব কাজেই ইন্টারনেট ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেটের আশীর্বাদে আমরা ঘরে বসেই এখন বিশ্বের যেকোনো বড় বড় লাইব্রেরির বইপত্র পড়তে পারি, দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি জানতে পারি। এর সাহায্যে এক প্রতিষ্ঠানের সাথে আরেক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কিত লেনদেন সম্পাদন করা যায়। ঘরে বসেই আমরা যেকোনো দেশের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়ে আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি। অর্থাৎ, বর্তমান বিশ্বে আধুনিক জীবনযাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে ইন্টারনেট।

ইন্টারনেটের অপকারিতা : ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের যেমন অসংখ্য সুবিধা বা ভালো দিক রয়েছে, তেমনই কিছু কিছু অসুবিধা বা খারাপ দিকও রয়েছে। যেমন এর মাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া, জুয়া খেলা, বাকমেলিং করা, ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এসবের মাধ্যমে মানুষের বিবিধ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। কিন্তু ইন্টারনেটের এই নেতিবাচক ব্যবহারের বিষয়টি নির্ভর করে

ব্যবহারকারীর ওপর। তাই এর খারাপ দিকের চেয়ে ভালো দিকগুলোই অধিক গ্রহণযোগ্য ও বিশেষভাবে বিবেচ্য।

উপসংহার : উন্নত জীবন ও বিশ্বব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ ইন্টারনেট। বর্তমান বিশ্বের প্রায় কোটি কোটি মানুষ ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো অধিকাংশ মানুষের কাছে ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে যাবে এবং মানুষের জীবন হয়ে উঠবে আরও উন্নত ও সুখী সমৃদ্ধ।

৪১ একটি শীতের সকাল

[চ. বো. ১৩, ব. বো. ১৩, য. বো. ১২, ঢা. বো. ১১, রা. বো. ১০]

ভূমিকা : বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। পালাক্রমে ছয়টি ঋতু এসে বাংলাদেশকে নব নব রূ পে সাজায়। সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে তারা আসে আর যায়। বসন্ত ঋতুর আগে এর আগমন ঘটে। প্রকৃতিকে কুয়াশার চাদরে জড়িয়ে নিতে আবির্ভাব ঘটে শীতকালের। আর শীতের সকাল এক বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করে মানবমনে। এ সময় প্রকৃতি রিক্ততার সন্ন্যাসী রূ প ধারণ করে যেন। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে মানুষের মনে অলসতা ভর করে। চাদর মুড়ি দিয়ে শীতকে দূরে ঠেলার প্রগাঢ় চেষ্টায় লিপ্ত মানুষ বারবার ব্যর্থ হয়। ধরণীর বুকে শীতের আগমন আনে বৈরাগ্যের সুর। এর সাথে সাথে শীতের সকালও একই রূ প পরিগ্রহ করে। তাই বুঝে কবি বলেন–

"হিম হিম শীত শীত
শীত বুড়ি এলো রে,
কনকনে ঠান্ডায়
দম বুঝি গেলো রে।"

শীতকালের বৈশিষ্ট্য : ষড়ঋতুর মধ্যে পঞ্চম ঋতু হলো শীতকাল। পৌষ ও মাঘ এ দুই মাস শীতকালের ব্যাপ্তি থাকে। ইংরেজি বর্ষপঞ্জি অনুসারে মোটামুটি নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীত অনুভূত হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালের বিপরীত অবস্থানে থাকে শীতকাল। বর্তমান সময়ে শীতকালে আবার বৃষ্টি হতেও দেখা যায়। প্রবল শৈত্যপ্রবাহে দেশের উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সাধারণ মানুষের প্রাণহানিও ঘটে।

শীতের সকালের স্বরূ প : কুয়াশার চাদরে মোড়া শীতের সকাল হাড় শীতল করা ঠান্ডা নিয়ে দেখা দেয়। এ সময় এক ফালি রোদ সকলের কাছে বহুল প্রতীবিত হয়ে ওঠে। গ্রাম হোক কিংবা শহর, সব জায়গাতেই শীতের রয়েছে একটি ভিন্ন আমেজ। শীতের সকালে মানুষের মাঝে এক অজানা অলসতা ভর করে। লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকাতেই যেন তখন স্বর্গীয় সুখ অনুভূত হয়। কর্মব্যস্ত মানুষ ঘুমের জগতে হারিয়ে যায়। কুয়াশার অন্ধকারে সূর্যদেবতার দেখা পাওয়া ভার। তাই সকালের উপস্থিতি টের পাওয়াও কষ্টকর। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা শীতকেও দূরে সরিয়ে দেয়। তাই আড়মোড়া ভেঙে উঠতেই হয় সকলকে। নিজেকে তৈরি করে নিতে হয় কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। শীতের সকালে শান্ত প্রকৃতি ভোরের আলো-আঁধারিতে রহস্যময় রূ প ধারণ করে থাকে। তবে ধীরে ধীরে শীতের কুয়াশা কাটতে থাকে। অতঃপর শীতের আকাশে মুচকি হাসি নিয়ে দেখা দেয় রবির কিরণ। এর মধ্যেই শীতের সকালের অপার আনন্দের ছোঁয়া পাওয়া যায়। তাই কবি বলেন–

"ঋতুর দল নাচিয়া চলে
ভরিয়া ডালি ফুল ও ফলে,
নৃত্যলোকে চরণতলে মুক্তি পায় ধরা
ছন্দে মেতে যৌবনেতে রাঙিয়া উঠে জ্বরা।"

শীতের সকালে প্রকৃতি ও প্রাণীর অবস্থা : শীতের সকালে প্রকৃতি ও প্রাণীর মধ্যে এক ভিন্ন আমেজ লৰ করা যায়। শীতের সময় দিন ছোট এবং রাত বড় হয়। সকাল হয়েও যেন হয় না। মানুষ, জীবজন্তু, পাখ-পাখালি শীতের বেলায় সূর্যের প্রত্যাশায় প্রহর গুনতে থাকে। ঠান্ডায় জড়সড় হয়ে থাকতে দেখা যায় সবাইকে। কুয়াশার জালে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে চারদিক। শিশির ঝরতে থাকে অবিরাম। কেবল মানুষই নয়, প্রাণীরাও বাইরে বের হতে চায় না। আড়ষ্ট হয়ে থাকে শীতের প্রকোপে।

গ্রামের প্রকৃতিতে শীতের সকাল : শীতের সকালের প্রকৃত আনন্দ গ্রামীণ জীবনেই খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার গ্রামগুলোতে শীতের সকাল বেশ মনোরম হয়। গ্রামের মাঠে মাঠে শীতের প্রভাব বেশ চোখে পড়ে। শীতের কুয়াশা ভেদ করে নিজ নিজ গৃহপালিত প্রাণীদের নিয়ে বের হয় গ্রামের কর্মঠ মানুষেরা। সূর্যের দেখা পাওয়া মাত্রই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রোদ পোহাতে শুরব করে। গ্রামের মানুষেরা খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে শীতকালে উষ্ণতা খুঁজে ফিরে। আগুনের চারপাশে বসে তারা তাপ পোহাতে থাকে। তবে গ্রামীণজীবনে দারিদ্র্যের উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। বস্ত্রাভাবে দরিদ্র পরিবারের অনেক মানুষের শীতে নাকাল অবস্থা হয়। গ্রামের অনেক প্রবীণ ব্যক্তির প্রাণহানিও ঘটে থাকে শীতের প্রকোপে।

শীতের সকালে গ্রামের সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত হলো পিঠা-পুলি খাওয়ার মুহূর্ত। গাছে গাছে খেজুরের রসের হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায়। সে হাঁড়ি নামালে ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা রস খাওয়ার লোভে ছুটে ছুটে আসে। এ রস দিয়ে নানা রকম পিঠা বানানো হয়। বাড়িতে বাড়িতে মা, চাচি কিংবা দাদিরা সকালবেলাতেই পিঠা তৈরি করতে বসে। অনেকে শীতের ছুটি উপভোগ করতে শহর থেকে ছুটে যায় গ্রামে। শীতের সকালে নানা পিঠা খাওয়ার চিত্রকে তুলে ধরতেই মনে হয় কবি বলেছেন–

"পৌষ মাসে পার্বণে খেতে বসে খুশিতে বিষম পেয়ে
আরও উলরাস বেড়েছে মনে মায়ের বকুনি খেয়ে।"

শহুরে জীবনে শীতের সকাল : শহুরে জীবনে শীতের সকালের রূ প ভিন্ন হয়ে থাকে। গ্রামীণ জীবনের আবেদন এখানে পাওয়া যায় না। ইট-কাঠ-পাথরের শহরে শীতের সকালের আমেজ একদম আলাদা। শহরে দেখা যায় বারান্দায় বসে রোদ পোহানোর দৃশ্য কিংবা গরম চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ার দৃশ্য। লেপ জড়ানো কর্মব্যস্ত মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের পরেও আরও একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়। কিন্তু জীবিকার টানে তকে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতেই হয়। নিজ নিজ কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য গরম কাপড় পরিধান করে প্রস্তুত হতে হয় সকলকে। ঘাসের ওপরে টলমল করতে থাকা শিশির বিন্দু শহরে তেমন একটা দেখা যায় না। খেজুরের রস কিংবা নানা স্বাদের পিঠার সুঘ্রাণ এখানে খুঁজে পাওয়া বিরল। এখানে কেবল কাকের কর্কশ আওয়াজ, যানবাহনের শব্দ এবং মানুষের কোলাহলমিশ্রিত যান্ত্রিক জীবনই দেখা যায়।

উপসংহার : শীতের সকাল অন্য সব ঋতুর চেয়ে একদম আলাদা। শীতের রিক্ততা প্রকৃতির সবুজকে ছিনিয়ে নিলেও দিয়ে যায় ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী বার্তা। কুয়াশার চাদরে ঢাকা গোটা প্রকৃতি শীতকে যে একেবারেই উপভোগ করে না, তা ঠিক নয়। শীতের আবেদন চিরন্তন। হিমঠান্ডার কনকনে অনুভূতি প্রতিটি মানুষকে আলোড়িত করে। তাই শীত চলে গেলেও এর রেশ থেকে যায় এবং প্রকৃতি বসন্তের আগমন হেতু অপেৰমাণ হয়। তাই তো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন–

'এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরি জয়,
যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে লয়।

৪২ বর্ষাকাল

সূচনা : সকাল দুপুর

টাপুর টুপুর
রিম-ঝিমা-ঝিম বৃষ্টি।
আকাশ উপুড়
ঝাপুর ঝুপুর
বন্ধ চোখের দৃষ্টি।

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে বর্ষা আসে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সাজে। গ্রীষ্মের পরই বর্ষার আগমন ঘটে। আষাঢ়-শ্রাবণ এ দুই মাস মিলে বর্ষাকাল। ঋতুবৈচিত্র্যের এই দেশে এ সময় বাংলা লাভ করে এক ভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

বর্ষার আবহাওয়া : বর্ষাকালে আকাশ ঢাকা থাকে কালো মেঘে। মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রকৃতি থেমে থেমে শিউরে ওঠে। ঘন ঘন বৃষ্টি হয়। একটানা কয়েক দিন সূর্যের মুখ দেখা যায় না। প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস বয়। বিদ্যুৎ চমকায়, কখনো প্রবল ঝড় হয়। টানা বর্ষণের ফলে অনেক সময় বন্যা হয়।

বর্ষার প্রকৃতি : বর্ষার আগমনে প্রকৃতি থেকে মুছে যায় গ্রীষ্মের ধূসর ক্লান্তি। গাছপালা যেন প্রাণ ফিরে পায়। মাঠ-ঘাট, খাল-বিল, ডোবা-পুকুর, নদী-নালা পানিতে ডুবে যায়। নদীতে ভেসে চলে পালতোলা নৌকা, ডিঙি আর কলাগাছের ভেলা। জলাবদ্ধতার কারণে অনেক স্থানে লোকজনের চলাচলে খুবই সমস্যা হয়।

বর্ষার ফুল : বর্ষাকালে আমাদের ঝিলে-বিলে ফোটে পদ্ম, শাপলা, কলমিসহ কত ধরনের ফুল। ডাঙায় ফোটে কদম, হিজল, কেয়া, গন্ধরাজ, বেলি ইত্যাদি। বৃষ্টির জলে ভিজে এসব ফুল সজীব হয়ে যায়। মনে হয় চারদিক জুড়ে যেন তখন ফুলের মেলা বসে।

বর্ষার ফল : বর্ষাকালে এ দেশে হরেক জাতের ফল পাওয়া যায়। এর মধ্যে উলেরখযোগ্য হলো– জাম, পেয়ারা, আমড়া, লটকন, আতা, বাতাবি লেবু ইত্যাদি। এসব ফল বর্ষার বৈশিষ্ট্যকে স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরে।

বর্ষার অবদান : গ্রীষ্মের রুরুতার পর বর্ষা যেন নিয়ে আসে প্রাণের স্পন্দন। এ সময় প্রকৃতি যেন ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায়। এ সময় নদীর পানির সাথে আসা পলিমাটি জমির উর্বরতা বাড়ায়। ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

সাহিত্য সংস্কৃতিতে বর্ষার অবদান : বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বর্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্ষা যেমন প্রকৃতিকে করেছে সজীব তেমনি মানুষের মনকেও করেছে সরস। বর্ষার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেক কবি-সাহিত্যিকই রচনা করেছেন গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি। প্রাচীন কবি জয়দেব থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেক কবি সাহিত্যিকই মুগ্ধ হয়েছেন বর্ষার সৌন্দর্যে। বর্ষা যেমন প্রকৃতিকে সিক্ত করেছে রসের ধারায় তেমনি কবিদের সিক্ত করেছে ভাবরসের ধারায়। তাই তো কবিগুরু বলেছেন–

"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বারিষায়।"

উপসংহার : কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে বর্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঋতু। এটি রূ পবৈচিত্র্যে তুলনাহীন। ভালোবাসার উচ্চ স্পর্শে প্রকৃতির মাঝে জাগে প্রাণের স্পন্দন। অতি বৃষ্টির কারণে বন্যা হওয়ার বিষয়টি বাদ দিলে বর্ষাকাল অবশ্যই আমাদের জন্য আশীর্বাদ।

৪৩ আমার দেখা একটি মেলা

অথবা, একটি লোকজ মেলা

সূচনা : মেলা আমাদের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক। আঞ্চলিকভাবে 'মেলা' শব্দের অর্থ হলো 'মিলন'। মেলায় পরিচিতিজনদের সঙ্গে দেখা হয় এবং ভাববিনিময় হয়। একের সঙ্গে অন্যের সংযোগ ঘটে মেলায়। গ্রামীণ মেলাগুলোতে আমাদের লোকজ সংস্কৃতির পসরা বসে। সেই সাথে পাওয়া যায় নির্মল বিনোদনের নানা উপায়।

মেলার প্রচলন : অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে মেলার প্রচলন ছিল। তবে পূর্বে মেলার আয়োজন করা হতো সুনির্দিষ্ট কিছু স্থানে এবং বৃহৎ পরিসরে। বর্তমানে দেশের প্রায় সব স্থানেই মেলা বসে। কোনো কোনোটির আয়োজন অনেক বড়, আবার কোনোটির ক্ষুদ্র। তবে মেলার আনন্দ এখনো আগের মতোই রয়েছে।

মেলার উপলব্য : আমাদের দেশে বেশির ভাগ মেলা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, রথযাত্রা, দোল উৎসব, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উপলরে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের ১০ই মহরমকে কেন্দ্র করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধদের বৌদ্ধপূর্ণিমা উপলরেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া চৈত্রসংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমার দেখা মেলার উপলব্য ছিল পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ।

মেলার স্থান : সাধারণত খোলা কোনো বৃহৎ স্থানে, যেখানে মানুষের চলাচল রয়েছে, তেমন স্থানেই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমি যে মেলাটি দেখেছি, সেটি বসেছিল নদীর ধারের বিশাল একটি বটগাছের নিচে। সেটি আমাদের এলাকার একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান। এখানে প্রায়ই বিভিন্ন উপলরে মেলা বসে।

মেলার প্রস্তুতি : পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙালির সবচেয়ে আনন্দের দিন। এদিনকে উপলব্য করে মেলার প্রস্তুতি ছিল বিশাল। অস্থায়ীভাবে বটগাছের চারদিকে দোকানপাট তৈরি করা হয়। একদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যাত্রাপালার জন্য একটি বড় মঞ্চ তৈরি করা হয়। কিছু মানুষ মূল স্থানে জায়গা না পেয়ে রাস্তার পাশে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে বসার প্রস্তুতি নেয়। মঞ্চের চারদিকে মাইক লাগানো হয়।

মেলার চিত্র : পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষের দিন থেকে মেলা শুরু হয়। মেলা শুরু হতেই এতে প্রচুর লোকসমাগম দেখা যায়। দোকানগুলো ছিল নানা দ্রব্যসামগ্রীতে কানায় কানায় ভরা। মানুষ রঙিন পোশাক পরে মেলায় আসছিল। ছোট ছেলেমেয়েদের চোখেমুখে ছিল আনন্দের ঝিলিক। তারা ভিড় করে মাটির খেলনা, বেলুন, বাঁশি আরও নানা জিনিসের দোকনে। আর নারীরা ভিড় করেন প্রসাধনসামগ্রী ও চুড়ির দোকানে। এ ছাড়া কাপড়ের দোকানেও তাঁদের ভিড় লরু করা যায়। মেলায় ছিল নানা বৈচিত্র্যময় খাবারের আয়োজন। ছোলাভাজা, বাদামভাজা, পাঁপরভাজা, ভুট্টার খই, কনক ধানের খই, মুড়কি, বাতাসা, হাওয়াই মিঠাই ও নানা রকমের মিষ্টি পাওয়া যাচ্ছিল। মেলার একদিকে একটি লোক সাপের খেলা দেখাচ্ছিল। তা দেখতে ভিড় করে অসংখ্য মানুষ। এ ছাড়া ছোটখাটো একটা সার্কাসের আয়োজনও ছিল।

মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যার সময় মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় শিল্পীদের গান পরিবেশনের পর শুরু হয় যাত্রাপালা। মঞ্চে ভেলুয়া সুন্দরীর পালা পরিবেশন করা হয়। ভেলুয়া সুন্দরীর দুঃখগাথা দেখে অনেকেই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এর মাধ্যমেই দিনব্যাপী এই মেলাটর সমাপ্তি টানা হয়।

মেলার তাৎপর্য : এ ধরনের গ্রামীণ মেলায় মানুষের সম্প্রীতির এক বন্ধন তৈরি হয়। স্থানীয়ভাবে তৈরি জিনিসের একটি প্রদর্শনী হয় মেলায়। শহুরে মানুষ তার নিজের শেকড় সম্পর্কে জানতে পারে মেলায় এসে। শুধু তাই নয়, এখানে অর্থনৈতিক বিষয়ও যুক্ত থাকে। ক্রেতারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য মেলার ওপর নির্ভর করে। অনেকে মেলাকে ঘিরে গোটা বছরের বিকিকিনির বড় পরিকল্পনাও করে থাকে।

উপসংহার : বাঙালি সংস্কৃতির বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে লোকজ মেলা। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আবহমান গ্রামবাংলার প্রথা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। গ্রামীণ

এই মেলাটি আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছে। আমাদের লোকজ সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি মেলায় গিয়ে।

৪৪ পাহাড়পুর

অথবা, একটি ঐতিহাসিক স্থান

অথবা, একটি দর্শনীয় স্থান

সূচনা : গুরবত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগত কারণে ইতিহাসে মর্যাদা পাওয়া যে কয়টি স্থান বাংলাদেশে রয়েছে তার মধ্যে পাহাড়পুর অন্যতম। এটি বাংলাদেশের এমনকি দুনিয়ার একটি বিখ্যাত স্থান, যা মূলত একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধবিহার। পাল আমলের গঠিত এই বৌদ্ধবিহার ইতিহাসকে বুকে ধরে এটি আজও দাঁড়িয়ে আছে।

অবস্থান : পাহাড়পুর বিহারটি বর্তমান রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার 'পাহাড়পুর' গ্রামে অবস্থিত। এর আরেক নাম 'সোমপুর বিহার' বা 'সোমপুর মহাবিহার'।

আবিষ্কারের ইতিহাস : আজ থেকে প্রায় ১৪শ বছর আগে বিহারটি নির্মাণ করা হয়। রাজা দ্বিতীয় ধর্মপাল এটি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ সময় এটি খালি পড়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো কাজে ব্যবহৃত হয়নি। অনেকে মনে করেন, যুগ যুগ ধরে উড়ে আসা ধুলোবালি ও মাটি এর চারদিকে জমতে থাকার কারণে একসময় মাটির স্তূপে ঢাকা পড়ে এটি পাহাড়ের মতো হয়ে যায়। সেই থেকে এর নাম হয়ে যায় 'পাহাড়পুর'। দীর্ঘকাল পরে ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম এটি আবিষ্কার করেন।

নির্মাণশৈলী ও বিবরণ : সুপ্রাচীন এ বিহার এলাকাটি প্রায় ৪০ একর জায়গাজুড়ে লালচে মাটির ভূমিতে বিস্তৃত। ২৭ একর জমির ওপর এর বিশাল দালান। মাটির নিচের অংশে এটি চারকোণা আকারের। বাইরের দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটি দিয়ে নানা রকম ফুল-ফল, পাখি, পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি বানানো আছে। উত্তর দিকের ঠিক মাঝখানে মূল দরজা। তারপরেই রয়েছে অনেকগুলো ছোট–বড় হলঘর। দেয়ালের ভেতরে সুন্দর সার বাঁধা ১৭৭টি ছোট ছোট ঘর। সামনের দিকে আছে লম্বা বারান্দা। বিহারটিতে আরও আছে পুকুর, স্নানঘাট, কূপ, স্নানঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর ও টয়লেট। সব মিলিয়ে বিহারটিতে ৮০০ মানুষের থাকার ব্যবস্থা ছিল।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থাপনা : বিহারের ভেতর বিশাল উঠানের মাঝখানে বড় এক সুন্দর মন্দির। ধাপে ধাপে উঁচু করে বড় মন্দিরটা বসানো হয়েছে। পোড়ামাটির দুই হাজার ফলকের চিত্র দিয়ে মন্দিরের বাইরে আর ভেতরে সাজানো। একই রকম ছোট ছোট মন্দির পুরো বিহারের নানা জায়গায় আছে। বিহারটির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে দেয়ালের বাইরে একটা বাঁধানো ঘাট আছে। ওটাকে বলা হয় 'সন্ধ্যাবতীর ঘাট'। পাহাড়পুর বিহারের পাশে আছে দেখার মতো একটা জাদুঘর। সেখানে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে খনন করে পাওয়া অনেক পুরাতন আর দুর্লভ জিনিসপত্র। এই এলাকার একটু দূরেই আছে 'সত্যপীরের ভিটা'। সেখানে অনেকেই ভক্তিভরে প্রার্থনা করে, মানত করে।

গুরবত্ব : বাংলার ধর্মীয় ইতিহাসে পাহাড়পুর এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এটি ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। ভারতবর্ষের বৃহত্তম বিহার হিসেবে এখানের বিহারটির রয়েছে আলাদা গুরবত্ব। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো থেকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

উপসংহার : পাহাড়পুর বিহারের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরবত্ব অনেক। প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে এটি দাঁড়িয়ে আছে। এখানে এলে বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। আমাদের সকলেরই উচিত একবারের জন্য হলেও পাহাড়পুর ঘুরে আসা।

৪৫ ফেলে আসা দিনগুলো

অথবা, আমার শৈশব স্মৃতি

ভূমিকা : জীবন গতিশীল। আর এই গতিই বেঁচে থাকা। গতি হারানোর অর্থই মৃত্যু। জীবনের এই ছুটে চলার মাঝে অনেক পদচিহ্ন পেছনে পড়ে থাকে। জীবনছবির ফ্রেমে সেই দিনগুলো বাঁধিয়ে রাখলে হয় তো একটি মহাকাব্য হবে। সেই কাব্যে যেমন থাকবে সুখের মোহনীয় মুহূর্তগুলোর রোমাঞ্চকর স্মৃতি, আবার এর বিপরীত অনেক কিছু থাকবে, যা শুধু যন্ত্রণাই বাড়াবে। ইচ্ছে করবে কলমের একটানে মুছে ফেলতে। নয় তো ইচ্ছে করবে এমন করে ভাবতে– 'এটা আমার জীবনের পর্ব নয়।' কিন্তু যা একবার ফেলে এসেছি তা ফিরে না এলেও মনের পাতা থেকে, জীবন খাতা থেকে মুছে ফেলা যাবে না। এটাই বাস্তবতা। এই বাস্তবতার খাতার হিসাব মিলিয়েই নির্ধারিত হয় মানুষের পরবর্তী জীবনের এমনকি পরপারের জীবনের পথচলা। তাই, ফেলে আসা দিনগুলি যতই তুচ্ছ ভাবি তুচ্ছ নয় ঐদিনের সিঁড়ি বেয়েই আসে জয়–পরাজয়।

জীবনটা খুব ছোট : বাংলাসাহিত্যের অমর কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ বলেছেন,' আমাদের জীবনটা খুব ছোট। একটা কচ্ছপ বাঁচে তিনশ বছর। মানুষ একশ বছরও বাঁচে না।' তাঁর মতো বড়মাপের মানুষরা যখন এমন কথা বলেছেন, তখন আমি কী আর বলব, আমার ফেলে আসা দিনগুলো নিয়ে? আমার জীবনের ফেলে আসা স্মৃতি ভরা দিনগুলো এখনো পরিপুষ্টই হয়নি। এখনও স্কুলের বারান্দা দিয়ে কেবল হাঁটছি। কৈশোর পেরিয়ে এখনো যৌবনের দ্বারে পা পড়েনি।

'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না–
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।
কান্নাহাসির বাঁধন তারা সইল না–
সেই– যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।।

এই গান গাওয়ার সময় এখনো আমার আসেনি। তারপরও জীবন খাতার পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে কিছু স্মৃতিময় স্মরণীয় ক্ষণ।

কিছু উজ্জ্বল স্মৃতি : আমার ফেলে আসা দিনের ফ্রেমে আছে একটা সোনালি শৈশব। গ্রামের সবুজ–শ্যামল আঁচলের ছায়া। মায়ের স্নেহভরা মিষ্টি মুখ। বাবার কর্মক্লান্ত অথচ হাসোজ্জ্বল প্রিয়মুখ। বাঁশবাগানের মাথায় ওঠা চাঁদ। বাড়ির পিছন দিয়ে বয়ে চলা ছোট নদী। গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেলিম স্যারের আদরভরা শাসন। বন্ধুদের সাথে দুপুরের রৌদ্রে ঘুড়ি ওড়ানোর ধূসর স্মৃতি। নদী, বিল–ঝিলের পানিতে মাতামাতি, জেলেদের মাছ ধরার ছবি। আজও মনের কোণে উঁকি দেয় ঝুপ করে মাছরাঙার পাখির মাছধরা কিংবা কাঠঠোকরার খট–খট শব্দে কাঁঠাল গাছে গর্ত করার ছবিগুলো।

শীতকালের কিছু মধুর স্মৃতি কোনো দিন ভোলা যাবে না। ভাইবোন সবাই মিলে চুলার কাছে বসে মায়ের পিঠা বানানো দেখতে দেখতে পিঠা। তারপর শিশির ভেজা ভোরে চাচা, চাচি, মামা, মামি, ফুফু ও চাচাতো, মামাতো ভাই–বোনেরা আসতেন। পাড়াপ্রতিবেশীরা আসতেন। সবাই মিলে একসাথে বসে শীতের পিঠা খাওয়ার পর ঝালমুখ করা হতো হাঁসের গোশত দিয়ে গরম গরম ভাত। খাওয়ার পর্ব শেষে ভাই–বোনরা সবাই রঙিন ঘুড়ি হাতে বেরিয়ে যেতাম পাশের মাঠে। সর্ষে ক্ষেতের সবুজ পাতার পাতায় হলদে ফুল আহ! কী মনকাড়া ছবি। তারপর সারাদিন হইচই। স্কুল হোস্টেলের এই বন্দিদশায় খুব বেশি বেশি মনে পড়ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা শেষের সেই সোনালি দিনগুলো।

বৈশাখ মাসে আকাশে মেঘ করলে মা ব্যস্ত হয়ে যেতেন আমাদেরকে ঘরে নিতে, আর আমরা মায়ের চোখে ফাঁকি দিয়ে আম কুড়াতে চলে যেতাম আমাদের বাগানে। বাড়ি ফিরে আমগুলো দিতাম মায়ের হাতে। তারপর মা হাসিমুখে হাজির হতেন কাঁচা আমের সাথে কাসুন্দী মিশিয়ে নিয়ে। সেই স্বাদ ভোলার নয়। এখনো ভাবলে জিভে পানি আসে।

আরো মনে পড়ে আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে টিনের চালে ঝুম-ঝুম বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে অলস দুপুরে ভাইবোনে মিলে তিনগুটি, লুডু কিংবা দাবা খেলার মধুর স্মৃতি। এখন পড়ালেখার এত চাপ খেলার কথা ভাবতেই পারি না।

বড় বুবুর বিয়ে। সবাই ব্যস্ত বিয়ের আয়োজনে। আমাদের পর থেকে কলাগাছে রঙিন কাগজ লাগিয়ে গেট করা হয়েছে। তার সাথে রঙিন কাপড়ে সুন্দর কারকাজ। পালকি চড়ে বর এলো। দুই পরের মধ্যে চলল ধাঁধার পালরা। না জিতলে বরকে বাড়িতে আসতে দেওয়া হবে না। অনেক সময় ধরে চলল। কিন্তু না, কোনো পরই কম নয়। হারার নাম নেই কারো। দাদু ভাই এগিয়ে গিয়ে বরকে মানে পাগড়ি পরা দুলাভাইকে নিয়ে এলেন। হাতে রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছেন দুলাভাই। এখন ভাবতে গেলে খুব হাসি পায়। আর সেদিন বুবু যখন পালকিতে উঠে তার শ্বশুরবাড়ি চলে যায় খুব কেঁদেছিলাম।

প্রতিদিন তিনবার রান্নার পর পেরটে খাবার নিয়ে মায়ের স্নেহভরা ডাক, এই স্কুল হোস্টেলে নেই। ঘড়ি দেখে নিজেকেই যেতে হয় ডাইনিং টেবিলে। এখন আমি মায়ের স্নেহের ছায়া ছেড়ে অনেক দূরে শহরের স্কুলের হোস্টেলে থাকি। হাই স্কুলে পড়ি। অনেক বড় হয়ে গেছি কারণ আমাকে অনেক বড় হতে হবে। মা-বাবার স্বপ্ন আমি পড়ালেখা শিখে প্রকৃত মানুষ হব। তাঁদের মুখ উজ্জ্বল করব। তাই স্নেহ, মায়া আর স্মৃতির ফাঁদে বাঁধা পড়লে চলবে না।

সামনে চলার শক্তি : ফেলে আসা দিনগুলো ফিরে আসবে না। তারপরও মানুষ ফেলে আসা দিনে ফিরে যেতে চায়। আমার ফেলে আসা দিনগুলোও আমাকে দারুণভাবে ভাবায়, আনন্দ আর বেদনার মাঝে জড়িয়ে রাখে। এখনকার দিনগুলো একসময় অতীত হবে। তাই অতীত থেকে শিরা নিয়ে সামনে চলার শক্তি খুঁজে ফিরি সবসময়।

উপসংহার : আমার অতীত দিনগুলোকে ফেলে আসা দিন বললেও ফেলে আর আসতে পারলাম কই! আমার মনের ফ্রেমে বন্দি হয়ে আছে সেই দিনগুলো। আমার জীবনের সাথে মিশে আছে। আমি যখন যেখানে যাচ্ছি তারাও আমার সাথে সাথে চলছে। কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। হয়তো কোনো দিন পারবও না। কারণ সেই দিনগুলো আমার জীবনেই অংশ। তার সাথে মিলিয়েই গড়ে উঠছে আমার ভবিষ্যৎ। অতীতকে ভুলে ভবিষ্যৎ গড়ার চিন্তা করা অসম্ভব। তাই আমি আমার ফেলা আসা দিনগুলোর স্মৃতিগুলো খুব যত্নের সাথে মনের মাঝে সংরক্ষণ করছি। সেই স্মৃতির শক্তিতে আগামী দিনের মজবুত ভিত গড়ার প্রত্যাশাকে লালন করে পথ চলছি।

৪৬ বর্ষণমুখর একটি সন্ধ্যা

[রা. বো. ১৪, ব. বো. ১০]

অথবা, আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা

জীবন খাতার পাতায় জমে অভিজ্ঞতার নানা বিচিত্র ঘটনা। আজ আমার জীবনে ঘটে যাওয়া এমন একটি স্মরণীয় ঘটনার তুলে ধরছি। শ্রাবণ মাস। সকাল থেকেই আকাশে মেঘের আনাগোনা। মাঝে কয়েকবার হালকা বৃষ্টি হয়েছে। বিকেলে কালো মেঘের ফাঁকে পশ্চিম আকাশে পড়ন্ত সূর্যের আবির রং দেখে মনটা নেচে ওঠে। আমরা কয়েক বন্ধু মনের আনন্দে রবিঠাকুরের কবিতায় গানের সুর তুলে গাইতে গাইতে বাড়ি হতে বের হই–

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,
বাদল গেছে টুটি।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি ॥

আমাদের বাড়ি থেকে হারাবিলের দূরত্ব এক কিলোমিটারের বেশি নয়। বন্যার পানিতে সেই দূরত্বরেখা মিশে গেছে। এক কিলোমিটারের ফসলের মাঠ পানিতে একাকার। বিল আর ফসলের মাঠের পার্থক্য বোঝা যায় না। বাড়ির ঘাটে বাঁধা ছিল আমাদের নৌকা।

আমাদের বৈঠার হেইয়া টানে নৌকা এগিয়ে চলছে। সূর্য ডুবে গেছে কখন আমাদের কোনো খেয়াল নেই। সন্ধ্যার আলো-আঁধারির খেলা চলছে। মেঘের ভেলা জমে জমে কখন যে আকাশ ভরে গেছে, বন্ধুদের হৈহুলেরাড় আর আনন্দ-উলরাসে আমরা খেয়ালই করেনি যেকোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

হঠাৎ আকাশ ভেঙে সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামল। আমরা বিলের পাড়ের গাঁয়ের ছেলে। ঝড়, বৃষ্টি, বাদল, বন্যা দেখে খুব সহজে সাহস হারা হই না। হারাবিল নিয়ে অনেক গল্প-কাহিনি, কিংবদন্তি এই অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে। যার বেশির ভাগই ভয় আর শরীরের রক্ত হিম করার মতো। ভূত পেত্নী নয় তো ডাকাতের কায়-কারবার নিয়ে কল্পনার রংমাখা ভয়ংকর সব কাহিনি। আরো আছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কাহিনি। পাকবাহিনী এই বিলের বটগাছের নিচে ক্যাম্প করে কত মানুষকে মেরে বটগাছের নিচে গর্ত করে পুঁতে রেখেছে তার হিসেব নেই। সেই সব অতৃপ্ত আত্মারা নাকি সন্ধ্যা হলেই বের হয়ে ঘুরে বেড়ায় বিলের পানির ওপর দিয়ে। এমন সব কাহিনি দিনের আলোতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সন্ধ্যার অন্ধকারে কেন যেন সত্যি বলে মনে হচ্ছে।

আস্তে আস্তে বৃষ্টি বাড়তে থাকে। নৌকায় পানি জমছে। আমরা কাকের মতো ভিজছি। চারদিক অন্ধকার। দূরে গ্রামের ঘরে ঘরে জ্বলা সন্ধ্যা বাতির আলোও চোখে পড়ছে না বৃষ্টির আঁধারের ঘনঘটায়।

বৃষ্টিতে ভিজে শীত শীত লাগা শুরব হলো। বাড়ির কথা মনে পড়তেই অস্বস্তি ঘিরে ধরল। বৃষ্টিমুখর এই সন্ধ্যায় আমাদের না পেয়ে নিশ্চয়ই মা-বাবা চিন্তায় অস্থির। নিজেদের অপরাধী অপরাধী মনে হচ্ছে। সবাই মিলে বৈঠা ঠেলতে লাগলাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আমরা বিলের মাঝখানে চলে এসেছি। হঠাৎ বৃষ্টির ছন্দময় শব্দকে মনে হচ্ছে ভূতের কান্না। বাতাসের শিরশির শব্দ কানে এসে বাজছে পেত্নীর হিহিহি হাসির মতো। বিকট শব্দে দূরে একটা বাজ পড়ল, কিন্তু মনে হলো আমাদের ওপরই যেন পড়ল। ব্রজপাতের আলোয় যতটুকু দেখা গেল, তাতে মনে হলো আমরা ভুল পথে চলছি। আশপাশে আর কোনো নৌকা বা লোকজনের দেখা নেই। বিলের মাঝখানের ঢিবির ওপরের বটগাছ অর্ধেকটা ডুবে আছে। এই বটগাছতলায় নাকি প্রতি অমাবস্যার রাতে ভূতদের আসর বসে। এ কথা মনে হতেই শরীরের প্রতিটি লোম দাঁড়িয়ে গেল।

এমন সময়, 'ঐ তো দূরে আলো দেখা যাচ্ছে'- আমাদের মাঝ থেকে একজন চিৎকার করে উঠল। আমি চমকে উঠলাম। তাকে চুপ করতে বলে বললাম। 'ঐ দিকে তো বটগাছ। নিশ্চয়ই ভূতের আগুন। নয় তো ডাকাতরা ওত পেতে বসে আছে। মহাজনদের নৌকা লুট করার জন্য। চিৎকার করো না। মনে মনে আলরাহকে ডাকো।' আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সবাই কালিমা শাহাদাত আর দোয়া ইউনুছ পড়া শুরব করল। মনে মনে পড়তে বললেও তা আর মনে মনে থাকল না। ভয়ে কাঁপা গলায় তা এক অন্য রকম ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করল। দূরের আলো আস্তে আস্তে কাছে আসছে। আমরা অজানা ভয় আর সিদ্ধান্তহীনতার দোলাচলে দুলতে লাগলাম। আলো থেকে পালাব নাকি কাছে যাব কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মনে হলো আমার নাম ধরে কেউ ডাকছে। দাদির কাছে শুনেছি ভূতরা নাম ধরে ডাকে। ডেকে নিয়ে তারপর ঘাড় মটকে

রক্ত খায়। আমার এক বন্ধু বলল, 'এটা তো চাচা মিয়ার গলা।' আমাদের বাড়ির কাজের লোককে আমরা চাচা মিয়া বলে ডাকি। চাচা মিয়া ডাকছে শুনে মনে সাহস ফিরে পেলাম। ভয় আর আনন্দের মিশ্রণে চিৎকার বেরিয়ে এলো আমাদের গলা দিয়ে।

আমাদের চিৎকার লক্ষ্য করে আলোটি এগোতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে নৌকাটি আমাদের কাছাকছি চলে এলো। নৌকা থেকে টর্চ লাইটের আলো এসে পড়ল আমাদের মুখের ওপর। বাবার গলার আওয়াজ পেলাম। আবার ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল। মনে হলো এবার আর রক্ষা নেই। নিশ্চয়ই যে কাণ্ড ঘটিয়েছি, ভীষণ রেগে আছেন। কিন্তু না, ঘটনা ঘটল উল্টো। আমাদেরকে দেখে বাবার চোখে পানি এসে গেল। তিনি নিজে চাচা মিয়ার নৌকা ছেড়ে আমাদের নৌকায় এসে বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকা চালাতে শুরু করলেন। তখনও ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকা এসেছে ঘাটে ভিড়ল, মা দৌড়ে এসেছে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। গরম পানি দিয়ে গোসল করিয়ে ঘরে নিয়ে গরম কাপড় পরতে দিলেন। বাড়ির ঘাটে আমার অন্য বন্ধুদের বাবা-মা, ভাই-বোনরাও অপেক্ষা করছিলেন। তারাও যার যার বাড়ি চলে গেল। আমার জীবনে অনেক বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যা এসেছে, আরো আসবে। কিন্তু এই সন্ধ্যার স্মৃতি কোনোদিন ভুলতে পারব না। এটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

৪৭ ফুটবল খেলা

অথবা, আমার প্রিয় খেলা

ভূমিকা : ফুটবল অত্যন্ত চমৎকার একটি উত্তেজনাপূর্ণ খেলা। এ খেলার সূচনা হয় চীনে। বর্তমানে সারা বিশ্বে এ খেলাটি তুমুল জনপ্রিয়। বাংলাদেশেও একটি অন্যতম জনপ্রিয় খেলা এই ফুটবল। গ্রামগঞ্জ, শহর, নগর সবখানেই ফুটবল খেলা হয়। আমার প্রিয় খেলাও ফুটবল।

ফুটবল মাঠের বর্ণনা : একটি সমতল মাঠে ফুটবল খেলা হয়। মাঠের চারদিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। লম্বালম্বি দু বিপরীত প্রান্তে দুটি গোলপোস্ট থাকে। আদর্শ মাঠের দৈর্ঘ্য ১২০ হাত এবং প্রস্থ ৮০ হাত হয়। গোলপোস্ট দুটির সাথে নেট দেওয়া থাকে ও মাঠের চার কোণায় চারটি পতাকা পোঁতা থাকে।

খেলার বর্ণনা : একটি বল মাঠের মাঝামাঝি স্থাপন করা হয়। দুটি দলের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক দলে ১১ জন করে খেলোয়াড় থাকে। গোলপোস্ট পাহারায় থাকে একজন করে গোলরক্ষক। খেলা চলাকালীন দুই গোলরক্ষক নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে হাত দিয়ে বল ধরতে পারে। মাঝের দশ মিনিট বিরতি ছাড়া ৪৫ মিনিট করে মোট ৯০ মিনিট খেলা হয়। সময় শেষে যে দল গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকে তারাই জয়ী হয়।

পরিচালক : যিনি ফুটবল খেলা পরিচালনা করেন তাঁকে বলা হয় রেফারি। খেলার সকল ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাঁর নির্দেশে খেলা আরম্ভ এবং শেষ হয়। কোনো খেলোয়াড় নিয়ম ভঙ্গ করলে রেফারি বাঁশি বাজিয়ে তাঁর নির্দেশ প্রদান করেন। মাঠের দুপাশে দুজন লাইন্সম্যান তাঁর কাজে সাহায্য করেন।

খেলার নিয়মকানুন : ফুটবল খেলার কতকগুলো নিয়ম আছে। কেউ হাত দিয়ে বল ধরলে 'হ্যান্ড বল' ধরা হয়। তবে গোলরক্ষকদ্বয় নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে হাত দিয়ে বল ধরতে পারে। বল সীমানার বাইরে চলে গেলে 'আউট' ধরা হয়। অন্যপক্ষের খেলোয়াড়কে অহেতুক ধাক্কা দিলে বা পা লাগিয়ে ফেলে দিলে 'ফাউল' ধরা হয়। কোনো পক্ষ নিজ গোলপোস্টের সীমানায় হ্যান্ডবল করলে বা প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ফাউল করলে 'পেনাল্টি' দেওয়া হয়। আর প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে বল যদি নিজ গোলপোস্টের পার্শ্ব সীমানার বাইরে চলে যায় তবে অপরপক্ষ 'কর্নার' লাভ করে। বল গোলপোস্টে প্রবেশ করলে সেটিকে গোল হিসেবে ধরা হয়।

উপকারিতা : ফুটবল খেলা বেশ আনন্দদায়ক। এ খেলা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। এতে দেহের সকল অংশ উত্তমরূপে পরিচালিত হয় বলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সবল ও দৃঢ় হয়। খেলোয়াড়দের কতগুলো নিয়মের অধীনে খেলতে হয় বলে তারা নিয়মানুবর্তিতা, কর্মতৎপরতা এবং একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার শিক্ষা লাভ করে।

উপসংহার : ফুটবল খুবই আনন্দময় ও উপকারী খেলা। এ খেলা খেলোয়াড় ও দর্শক উভয়কেই আনন্দ দেয়। যেকোনো বয়সী মানুষের জন্য এটি একটি ভালো ব্যায়াম। এ খেলা সহযোগিতা ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেয়। তাই ফুটবল আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা।

৪৮ ক্রিকেটবিশ্বে বাংলাদেশ

[ব. বো. ১৪, রা. বো. ১৩, দি. বো. ১০]

ভূমিকা : 'খেলার রাজা' কিংবা 'রাজার খেলা' বলা হয় ক্রিকেটকে। এ খেলার গৌরবময় অনিশ্চয়তা একে তুলে ধরেছে উত্তেজনা, উদ্দীপনা ও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। ক্রিকেটবিশ্বে বাংলাদেশ আজ অন্যতম শক্তিধর দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অভাবিত সাফল্য ক্রিকেটকে এ দেশের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করেছে। ক্রিকেট এখন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণার বাতিঘর হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে ক্রিকেটের ইতিহাস : শতাধিক বছরের বেশি সময় ধরে এ অঞ্চলে ক্রিকেট খেলার প্রচলন। ইংরেজ শাসনামলে এ দেশে তথা ভারতীয় উপমহাদেশে ক্রিকেট খেলার সূচনা ঘটে। দেশ বিভাগের কিছুকালের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রিকেট খেলার সুযোগ পায়। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানেও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যায়ে এবং শহরগুলোতে ক্রিকেট বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পাকিস্তান আমলে তৎকালীন শাসক ও সংগঠকদের আন্তরিকতার অভাব এবং বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এখানে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট বিকশিত হয়নি।

আইসিসিতে বাংলাদেশ : স্বাধীনতার এক দশকের মধ্যেই বাংলাদেশ আইসিসির সহযোগী সদস্যের মর্যাদা পায়। যোগ্যতা অর্জন করে বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ধারণী আইসিসি ট্রফি খেলার। প্রথম কয়েকটি আসরে বাংলাদেশের সাফল্য উলেরখযোগ্য ছিল না। অবশেষে দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় '৯৭-এর আইসিসি ট্রফিতে। সেমিফাইনালে বাংলাদেশ সহজেই স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। সেরা দুটি দেশের একটি হতে পারায় বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত হয়। সেই সাথে বাংলাদেশ অর্জন করে ওয়ানডে খেলার মর্যাদা। তাই সেদিন আনন্দের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল সমগ্র বাংলাদেশ। কেনিয়াকে হারিয়ে সেবারের আসরের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের টেস্ট মর্যাদা লাভ : বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের পরপরই আইসিসির অধিবেশনে বাংলাদেশ টেস্ট মর্যাদা লাভের আবেদন করে। পাকিস্তান ছিল সমর্থক। ওয়েস্ট-ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে এতে সমর্থন জানালেও ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড দল বিরোধিতা করায় বাংলাদেশ সম্ভাব্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অবশেষে ২০০০ সালের ২৬ জুন আইসিসির পরবর্তী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে টেস্ট ক্রিকেটে মর্যাদা দেওয়া হয়। সংবাদটি বাংলাদেশে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। জাতীয় পর্যায়েও আনন্দ উৎসব পালিত হয়।

বিশ্বকাপ ও বাংলাদেশ : ১৯৯৯–এর বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি কেড়েছিল। ২৪ মে অনুষ্ঠিত খেলায় বাংলাদেশ বিশ্বকাপে প্রথম জয় ছিনিয়ে আনে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে। প্রথম রাউন্ডের শেষ খেলায় ৩০ মে '৯৯ বাংলাদেশ সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শক্তিশালী পাকিস্তানকে ৬২ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দেয়। নিজেদের সপ্তম অবস্থানসহ সুপার এইটে খেলার যোগ্যতা অর্জন ছিল সেবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের উলেরখযোগ্য দিক। সেই সঙ্গে ভারত ও দৰিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করে ২০০৭ সালের বিশ্বকাপে। ২০১১ বিশ্বকাপে আয়োজক দেশ ছিল বাংলাদেশ। সেরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তালিকায় ছিল ঢাকা। গ্রুপ পর্বে ছিটকে পড়লেও শক্তিশালী ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে দর্শকদের মন জয় করে নেয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অধ্যায় নিঃসন্দেহে ২০১৫ সালের বিশ্বকাপ। অস্ট্রেলিয়া–নিউজিল্যান্ডের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সবার নজর কাড়ে। শক্তিশালী ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বাংলাদেশ জায়গা করে নেয় কোয়ার্টার ফাইনালে।

বাংলাদেশের ক্রিকেটে সম্ভাবনা : বর্তমানে ক্রিকেট বিশ্বে একটি প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে বাংলাদেশের নাম উলেরখযোগ্য। বাংলার দামাল ছেলেদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স সেই কথাই বলছে। ঘরের মাটিতে সর্বশেষ খেলা ১৪টি ওয়ানডে ম্যাচের মধ্যে বাংলাদেশের জয় ১২টিতেই। পাকিস্তান, ভারত ও দৰিণ আফ্রিকার মতো ক্রিকেটীয় পরাশক্তিরা বাংলার ছেলেদের সামনে হয়েছে পর্যুদস্ত। টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে ততটা ভালো ফলাফল করতে না পারলেও উন্নতির চিত্র ধরা পড়ে সহজেই। বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক দলগুলো দেশে ও দেশের বাইরে ভালো করছে। বাংলাদেশের বেশ কয়েজন খেলোয়াড় বিশ্ব ক্রিকেটে নিজেদের শক্ত অবস্থান গড়ে নিতে সৰম হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের সাকিব আল হাসান দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেটের তিনটি ফরম্যাটেই সেরা অলরাউন্ডার হিসেবে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছেন। বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দলও নানা পর্যায়ে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনছে। ক্রিকেট এখন শুধু নিছক খেলাই নয়। একে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিশাল বাণিজ্যিক সম্ভাবনা। ক্রিকেট খেলাকে নেশা করে নেওয়া তরুণরা এখন পেশা হিসেবে একে গ্রহণ করতে অনেক বেশি আগ্রহী।

উন্নতির ধারা ধরে রাখতে করণীয় : ক্রিকেটকে ঘিরে বাংলাদেশের সর্বস্তরের ক্রীড়ামোদী জনতার আশা–ভরসার শেষ নেই। সেই ভরসার প্রতিদান দিতে আগ্রহের কমতি নেই খেলাটির সাথে সংশিরষ্ট সকলেরই। তবে কিছু কিছু ৰেত্রে এখনো আমাদের দুর্বলতা রয়েছে। আমাদের দেশের ক্রিকেট মাঠের সংখ্যা এখনো অপ্রতুল। পিচগুলোর অধিকাংশই বিশ্বমানের নয়। তাই আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ–সুবিধাসম্পন্ন ক্রিকেট মাঠ তৈরি করা খুব জরুরি। আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটের কাঠামো খুবই নাজুক। এটিকে শক্তিশালী করা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের কাঠামোকে দৃঢ় করার প্রতিও অনেক মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান ক্রিকেট খেলার উন্নতির জন্য নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকলে আমাদের ক্রিকেট নিঃসন্দেহে আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

উপসংহার : নানা সমস্যায় জর্জরিত বাঙালির আশা–আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু এখন ক্রিকেট। অন্য সব বিষয়ে নানা রকম বিভক্তি থাকলেও ক্রিকেট সাবাইকে এক করেছে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে–এটিই সবার কামনা। হয়তো সেদিন আর খুব বেশি দূরে নয় যেদিন বাংলাদেশ ছিনিয়ে আনবে বিশ্বকাপের গৌরব।

৪৯ মাদকাসক্তি ও তার প্রতিকার

[কু. বো. ১৫, ব. বো. ১৪, ঢা. বো. ১২ য. বো. ১১]

ভূমিকা : মাদকাসক্তি আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ। এটি মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। বর্তমানে মাদকাসক্তি আমাদের সমাজে এক সর্বনাশা ব্যাধিরূপে বিস্তার লাভ করেছে। দুরারোগ্য ব্যাধির মতোই তা তরুণ সমাজকে গ্রাস করছে। এটি মায়ের বুক থেকে তার তরুণ ছেলেকে কেড়ে নেয়। ধ্বংস করে দেয় একটি রত্নকে। এই ব্যাধি আজ প্রতিটি পরিবারে ছড়িয়ে দিয়েছে ভয়াবহ আতঙ্ক। এটি শুধু আক্রান্ত ব্যক্তিকেই ধ্বংস করে না, ধ্বংস করে পুরো সমাজকে।

মাদকাসক্তি কী? : মাদকাসক্তি হলো ব্যক্তির জন্য ৰতিকর এমন একটি মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যা জীবিত প্রাণী ও মাদকের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয় সৃষ্টি হয়। যে দ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উলেরখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং ঐ দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টির পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়তে থাকে, এমন দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। ব্যক্তির এই অবস্থাকে বলে মাদকাসক্তি। তাই মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি নেশাকে বোঝায়।

মাদকদ্রব্য কী? : যেসব দ্রব্য গ্রহণ করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ওপর ৰতিকর প্রভাব পড়ে এবং সেগুলোর প্রতি সেবনকারীর প্রবল আসক্তি জন্মে যেসব দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। মাদকদ্রব্য হচ্ছে সেসব দ্রব্য, যা প্রয়োগে মানবদেহে মস্তিষ্ককজাত সংজ্ঞাবহ সংবেদন হ্রাস পায়। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য চালু আছে। মদ, গাঁজা, ভাঙ, আফিম ইত্যাদির নেশা বহু প্রাচীন। এছাড়াও আছে হেরোইন, মারিজুয়ানা, কোকেন, মরফিন, এলএসডি, প্যাথেড্রিন, চরস, পপি, হাশিশ, ক্যানবিস, স্মাক, ফেনসিডিল, ইয়াবা ইত্যাদি।

মাদকাসক্তির কারণ : একজন ব্যক্তির মাদকাসক্ত হওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ লৰ করা যায়। এর মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো পারিবারিক অনুশাসনের অভাব, হতাশা, বেকারত্ব, অসৎ সঙ্গীদের প্ররোচনা, কর্ম বা শিৰাৰেত্রে ব্যর্থতা, মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা ইত্যাদি।

১. পারিবারিক কলহ : পারিবারিক কলহ এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা ও সৌহার্দের অভাব একটি কিশোরের ভুল পথে যাওয়ার মূল কারণ। সুস্থ সামাজিক পরিবেশের অভাবেও অনেক কিশোর–কিশোরী মাদকের সংস্পর্শে আসে।

২. হতাশা : হতাশা আমাদের যুবসমাজের মাদকাসক্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ। মানুষ সাধারণত নিজেকে নিয়ে অনেক উচ্চ আশা পোষণ করে আর এই আশা পূরণ করতে যখন সে ব্যর্থ হয় তখনই এই হতাশা কাটানোর একটি পথ হিসেবে সে মাদককে বেছে নেয়।

৩ কৌতূহল : কিশোর–কিশোরীদের মাদকাসক্ত হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে কৌতূহল। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আগ্রহ মানুষের সর্বকালের। এই কৌতূহলের বশেই পরিচয় ঘটে মাদকের সাথে।

৪. কুসংসর্গ : পরিবেশ একজন মানুষের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। অনেক সময় মাদকের সাথে প্রায় অপরিচিত একজন ব্যক্তি মাদকাসক্ত বন্ধু বা সঙ্গীদের প্রভাবে নিজের অজান্তে, মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

এছাড়াও পারিবারিক ও সামাজিক নানা অস্থিতিশীল পরিবেশ একজন মানুষের মাদকাসক্ত হওয়ার পেছনে দায়ী থাকে।

বাংলাদেশের প্রেৰাপটে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার : উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের তরুণ সমাজের একটি বিরাট অংশ ভয়াবহ মাদকাসক্তির শিকার। বাংলাদেশে

মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পরিমাণ ও ব্যবহারকারীর সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণামতে এ দেশের ১৭ ভাগ লোক মাদকাসক্ত। এ দেশে অবৈধভাবে প্রচুর পরিমাণে মাদক বিক্রি হয় এবং মাদকদ্রব্যের এই সহজলভ্যতাই আমাদের দেশে দিন দিন মাদকগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

মাদকাসক্তির পরিণাম/কুফল : মাদকাসক্ত ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে। কখনো খারাপ লোকের প্ররোচনা, হতাশা, নৈরাশ্য অথবা নিছক কৌতূহলবশত একবার মাদক গ্রহণ শুরু করলে সে আর এই নেশা থেকে ফিরে আসতে পারে না। দিনের পর দিন তার এ নেশা আরো বাড়তে থাকে। অনেকেই ভাবে মাদক গ্রহণের মাধমে তারা তাদের দুঃখকে ভুলে থাকার শক্তি পায়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মাদক মানুষের মানসিক সুস্থতাকে নষ্ট করে তাকে মানসিকভাবে আরো দুর্বল করে তোলে। মাদক গ্রহণের ফলে মানুষের আচরণেও অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি অত্যন্ত সহজেই অনৈতিক ও বেআইনি কাজে জড়িয়ে পড়ে। মাদকের টাকা জোগাড় করার জন্য পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি করে, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অসৎ পথ অবলম্বন করে। তারা পরিবার এবং সমাজে ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। মাদকদ্রব্য দেহ ও মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এর ফলে বিভিন্ন জটিল ও দুরারোগ্য রোগব্যাধি দেহকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটে ও কর্মক্ষমতা লোপ পায়।

প্রতিরোধের উপায় : মাদকাসক্তি এক ভয়াবহ রোগ। পশ্চিমা বিশ্বে যে সমস্যা এখন তুঙ্গে। আমাদের দেশে সে তুলনায় এখনও তা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। তাই প্রাথমিক অবস্থায়ই এর প্রতিকার করা উচিত। নিম্নলিখিতভাবে আমরা মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি।

১. প্রথমেই প্রয়োজন প্রতিটি ব্যক্তির মাদকের কুফল সম্পর্কে জানা। এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
২. ছোটবেলা থেকে শিশুদের মাদক সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যেন সহজেই তারা প্ররোচিত না হয়।
৩. মানবিক মূল্যবোধ গঠন ও পরিবেশন।
৪. বেকারত্ব দূরীকরণের ব্যবস্থা।
৫. ব্যক্তিগত ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি।
৬. মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও ভয়াবহতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রচার করা।
৭. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অফিস, সংস্থা, দপ্তরকে ধূমপান ও মাদকমুক্ত এলাকা ঘোষণাপূর্বক তা কার্যকর করা।
৮. মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা দূরীকরণ।

উপসংহার : মাদকাসক্তির সর্বনাশা ছোবল দেশের তরুণ সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজের জন্য মাদকাসক্তি নির্মূল করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত ও সামাজিক সচেতনতা ও দৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তবেই আমরা পেতে পারি একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ।

৫০ পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার

[য. বো. ১৫, ঢা. বো. ১৪, কু. বো. ১৪, রা. বো. ১২]

ভূমিকা : মানুষ ও প্রাণিজগতের বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবেশের ওপর নির্ভর করে মানুষ বা অন্য যেকোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। পরিবেশ থেকে তারা বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে। সে পরিবেশ যদি কোনো কারণে দূষিত হয়ে ওঠে তবে তা জীবের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ পরিবেশ দূষণের প্রধান নিয়ামক, আবার সে মানুষই আজ পরিবেশের সুস্থতা রক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। কারণ, এ কথা মানুষের অজানা নয় যে, পরিবেশ এভাবে ক্রমাগত প্রতিকূল হয়ে উঠলে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

পরিবেশ দূষণ কী? : পরিবেশ হলো জীবজগতের প্রাণের ধারক। মানুষের কর্মকাণ্ডে এই পরিবেশে অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতিকর পরিবর্তন হলে পরিবেশ দূষণ হয়। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। কোনো কারণে এই পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়াকে পরিবেশ দূষণ বলে। বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, মাটি দূষণ, খাদ্য দূষণ, আর্সেনিক দূষণ, তেজস্ক্রিয় দূষণ, ওজোন গ্যাস হ্রাস, গ্রিনহাউস ইফেক্ট ইত্যাদি সবকিছুই পরিবেশ দূষণের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণই পরিবেশ দূষণের জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণের ধরন : সুজলা-সুফলা নদীকেন্দ্রিক জীবন স্বভাবতই বাংলাদেশের মানুষকে করেছে প্রকৃতি ও পরিবেশপ্রেমী। কিন্তু সীমিত ভূখণ্ড ও সম্পদ এবং অতি ঘনবসতি ও দুর্যোগপ্রবণ ভৌগোলিক অবস্থান এ দেশের মানুষকে পরিবেশ দূষণের শিকারে পরিণত করেছে। পরিবেশ দূষণ মূলত দুই ভাবে হয়ে থাকে। যথা : স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক উপায়ে এবং কৃত্রিম উপায়ে। সাধারণত প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় পরিবেশে যে অবনতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে-তাই প্রাকৃতিক দূষণ। প্রাকৃতিক দূষণের মধ্যে রয়েছে সিসা, পারদ, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি। তাছাড়া আমাদের মলমূত্র এবং বিভিন্ন প্রকার পচন থেকেও প্রাকৃতিক দূষণ হয়ে থাকে। কৃত্রিম দূষণের নিয়ামক হচ্ছে নানা কীটনাশক, গুঁড়া সাবান, ওষুধপত্র ও প্রসাধন সামগ্রী, এমনকি পলিথিন। এগুলো বহুদিন ধরে পরিবেশে টিকে থাকে। রোদ, পানি, বৃষ্টি, বাতাস, এগুলোকে কিছুই করত পারে না। তাই এগুলো মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষণ করে।

পরিবেশ দূষণের কারণ : স্থান ও কালভেদে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ :

১। জনসংখ্যা বৃদ্ধি
২। অপরিকল্পিত নগরায়ন
৩। বনভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার
৪। প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার
৫। দ্রুত শিল্পায়ন
৬। সার ও কীটনাশকের ব্যবহার
৭। বনভূমি উজাড়
৮। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ
৯। গাড়ির বিষাক্ত ধোঁয়া
১০। ওজোন স্তরের ক্রমাবনতি
১১। অ্যাসিড বৃষ্টি
১২। অপরিকল্পিত গৃহ নির্মাণ
১৩। দারিদ্র্য
১৪। পলিথিন ইত্যাদি।

পরিবেশ দূষণের ফলাফল : পরিবেশ দূষণ মানবসভ্যতায় বিভিন্ন ক্ষতিকর ফল বয়ে নিয়ে আসে। পরিবেশ দূষণের ফলে মানবসভ্যতা হুমকির সম্মুখীন হয়। মানবজীবনে পরিবেশ দূষণের ফলে যেসব ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা হলো–

(ক) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– বন্যা ও খরা বেড়ে যাবে।
(খ) জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হবে।
(গ) বিকলাঙ্গ মানবশিশু জন্ম নেবে।
(ঘ) মাটির উর্বরা শক্তি কমে যাবে।

(ঙ) পানি ও বায়ুদূষণের ফলে অনেক অজানা রোগ–বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যাবে।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ : পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য সারা বিশ্ব সচেতন হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে এ ব্যাপারে সচেতনতার সৃষ্টি হচ্ছে। সরকার এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবস্থা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন :

১. পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ (২০০০) ঘোষণা ও আইন করা হয়েছে।
২. টু–স্ট্রোক যানবাহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসব যানবাহনের নির্গত ধোঁয়ায় কার্বন–ডাইঅক্সাইড, সিসা, কার্বন মনোঅক্সাইডসহ ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।
৩. পরিবেশ দুষণরোধে সিএনজি জ্বালানির ব্যবহার আরম্ভ করেছে।
৪. মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
৫. বনায়ন কর্মসূচির ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
৬. পরিবেশ আদালত গঠন করা হয়েছে। এ আদালতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশে পরিবেশ অপরাধের সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা।
৭. সরকার দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) বিল ২০০২' এবং 'পরিবেশ আদালত (সংশোধন) বিল ২০০২' নামে দুটি আইন পাস করেছে।
৮. জলবায়ুর পরিবর্তনবিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করেছে।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে করণীয় : পরিবেশ দূষণ সমগ্র জীবজগতের জন্যই ক্ষতিকর। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য গোটা বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসতে হবে। অনতিবিলম্বে বের করতে হবে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার যথার্থ উপায়।

প্রথমে গোটা বিশ্ববাসীকে পরিবেশের সুস্থতা রক্ষায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। গ্রিনহাউজ গ্যাসসমূহের নির্গমন সবসময় পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া গোটা বিশ্বের জীবজগতের জন্য এক মারাত্মক হুমকি। যেসব যন্ত্র বা গাড়ি থেকে ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস বের হয় তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পাশাপাশি বিকল্প শক্তির ব্যবহার যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস, সৌরশক্তি–নির্ভর যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পরিবেশকে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক রাখতে পারে। নির্বিচারে যাতে গাছ কাটা না হয় সেদিকে সকলকে নজর দিতে হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বনায়ন বা বৃক্ষরোপণকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সারের (যেমন সম্প্রতি আবিষ্কৃত স্বর্ণা সার) ব্যবহার বৃদ্ধি পরিবেশের সুস্থতা রক্ষায় সহায়ক হতে পারে।

উপসংহার : প্রাণিজগতের জন্যই পরিবেশ প্রয়োজন। তাই পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা উচিত। তা না হলে জীবজন্তুর অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন। পরিবেশ দূষণ জাতির জন্যে এক মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এ ব্যাপারে সারা বিশ্বের মানুষের সচেতনতার মানসিকতা একান্ত অপরিহার্য। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে এ সমস্যা আরো প্রকট। তাবে দেশ ও জাতির স্বার্থে এটি মোকাবেলা অত্যাবশ্যক।

৫১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার প্রতিকার

[ঢা. বো. ১৫, চ. বো. ১৩, দি. বো. ১৩]

ভূমিকা : প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশি আক্রান্ত হয়। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন এ দেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। দেশটি নদীবাহিত পলিমাটিতে তৈরি একটি বদ্বীপ। বিশাল গঙ্গা–যমুনা–মেঘনার প্রবাহ মিলিয়ে সাত শত নদ–নদী বয়ে গেছে এ দেশের ওপর দিয়ে। তার ওপর এ দেশের দক্ষিণাংশজুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর– যার আকার অনেকটা ওল্টানো ফানেলের মতো। ফলে সাগরে ঝড় উঠলেই প্রবল দক্ষিণা হাওয়ার তোড়ে সমুদ্রের লোনা পানি উঁচু হয়ে গড়িয়ে পড়ে নিচু উপকূলে। এতে সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বন্যা, ঝড়–ঝঞ্ঝা, টর্নেডো, সাইক্লোন– তার সঙ্গে নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস ও জমিতে লবণাক্ততার আক্রমণ–এসব প্রায় প্রতিবছর লেগেই আছে। এমনি নানা দুর্যোগ এ দেশের মানুষের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নকে তছনছ করে দেয়।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ : বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। আমাদের দেশ নদীমাতৃক ও সমতল। সমুদ্রপৃষ্ঠে থেকে সামান্য উঁচু এ দেশে প্রায় প্রতিবছর কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দেয়। নিম্নে বাংলাদেশের কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিচয় তুলে ধরা হলো–

বন্যা : আমাদের দেশ একটি সমতল ভূমি, এর বুক চিরে প্রবাহিত হচ্ছে অসংখ্য নদ–নদী। হিমালয় ও অন্যান্য পর্বতে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও বরফগলা পানি নেমে আসার কারণে আমাদের নদ–নদীগুলো ধারণক্ষমতা হারায়। ফলে নদীর তীর উপচে মূল ভূখণ্ড প্লাবিত হয়। ১৯৭৪ সালের বন্যার কারণে ফসলহানিতে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। ১৯৮৮ ও ২০০৭ সালের বন্যা সবচেয়ে ভয়াবহতম। এতে দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫০/৫৪টি জেলাই প্লাবিত হয়।

জলোচ্ছ্বাস : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাস একটি ভয়াবহ দুর্যোগ। ১৯৬০, ১৯৭০, ১৯৮৫, ১৯৯১ ও ১৯৯৭ সালের জলোচ্ছ্বাস ছিল বিভীষিকাময়। ১৯৭০ সালের সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় উপকূলীয় বিশাল এলাকাকে পরিণত করেছিল মৃত্যুপুরীতে। এ জলোচ্ছ্বাসে ৫ লাখের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ১৯৮৫ সালের ঘূর্ণিঝড়ে উড়িরচর নামক জনপদ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল সবচেয়ে মারাত্মক জলোচ্ছ্বাসটি বাংলাদেশে আঘাত হানে। এতে দেশের ১৬টি জেলার ৪৭টি উপজেলা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই জলোচ্ছ্বাসে পানি ২০ ফুট উঁচু হয়ে উপকূলে আঘাত হানে। এতে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় চার লক্ষাধিক মানুষ ও প্রাণী প্রাণ হারায়।

মৌসুমি ঝড় : গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশে মৌসুমি ঝড়ের সময়। গ্রীষ্মকালে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্থানে কালবৈশাখী ঝড় হয়। এ সময় মুহূর্তের তাণ্ডবে সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় এবং ১৯৯১ সালে খুলনায় প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের কবলে সমগ্র এলাকা মুহূর্তেই বিধ্বস্ত জনপদে পরিণত হয়। ২০০২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় এবং ২০০৪ সালে নেত্রকোনা জেলায় ভয়ংকর ঝড়ে বিশাল এলাকা জুড়ে ধ্বংসলীলা চলে।

নদীভাঙন : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীর যেমন দান রয়েছে এ দেশে, তেমনি রয়েছে ধ্বংসলীলাও। প্রতিবছর নদীভাঙনে লাখ লাখ মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হচ্ছে। জামালপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, চাঁদপুর নদীভাঙনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বগ্রাসী পদ্মার গ্রাসে অসংখ্য জনপদ বিলীন হয়ে গেছে অবলীলায়।

ভূমিকম্প : বাংলাদেশ সুনিশ্চিতভাবে ভূমিকম্প বলয়ে অবস্থিত। যেকোনো মুহূর্তে আমাদের দেশে ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতে পারে। বিশেষত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় তীব্র ভূমিকম্প হতে পারে। বাংলাদেশে যদিও এ পর্যন্ত বড় কোনো ভূমিকম্প হয়নি, তবে বড় কোনো ভূমিকম্প হলে যে ক্ষয়ক্ষতি হবে তা কল্পনাতীত।

দুর্যোগ প্রতিরোধের উপায় : প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি অভিশাপ। এ অভিশাপ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে বিশ্বজুড়ে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। এসব প্রস্তুতির মধ্যে পড়ে আগাম সতর্কতা, দুর্যোগকালে ক্ষয়ক্ষতির প্রশমন, দুর্যোগের পর পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন, দুর্যোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে যাতে দুর্যোগ না ঘটে সেজন্য

অবকাঠামোগত ও সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। এসবের প্রস্তুতিকল্পে বাংলাদেশও বেশ সোচ্চার। আমাদের দেশে চিরাচরিতভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা বলতে বোঝায় দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার পর সাহায্য দানের মাধ্যমে তার ৰয়ৰতি নিরসনের চেষ্টা করা। কিন্তু আজ আর এই ধারণা নিয়ে দুর্যোগ মোকাবেলা হচ্ছে না। এর জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে অভিনব পদ্ধতিতে। যেমন–

১. দুর্যোগ ঘটার পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সেজন্যে বিশেষ ধরনের কর্মীবাহিনী সৃষ্টি এবং জনগণকে প্রশিৰিত করে তোলা।
২. জাতীয় ভিত্তিতে দুর্যোগ মোকাবেলা করার নীতিমালা পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন।
৩. জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা।
৪. পরীৰিত পদ্ধতির ভিত্তিতে যথাসময়ে সতর্কতা সৃষ্টির আয়োজন।
৫. দ্রুত ৰয়ৰতি ও চাহিদা নিরূ পণের ব্যবস্থা করা।
৬. তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা উন্নত করা।
৭. সামরিক বাহিনীকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কাজে সমন্বয় সাধন করা।
৮. থানা, জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটি নিয়ে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা।
৯. দুর্যোগ মোকাবেলায় নিয়োজিত কর্মীবাহিনীর বিশেষ প্রশিৰণের ব্যবস্থা করা।
১০. সর্বোপরি দুর্যোগের সম্ভাব্যতা ও সেগুলোর মোকাবেলা করার পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদৰেপ : বাংলাদেশেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, গবেষণাকর্ম পরিচালনা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা দান প্রভৃতির উদ্দেশে ১৯৯৩ সালে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো। দুর্যোগের কারণে প্রাণহানি ও সম্পদের ৰয়ৰতি হ্রাসসহ দুর্যোগ–উত্তরকালে জাতীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করাই এর মূল লৰ্য।

উপসংহার : এককালে মানুষের ধারণা ছিল প্রকৃতির ওপর যেকোনো উপায়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই সবচেয়ে জরৰরি। আজ সে ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। কেননা দেখা যাচ্ছে, এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বন ধ্বংস করে, নদীর প্রবাহ বন্ধ করে, পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে মানুষ নিজের জন্যে সমূহ বিপদ ডেকে এনেছে। তাই আজ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য নয়, মানুষ গড়ে তুলতে চাইছে প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ। আর চেষ্টা করছে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে প্রকৃতির সহায়তায় তার নিজের জীবনধারাকে আগামী দিনের সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

৫২ বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা ও সমাধান

[চ. বো. ১৪, দি. বো. ১১]

ভূমিকা : জনসংখ্যা বিস্ফোরণে ভারাক্রান্ত তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ বাংলাদেশ। উন্নয়ন অগ্রগতি ও অর্থনীতির গতিশীল চাকাকে জনসংখ্যা সমস্যা মন্থর করে দিয়েছে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আজ তাই জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূ পান্তর করা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। জনসংখ্যা যখন কোনো দেশের সমস্যার বদলে শক্তিতে পরিণত হয়, তখন আমূল পরিবর্তন ঘটে সেই দেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতির।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য : আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতর দেশগুলোর অন্যতম। এ দেশের জনবসতি অত্যন্ত ঘন। সরকারের এক হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশের মোট লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। বাংলাদেশে ১৫ বছরের কম এবং ৬০ বছরের বেশি বয়সের লোকের সংখ্যা অধিক হওয়ায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করতে পারছে না। পুরবষের সংখ্যা আর নারীর সংখ্যা প্রায় সমান হলেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পুরবষের মতো নারী সমান অবদান রাখতে পারছে না। দেশের মাত্র এক–তৃতীয়াংশ লোক শিৰিত। ব্যাপক নিরৰরতা জনসংখ্যা সমস্যাকে করে তুলেছে প্রকট।

জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি : দ্রুত বেড়ে চলেছে পৃথিবীর জনসংখ্যা। পৃথিবীর মানুষকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্যে প্রতিবছর ১১ জুলাই তারিখে পালিত হয় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ৭০০ কোটি। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী এর মধ্যে শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনসংখ্যার পরিমাণ প্রায় ৪৫০ কোটি। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন যে, আগামী এক দশকের মধ্যেই বিশ্বের জনসংখ্যা আরো প্রায় একশ কোটি বেড়ে যাবে এবং এই বৃদ্ধির শতকরা ৯০ ভাগ ঘটবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। তাই জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূ পান্তরিত করতে না পারলে পিছিয়ে–পড়া দেশগুলোর দুর্বল অর্থনীতি ক্রমেই নাজুক ও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ : পৃথিবীতে জনসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে অথচ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে গাণিতিক হারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় সম্পদ কমহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেখা দিচ্ছে খাদ্য ঘাটতি। বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির অনেকগুলো কারণ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য এবং নিম্নমানের জীবনযাত্রা, অশিৰা, ভৌগোলিক প্রভাব, ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কার, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ, জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচ্য। এছাড়াও বিনোদনের অব্যবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, মৃত্যুহার হ্রাস ইত্যাদিও বিশেষভাবে উলেৱখযোগ্য।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল : বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সুচিকিৎসা, শিৰা, বিশুদ্ধ পানি ইত্যাদির অভাব বেড়েই চলেছে। ফলে জীবনযাত্রার মানেরও ঘটছে অবনতি সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। প্রধান কিছু সমস্যা হচ্ছে–

ক. বাংলাদেশের তীব্র খাদ্যসংকটের মূল কারণ অত্যধিক জনসংখ্যা। খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য বাংলাদেশকে প্রতিবছর ১০–১২ লৰ টন খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দারৰণভাবে বাধাগস্ত হচ্ছে।

খ. বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নের গতি অত্যন্ত মন্থর। কৃষির ওপরেও রয়েছে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ। অন্যদিকে দেশে সঠিক কর্মব্যবস্থাপনা না থাকায় জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ বেকার থাকছে। এ সমস্যা ক্রমেই জটিলতর রূ প ধারণ করছে। বর্তমানে দেশের কর্মৰম লোকদের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগই বেকার জীবনযাপন করছে।

গ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে পালরা দিয়ে বাসস্থান নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না। ফলে শহরাঞ্চলে বাসস্থান সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে বাড়তি জনসংখ্যার জন্য বাসস্থান তৈরি করতে গিয়ে কমে আসছে চাষের জমির পরিমাণ।

ঘ. জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাবে ততই স্কুল–কলেজের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান লোকের শিৰার জন্যে দরিদ্র এ দেশ প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধা দিতে পারছে না। অনেক ৰেত্রে দারিদ্র্য এবং অপুষ্টির। কারণে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিৰা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে যাচ্ছে শিৰিতের হার।

ঙ. দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে। জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের অপ্রতুলতা, ময়লা ও পানি নিষ্কাশনের অব্যবস্থা, ব্যাপকহারে বৃক্ষ নিধন, অনিয়ন্ত্রিতভাবে কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদি ঘটছে। এর ফলে দেশের পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য মারাত্মক দূষণের শিকার হচ্ছে।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় : কোনো সমস্যাই চিরকাল স্থায়ী হয় না। সব সমস্যারই কোনো-না-কোনো সমাধান এবং প্রতিকার রয়েছে। উন্নয়নকামী দেশ জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান খোঁজে অগ্রগতির পথ পাওয়ার জন্য। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটি উপায়। যেমন–

ক. দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতির হারকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি করতে পারলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

খ. শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমাজ থেকে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি দূর করে জনসাধারণকে পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে।

গ. পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের চেয়ে গুণগত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই জনসংখ্যা সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব। এ লক্ষ্যে দেশে শিক্ষার বিস্তার, কারিগরি দক্ষতার বিস্তার এবং কর্মশক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থার দ্বারা জনসংখ্যার গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে একে সমস্যার বদলে সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব।

ঘ. বাংলাদেশে আয়ের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বিদ্যমান। আয়ের সুষম বণ্টন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব।

ঙ. সর্বোপরি আইন প্রণয়নের মাধমে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ ও গর্ভপাত অনুমোদন করা সম্ভব হলে জনসংখ্যা হ্রাস পাবে। এছাড়া বিয়ের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি করতে হবে। ব্যাপক প্রচার এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধমে এই আইনসমূহের সফল প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

উপসংহার : পরিকল্পিত পরিবার গঠন ও জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি সর্বজনীন জাতীয় নীতিমালা প্রণীত হওয়া আবশ্যক। সাথে সাথে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে এবং জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে। আর তাহলেই জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

৫৩ ভূমিকম্প ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

ভূমিকা : বাংলাদেশের এই সবুজ ভূখণ্ডে মাঝে মাঝেই আঘাত হানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নিয়মিত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতায় আমরা প্রতিবছরই ক্ষতিগ্রস্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে ভূমিকম্প আতঙ্কই আমাদের মাঝে সর্বাধিক দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে। কারণ ভূমিকম্প কোনো রকম পূর্ব সংকেত ছাড়াই ভূপৃষ্ঠকে কাঁপিয়ে দেয়। বেশ কয়েক বছর ধরে অনেকগুলো মৃদু থেকে মাঝারি ভূমিকম্প আমাদের দেশে আঘাত হেনেছে। হাইতির পর সাম্প্রতিককালে নেপালের ভূমিকম্প আমাদের উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভূমিকম্প কী এবং কেন? : ভূত্বক পরিবর্তনকারী প্রক্রিয়াসমূহ প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল। কোনো কারণে ভূঅভ্যন্তরের বিপুল শক্তি দ্রুত মুক্ত হওয়ার সময় ভূপৃষ্ঠে যে প্রবল ঝাঁকুনি বা কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকে ভূমিকম্প বলে। ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুযায়ী পৃথিবীর এক প্রান্তে অবস্থিত ভূকম্পনকেন্দ্র থেকে সৃষ্ট তরঙ্গমালা পৃথিবীর অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। অবশ্য কেন্দ্র হতে তরঙ্গগুলো যতই দূরে অগ্রসর হয়; ততই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মৃদু কিংবা প্রবল ভূমিকম্প মাপার এককের নাম রিখটার স্কেল। ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধানকালে ভূতত্ত্ববিদগণ লক্ষ করেন, পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে অধিক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে : বাংলাদেশের ভূখণ্ডে মোট ৮টি ভূচ্যুতি এলাকা ক্রিয়াশীল। এগুলো হচ্ছে বগুড়ার তানোর, ত্রিপুরা, সীতাকুন্ড-টেকনাফ এলাকা, হালুয়াঘাট, ধুবরি, চিটাগাং, শাহীবাজার এবং রাঙামাটি। এসব ভূচ্যুতির জন্য বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। এ ছাড়া ইন্ডিয়া-ইউরেশিয়া-বার্মা টেকটোনিক পেরটের সীমান্তবর্তী এলাকার নিকটে বাংলাদেশের অবস্থান। হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এই টেকটোনিক পেরট বন্ধ হয়ে আছে। ফলে এটি শক্তি সঞ্চয় করছে। যখন সেই শক্তির কাছে এ টেকটোনিক পেরট বন্ধনমুক্ত হবে, তখন শক্তিশালী ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। যা বাংলাদেশ, উত্তর ভারত ও মায়ানমারে মারাত্মক আঘাত হানতে পারে। জানুয়ারি ২০০৬-ডিসেম্বর ২০০৯ এ তিন বছরে ৪ রিখটার স্কেলের ওপরের মাত্রার ১১৫টি ভূমিকম্প রেকর্ড করেছে। এছাড়াও ৫ রিখটার স্কেলের আরও দশটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এ সময়ে। বঙ্গোপসাগরে চারটি ভূমিকম্পের উৎস ক্রিয়াশীল থাকায় এ অঞ্চলগুলো সুনামিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

বাংলাদেশে ভূমিকম্পের সংরক্ষিত ইতিহাস : বাংলাদেশে ১৫৪৮ সাল থেকে সংঘটিত ভূমিকম্পসমূহের তথ্য সংরক্ষিত আছে। ভূমিকম্পের এ তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯০০ সাল থেকে প্রায় ১০০টি মাঝারি থেকে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, যার মধ্যে ৬৫টি আঘাত হেনেছে ১৯৬০ সালের পর থেকে। এ তথ্য থেকে আরও জানা যায় গত ত্রিশ বছরে দেশে ভূমিকম্পের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আমাদের দেশের জন্য অশনী সংকেত।

ভূমিকম্পে ক্ষতির কারণ ও পরিমাণ : ভূমিকম্পের সময় মাটির তারল্যিকরণ ঘটে এবং মাটির ধারণক্ষমতা কমে যায়। ফলে বড় বড় ভবনগুলোকে মাটি ধরে রাখতে পারে না। যে কারণে সেগুলো ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ইউএআইডি ঢাকা শহরে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কারণ বিশ্লেষণ করেছে, যা প্রায় ক্ষেত্রে সারা বাংলাদেশের শহরগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এগুলো নিম্নরূপ–

i. ভূমিকম্পের পরপরই কী করণীয়- এ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পেতে পারে।

ii. শহরের বেশিরভাগ বিল্ডিং ভাসমান অথবা কম গভীর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, ফলে এগুলো দেবে যেতে পারে।

iii. বর্ষার সময় যদি ভূমিকম্প হয় তবে মাটিতে পানির পরিমাণ বেশি থাকায় ধ্বংসযজ্ঞ ভয়াবহ রূপ লাভ করতে পারে।

iv. গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, যা ভূমিকম্প-পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে ব্যাঘাত ঘটাবে।

v. রাস্তা-ঘাট-ব্রিজ-কালভার্ট ভেঙে গিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হতে পারে।

vi. পুরাতন ও নিম্নমানের স্কুল-ভবন ভেঙে অনেক ছাত্রছাত্রীর মৃত্যু ঘটতে পারে। যার ফলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ লাভ করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে ৭.৫ মাত্রার একটি বড় ভূমিকম্প ঢাকা শহরে লক্ষাধিক মানুষ এবং প্রায় ৭২,০০০ ভবন ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর বন্দরনগরী চট্টগ্রামের অবস্থা আরও বেশি খারাপ।

ভূমিকম্প মোকাবেলায় আমাদের করণীয় : ভূমিকম্প এক ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার পূর্বাভাস দেওয়ার মতো কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়নি। এ কারণে ভূমিকম্পে যাতে অধিক জানমালের ক্ষতি না হয় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সরকার অনুমোদিত বিল্ডিং কোড অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করতে হবে। ভূমিকম্পের পরবর্তী সময়ে যেন খাদ্য, পানীয় ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যায় সেদিকে সরকারকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তবে সরকারের একার পক্ষে এ ধরনের মহাবিপর্যয় মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন দাতাসংস্থা ও এনজিও এক্ষেত্রে

নানা ভূমিকা পালন করতে পারে। দাতাসংস্থাগুলো ভূমিকম্প মোকাবেলায় সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদৰেপে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সহযোগিতা করতে পারে। ভূমিকম্পের ওপর যে উন্নত প্রযুক্তি বিদেশে উদ্ভাবিত হয়েছে, আমাদের দেশের প্রকৌশলীদের সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত করতে হবে।

ভূমিকম্প মোকাবেলায় বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা : ২০১০ সালে ভূমিকম্পের পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে সরকার। ৬০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক প্রশিৰণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বড় মাত্রার ভূমিকম্পের জন্য এ প্রস্তুতি বড়ই অপ্রতুল। বড় কোনো বিপর্যয় মোকাবেলা করার মতো সামর্থ্য এখনও তৈরি হয়নি আমাদের।

উপসংহার : ভূমিকম্প পৃথিবীর সবচেয়ে আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটি একটি দেশের আবাসিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে ভূমিকম্প তাই অভিশাপের দ্বিতীয় নাম। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলোর মধ্যে। এ কারণে অপ্রত্যাশিত হলেও বড় ধরনের ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশ।

৫৪ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার

[সি. বো. ১২, ব. বো. ১০]

ভূমিকা : বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণে–অকারণে নিত্যপণ্যের দাম বর্তমানে বেড়েই চলেছে। ফলে জনজীবন তীব্র ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। ক্রমাগত পণ্যমূল্য বৃদ্ধি জনজীবনে অসন্তোষ, ক্রোধ ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত করে। বর্তমান সমাজজীবনে ধর্মঘট, আন্দোলন এগুলোর পেছনে প্রত্যৰ বা পরোৰভাবে অভাব ও দরিদ্রতাই দায়ী। আর দরিদ্রতার মূলে রয়েছে পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি। তাই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আজ আমাদের সামাজিক, জাতীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্রব্যমূল্যের সাথে জীবনযাত্রার সম্পর্ক : দ্রব্যমূল্যের সাথে জীবনযাত্রার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে সমাজের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। মানুষকে প্রতিদিনই নানাবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে হয়। আর এরূ প কেনাকাটা যদি তার আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে তার দুরবস্থার সীমা থাকে না। আমাদের দেশের বেশিরভাগ শ্রমিক কর্মচারীর আয় সামান্য। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে এ সীমিত আয় দ্বারা জীবন নির্বাহ তাদের পৰে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন সাধ ও সাধ্যের ব্যাপক ব্যবধানে জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ ও হতাশা। পৰান্তরে, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকলে তাদের জীবনে থাকে স্বস্তি।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ : বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির নানাবিধ কারণ রয়েছে। তবে উৎপাদন অব্যবস্থাপনাই যে এর মূল কারণ এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্যহীনতা। ফলে সীমাবদ্ধ জিনিসের জন্য অগণিত ক্রেতার ভিড় এবং পরিণামে মূল্যবৃদ্ধি ও জিনিস সংগ্রহের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা। বস্তুত, মজুতদারেরাই নিজেদের লাভের জন্য জিনিসপত্রের দাম চড়িয়ে দেয় এবং তাদের দেখাদেখি ব্যবসায়ীরা বেশি মুনাফার পথ বেছে নেয়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ৰতিকর দিক : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব সবটাই জনগণের ওপর পতিত হয়। জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনে কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি ক্রয় করতে হয়। দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বল্প আয়ের মধ্যে জীবন যাপন করে এবং তাদের পৰে অতিরিক্ত মূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা প্রায় অসম্ভব। ফলে বাধ্য হয়ে তারা ব্যয় বরাদ্দ কমাতে থাকে। বাজারে জিনিসের দাম বাড়ছে তাতে শিশুদের ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের পরিমাণ কমছে। ফলে শিশুদের ওপর যে প্রভাব পড়ে তাতে তাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না, তারা অপুষ্টির শিকার হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে যে আর্থিক সংকটের সৃষ্টি হয় তাতে ছাত্র–ছাত্রীদের জীবনেও প্রভাব পড়ে খাদ্য, পোশাক, শিৰা উপকরণ ইত্যাদির অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিজনিত আর্থিক সংকট কাটানোর জন্য অনেকে অবৈধ উপার্জনের দিকে মনোযোগী হয়। ফলে সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

জনজীবনে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মানুষের জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে জনজীবন আজ সংকটের সম্মুখীন। এগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিৰ ও মহামারি প্রধান। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ অভাবের তীব্রতা ও শোচনীয় দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত। তারা দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্তি পেতে কখনও ধর্মঘট করে আবার কখনও বা বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলনে নামে। তাদের আন্দোলনের মুখে সরকার সামান্য বেতন বৃদ্ধি করলেও মূল্যবৃদ্ধির দুর্বার আগ্রাসী শক্তির সঙ্গে তারা সামঞ্জস্য রৰা করতে ব্যর্থ হয়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের উপায় : নানা কারণে আজও আমাদের এই দরিদ্র দেশটিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বেড়েই চলছে। তাই যথাশীঘ্র সম্ভব এই দুষ্ট রাহু থেকে মুক্তির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বাজারে চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পণ্যের জোগান নিশ্চিত করতে হবে। কল–কারখানার উৎপাদন নিয়মিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি প্রক্রিয়ায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য মজুদদারি ও কালোবাজারি দূর করতে হবে। মুদ্রাস্ফীতি যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। অসাধু ও ফটকা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বোপরি সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে এবং কেউ যেন হঠকারী সিদ্ধান্ত দিয়ে দ্রব্যের মূল্যকে প্রভাবিত করতে না পারে সেদিকে লৰ রাখতে হবে। তবে শুধু সরকারের একার পৰে এর সমাধান দেওয়া কঠিনতর ব্যাপার। সরকারের পাশাপাশি সচেতন জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অসাধু মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের নৈতিকতাবিরোধী কার্যক্রম পরিহারই এই সমস্যার আশু সমাধান দিতে পারে।

উপসংহার : দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে দেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশা বাড়বে। কিন্তু আমাদের দেশের এই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। দেশের সাধারণ মানুষের দিকে তাকিয়ে এই দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরতে হবে। সর্বোপরি বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে যেভাবে জিনিসের দাম বেড়েছে তার সঠিক প্রতিরোধ আমাদের একার পৰে সম্ভব নয়। তবুও তার ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য সব নাগরিককে আদর্শ দেশপ্রেমিক হতে হবে– দেশকে ভালোবাসতে হবে এবং উৎপাদন বাড়িয়ে নিজস্ব দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

৫৫ ইভ টিজিং

ভূমিকা : সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ইভ টিজিং। এটি একটি মারাত্মক অপরাধ, যা আমাদের সমাজকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এর বিষাক্ত ছোবলের শিকার হয়ে অনেক মেয়ের জীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একে আমাদের সমাজে যৌন হয়রানিও বলা হয়ে থাকে। নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে অনেক বখাটে নির্লজ্জের মতো আচরণ করছে ইভ টিজিংয়ে লিপ্ত হয়ে।

ইভ টিজিংয়ের স্বরূ প : খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল অনুযায়ী 'ইভ' (Eve) হচ্ছেন পৃথিবীর আদিমাতা। বর্তমানে এই 'ইভ' শব্দটি নারীকে রূ পক অর্থে প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। আর 'টিজিং' (Teasing) অর্থ হলো উত্ত্যক্ত করা বা বিরক্ত করা। তাই ইভ টিজিং শব্দটি দ্বারা বোঝায় নারীকে উত্ত্যক্ত করা। আমাদের দেশে একে যৌন হয়রানি হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে যাকে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একে বলা হয় 'Sextual Harassment'। ১৯৭৫ সালে আমেরিকান কর্নেল অ্যাস্টিভিস্টরা সর্বপ্রথম এ শব্দটি ব্যবহার করেন। বিশিষ্টজনদের মতে অশালীন চাহনির মাধ্যমে মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করা, তাদেরকে দেখে শিস বাজানো, বাজে মন্তব্য করা, অপ্রত্যাশিতভাবে বা আচমকা কোনো মেয়ের সামনে লাফিয়ে পড়া, হঠাৎ হাততালি দেওয়া, বিনা অনুমতিতে ক্যামেরা অথবা মোবাইল দিয়ে মেয়েদের ছবি তোলা, মেয়েদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে মিসড কল বা কল দেওয়া কিংবা মেসেজ পাঠানোর মতো আপত্তিকর কাজগুলো ইভ টিজিংয়ের পর্যায়ে পড়ে। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করা হয়। এগুলো মানসিক বিকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইভ টিজিং : বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে ইভ টিজিং ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমাদের সংবিধানের ২৭ ও ২৮ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী–পুরুষের সমান অধিকার লাভের কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ দেখা যায় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা এখনও অনেক ক্ষেত্রে অসহায়ত্বের শিকার হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা বর্ষবরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পবিত্র শিক্ষাঙ্গনেও ইভ টিজিংয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে মেয়েদের। এখানেই শেষ নয়। স্কুলছাত্রী থেকে শুরু করে আদিবাসী তরুণী কেউই রেহাই পায়নি বখাটেদের হাত থেকে। জ্ঞান প্রদানকারী শিক্ষকও এখন ভক্ষকে পরিণত হয়েছে। নারীরা কোথাও নিরাপদ নয়।

ইভ টিজিংয়ের কারণ : ইভ টিজিং মূলত এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। এর পেছনে বিভিন্ন কারণ মুখ্যত দায়ী। এই কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

(১) নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় : সময়ের সাথে সাথে যুগের পরিবর্তনে মানুষের চিন্তা–চেতনা আধুনিক হলেও তার নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের যুবসমাজ বিপথগামী হচ্ছে এবং নৈতিক শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটার কারণে তারা ইভ টিজিংয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে।

(২) দুর্বল আর্থ সামাজিক অবস্থা ও বেকারত্ব : দরিদ্র পরিবারের উঠতি বয়সের ছেলেরা কিংবা বেকার ছেলেরা দিশাহারা হয়ে পথে–ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় কাটানোর জন্য তারা পার্কে কিংবা রাস্তার মোড়ে জটলা পাকায়। এ সময় তারা বিনোদনের জন্য যেকোনো মেয়েকে দেখলেই ইভ টিজিং করতে থাকে।

(৩) দুর্বল পারিবারিক শিক্ষা : যেসব পরিবারে বাবা–মা তার পুত্রসন্তানকে প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে তারা ইভ টিজিংয়ের মতো নোংরা কাজে জড়িত হয় না। কিন্তু যেসব পরিবারের কাঠামো দুর্বল এবং সন্তানরা পিতা–মাতার কাছ থেকে যথার্থ শিক্ষা পায় না তারা সহজেই যেকোনো অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে।

(৪) অপসংস্কৃতির প্রভাব : ইভ টিজিংকে উৎসাহিত করতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কিংবা অপসংস্কৃতি বিরাট নেতিবাচক প্রভাব রাখছে। টেলিভিশনে নানা ধরনের কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখে আজকের যুবসমাজ একে ফ্যাশন বলে মনে করে। ফলে সমাজে ইভ টিজিং বাড়ছে।

(৫) মেয়েদের অশালীন পোশাক পরিধান : বর্তমানকালে আধুনিক ফ্যাশনের নামে মেয়েদের অশালীন নানা পোশাক পরিধান করতে দেখা যায়। এসব পোশাক প্রকারান্তরে ছেলেদেরকে ইভ টিজিংয়ে প্ররোচিত করে, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

উপর্যুক্ত নানা কারণে ইভ টিজিং সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে।

ইভ টিজিং প্রতিরোধে করণীয় : ইভ টিজিং প্রতিরোধে সকলের সচেতন অবস্থান তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি আরও নানা করণীয় রয়েছে আমাদের। এগুলো হলো–

(১) মেয়েদেরকে মজবুত মানসিকতার অধিকারী করে গড়ে তুলতে হবে

(২) তরুণ ছেলেদের মনে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে হবে।

(৩) পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ইভ টিজিংয়ের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরতে হবে।

(৪) ইভ টিজিংয়ের শিকার হওয়া যেকোনো মেয়েকে পরিবার থেকে সহানুভূতি ও ভালোবাসা দিতে হবে।

(৬) পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কিংবা অপসংস্কৃতির প্রভাব থেকে তরুণ প্রজন্মকে বাঁচানোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৭) নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে অন্যায়বোধ জাগ্রত করতে হবে।

(৮) নারী–পুরুষ সকলকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার শিক্ষা দিতে হবে। এর মাধ্যমে তারা সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হবে, যা ইভ টিজিংয়ের মতো অনৈতিক কাজকে নিরুৎসাহিত করবে।

(৯) ইভ টিজিংবিরোধী সভা–সমাবেশ ও সেমিনারের আয়োজন করা।

(১০) প্রচারমাধ্যমগুলোতে ইভ টিজিং প্রতিরোধে অনুষ্ঠান আয়োজন।

(১১) আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশের সহয়তা নেওয়া।

ইভ টিজিং প্রতিরোধে সরকার গৃহীত পদক্ষেপ : ইভ টিজিং প্রতিরোধে সরকারের পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে–

(১) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারিক ক্ষমতার তত্ত্বাবধানে ভ্রাম্যমাণ আদালত ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এতে ৫০৯ ধারা সংযোজন করে তাৎক্ষণিকভাবে বখাটেদের শাস্তি দেওয়ার বিধান রাখা হয়।

(২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন–২০১০'–এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপসংহার : ইভ টিজিং একটি ভয়ংকর সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এ সমস্যা সমাধানকল্পে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জনগণ এবং সরকার উভয়ের সম্মিলিত উদ্যোগই পারে ইভ টিজিংকে কঠোর হাতে দমন করতে। আমাদের সমাজকে ইভ টিজিং থেকে রক্ষা করতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। তাই সকলকে সচেতন হতে হবে এবং প্রতিবাদ করতে হবে ইভ টিজিংয়ের বিরুদ্ধে।

৫৬

বাংলাদেশের বেকার সমস্যা ও তার প্রতিকার

সূচনা : কাজেই মুক্তি। কাজই সমৃদ্ধি। কর্মহীন জীবন কফিনে ঢাকা লাশ। মানুষের দুটি হাতকে দক্ষ কর্মীর হাতে পরিণত করলে সমৃদ্ধি আসবেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য, এই আধুনিক যুগে মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ জনশক্তিতে পরিণত হয় না। কর্মহীন বেকার জীবনের অভিশাপ বয়ে বেড়ায়। বিপুল জনসংখ্যার আর সীমিত সম্পদের কারণে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ বিশ্বমানচিত্রে পরিচিত। এই জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে পারলে তাদের দুই হাতের ছোঁয়ায় দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরবে, আসবে সমৃদ্ধি। এজন্য প্রয়োজন বেকারত্বের অভিশাপমুক্ত দেশ।

বেকারের সংজ্ঞা : সাধারণ অর্থে, যার কোনো কাজ নেই তাকে বেকার বলা হয়। কিন্তু অর্থনীতির পরিভাষায় কর্মহীন মানেই বেকার নয়। যদি কোনো ব্যক্তির কাজ করার যোগ্যতা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থান বা কাজের সুযোগ না পান তবে অর্থনীতির পরিভাষায় তিনিই বেকার। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বেকারত্ব এমন এক সামাজিক অবস্থার নাম যখন সমাজের যথেষ্ট কর্মক্ষম ব্যক্তির বিপরীতে কর্মের সুযোগ থাকে খুবই কম।

বাংলাদেশের বেকারত্বের চিত্র : বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এখানে পর্যাপ্ত শিল্প–কারখানা নেই। বেসরকারি কর্মসংস্থান ও সরকারি চাকরির

সীমিত সুযোগের কারণে এ দেশে কর্মক্ষম অধিকাংশ মানুষ কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। পরিসংখ্যান অনুসারে, দেশে কর্মক্ষম লোকের ২৭.৯৫ শতাংশ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো জনসংখ্যার একটি বড় অংশ মৌসুমি বা প্রচ্ছন্ন বেকার। যাদের সারা বছর কাজ থাকে না, বছরের বিশেষ সময়ে কাজ করেন তাদেরকে মৌসুমি বা প্রচ্ছন্ন বেকার বলা হয়।

বেকার সমস্যার কারণ : বাংলাদেশের বেকার সমস্যার জন্য কোনো একক কারণ দায়ী নয়। কারণগুলো নিচে তুলে ধরা হলো :

ক. ঔপনিবেশিক শোষণ : বাংলাদেশে বিদ্যমান বেকার সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে। বাংলাদেশের বেকারত্বের অভিশাপ সৃষ্টির অন্যতম কারণ দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও বঞ্চনা। ইংরেজি ঔপনিবেশিক শক্তি এ দেশের প্রচলিত শিল্পকে ধ্বংস করে নিজেদের পণ্যের বাজারে পরিণত করেছিল। পাকিস্তানি শাসনের প্রভাবেও এ দেশের অর্থনীতির ভিত্তি ধ্বংস হয়েছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শোষকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে নব্য স্বাধীন দেশকে দাবিয়ে রাখতে। তাদের শোষণ ও বঞ্চনা বাংলাদেশে বেকারত্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে।

খ. ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা : আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সেই ইংরেজ আমলে। ইংরেজরা প্রশাসনিক ও তাদের ব্যবসার হিসাব সংরক্ষণের কাজের জন্য এ দেশীয় কেরানি শ্রেণি গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে একটি শিক্ষাব্যবস্থা এই জাতির ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজরা চলে যাওয়ার এত বছর পরও শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। ফলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক যুগের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে।

গ. জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে কর্মসংস্থান হচ্ছে না : প্রতিবছর যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে অনুপাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। কর্মসুযোগ হ্রাস ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ অসম অনুপাত বেকারত্বকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলছে।

ঘ. কুটিরশিল্পে ধস : ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের কুটিরশিল্পে ছিল ঐতিহ্যবাহী। এ দেশের কামার, কুমার, কাঁসারি, শাখারি, তাঁতি, বাঁশ, ও বেতজীবী মানুষেরা নীরবে নিভৃতে নিজ নিজ চিরাচরিত পেশায় নিয়োজিত ছিল। কিন্তু যন্ত্রসভ্যতা, শিল্পবিপ্লব এবং যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ দেশের কুটিরশিল্প বিলুপ্তির পথে। ঐতিহ্যবাহী দেশীয় পণ্যের বদলে দিন দিন কল-কারখানায় তৈরি পণ্য চাহিদা বাড়ছে। ফলে কুটিরশিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবীরা কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছে।

ঙ. অপর্যাপ্ত শিল্পায়ন : প্রতিদিন কৃষিব্যবস্থা সংকুচিত হয়ে আসছে। প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ার সাথে কৃষিকাজে শ্রমিকের চাহিদা কমছে। কাজেই শুধু কৃষির ওপর নির্ভর না করে ব্যাপকভিত্তিক শিল্পায়ন হলে কেবল বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব। শিল্পোন্নত জাপানে বেকারত্বের হার ৫% এর নিচে, যুক্তরাষ্ট্রে ৭% ও যুক্তরাজ্যে ৯% মাত্র। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। এ দেশে মূলত শ্রমঘন ও কৃষিনির্ভর শিল্প গড়ে না ওঠায় বেকারত্ব প্রতিদিন তীব্র আকার ধারণ করছে।

চ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : বাংলাদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বন্যা, খরা, নদীভাঙন প্রভৃতি দুর্যোগ কৃষিকাজ ব্যাহত করে এবং গ্রামীণ জীবনে বেকারত্ব ডেকে আনে। বিশেষ করে নদীভাঙনের ফলে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ জমিজমা ও ঘরবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। জীবিকার অভাবে অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি, দিনমজুরি প্রভৃতিতে লিপ্ত হতে হয়।

ছ. কায়িক শ্রমের অবমূল্যায়ন : আমাদের দেশে শারীরিক শ্রমকে অশিক্ষিত ও মূর্খদের কাজ বলে মনে করা হয়। ফলে লেখাপড়া করে অফিস-আদালতের বাইরে শারীরিক শ্রমমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। অনেকে শারীরিক কাজ করাকে অসম্মানজনক মনে করে, তারা কায়িক শ্রমের কাজের চেয়ে বেকার থাকতে পছন্দ করে। এমন ভুল মানসিকতাও বেকারত্ব বাড়ার অন্যতম কারণ।

জ. নষ্ট রাজনীতি : বেকারত্বের অন্যতম কারণ নষ্ট রাজনীতি। স্বৈরশাসন, গণতন্ত্রহীনতা, দুর্বল নেতৃত্বের প্রভাবে দেশে নষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। দলের কর্মী সমর্থক বাড়ানোর নাম করে যুবকদের কর্মবিমুখ, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী হিসেবে গড়ে তুলে তাদের কর্মোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কবর রচনা করা হয়।

বেকার সমস্যা সমাধান : বেকারত্ব আমাদের সমাজের জন্য একটি অভিশাপ। এর ফলে অসংখ্য আর্থসামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এই সমস্যা সমাধানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার তথা প্রত্যেক নাগরিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা একটি আদর্শ ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে উলেরখ করা হয়েছে। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অবশ্যই রাষ্ট্রকে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। যে জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া জরুরি তা নিচে উলেরখ করা হলো:

ক. কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা : উপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা থেকে বের হয়ে দেশে যুগোপযোগী কর্মমুখী কারিগরি শিক্ষা প্রসার ঘটালে প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি হবে। এরা দেশে বিদেশে উৎপাদনশীল খাতে খুঁজে পাবে কাজের অফুরন্ত সুযোগ। স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলতে পারলে স্ব-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে।

খ. কৃষির সাথে বিকল্প কর্ম সৃষ্টি : কৃষিকাজে নিয়োজিত মৌসুমি ও প্রচ্ছন্ন বেকারদের জন্য কুটিরশিল্পভিত্তিক বিকল্প কাজ সৃষ্টি করতে হবে। দেশের ভেতরে ও বিদেশে কুটিরশিল্প পণ্যের বিশাল বাজার ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। কুটিরশিল্পে পুনর্জাগরণ ঘটানো গেলে বেকারত্ব লাঘবের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয়েরও ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

গ. ব্যাপক শিল্পায়ন : বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে সে অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে। এদের কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাপক শিল্পায়নের দিকে নজর দিতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে পারলে এবং শিল্পায়ন বৃদ্ধি পেলে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে দেশ রক্ষা পেতে পারে।

ঘ. দক্ষ জনশক্তি রফতানি : বিপুল জনসংখ্যাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। দেশের বাইরে দক্ষ জনশক্তির ব্যাপক চাহিদা আছে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ২০১৩ সালের হিসাবে, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় ৮৩ লাখ। এই হিসেবের বাইরেও অনেক বাংলাদেশি দেশের বাইরে কাজ করছে। প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা তারা দেশে পাঠাচ্ছে। পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী গড়ে তোলে এবং সরকারি উদ্যোগে জনশক্তি রফতানির বাজার সম্প্রসারণ করলে আমাদের দেশে বেকারত্ব কমবে।

ঙ. দক্ষ নেতৃত্ব : রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল, ধর্মঘট, আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ অন্যান্য বাধার কারণে বাংলাদেশে বিদেশি উদ্যোক্তারা পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। দক্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

চ. শূন্য পদ পূর্ণ করা : বাংলাদেশে সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। মোট পদসংখ্যা প্রায় এর দ্বিগুণ। এ শূন্য পদগুলোতে নিয়োগ দান করা হলে অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। আমাদের শিক্ষিত যুব শ্রেণি কিছুতেই চাকরি ছাড়া অন্য কোনো পেশা বা বৃত্তিকে গ্রহণের মানসিকতা পোষণ করে না। তাদের কাজ সৃষ্টিতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

ছ. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন : কায়িক শ্রমের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কৃষি ও শিল্প খাতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পরিমাণ বাড়লে যেটি আপনাআপনিই ঘটবে। কায়িক শ্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনার ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে।

উপসংহার : বেকারত্ব বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। বেকারত্বের যন্ত্রণা বেকার ছাড়া অন্য কেউ কোনো দিন অনুভব করতে পারবে না। আমাদের দেশের অনেক যুবক বেকারত্ব ঘোচাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবৈধ পথে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। বেকার জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সাগর, মরুভূমির পথে পা বাড়িয়ে দেশের হাজার হাজার যুবক প্রাণ হারাচ্ছে। এরা দেশের সম্পদ তাদেরকে বাঁচাতে হবে। সকল বাধা দূর করে দেশকে বেকার সমস্যা মুক্ত করতে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, জনপ্রতিনিধি ও বিত্তশালীদের ব্যাপকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫৭ জাতি গঠনে নারীসমাজের ভূমিকা

ভূমিকা : বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ রেখে কোনো জাতির পক্ষে উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহন করা সম্ভব নয়। কারণ নারীসমাজ দেশের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্ধেক জনশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে নারী তার পূর্ণ অধিকারের দাবিদার। কিন্তু নারী-পুরুষের অব্যাহত বৈষম্য এটাই প্রমাণ করে যে, নারীর পূর্ণ অধিকারের ব্যাপারটি কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। প্রতি বছর সারা বিশ্বে এই দিনটি গুরুত্বের সাথে পালিত হয়।

জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা : জাতি গঠনে নারী সমাজের দায়িত্ব পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। জাতীয় জীবনে সচলতা, জ্ঞান, কর্ম ও প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না হলে জাতি অচল হয়ে যায়। নারীরা যেহেতু পুরুষের মতোই সমাজের একটা অংশ, তাই পুরুষের মতো নারী সমাজকেও জাতি তথা সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে হয়। উন্নত দেশসমূহে নারী জাগরণের ফলে দেশের সমৃদ্ধি এসেছে, সমাজজীবন সচল ও গতিশীল হয়েছে। আমাদের দেশের নারীরা সমাজগঠনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এলে সমাজ যে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু সেবা ও গৃহকর্মের মধ্যে নারীকে সীমাবদ্ধ না রেখে নারীকে জাতীয় ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি সব স্তরে কর্মময় জীবনের অধিকারিণী করে তুলতে পারলে দেশের সমৃদ্ধি ও জাতির মঙ্গল ত্বরান্বিত হবে।

বাংলাদেশে নারীর বর্তমান অবস্থান : মানবজাতির অর্ধেক অংশ হয়েও নারীরা আজ বৈষম্যের শিকার। আমাদের দেশে প্রচলিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুশাসনের জালে আবদ্ধ নারীসমাজ। শিক্ষা, কর্মসংস্থান সর্বোপরি সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি নানারকম সুযোগ-সুবিধা থেকে নারীরা বঞ্চিত। বর্তমানে দেশে নারীর অবস্থানে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। প্রতিনিয়ত এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ আর যৌতুকের শিকার হচ্ছে অসংখ্য নারী। গৃহ পরিচারিকার ওপর অমানুষিক নির্যাতনের খবরও পত্রিকার পাতায় হরহামেশাই আসছে। তবে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীসমাজের অংশগ্রহণ বাড়ছে। আমাদের অন্যতম প্রধান রপ্তানি-খাত গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করছে অগণিত নারী শ্রমিক। পরীক্ষার মেধা তালিকায় চোখ বুলালেও দেখা যায় মেয়েদের প্রাধান্য। তারপরও সমাজে নারীকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয় না। চলার প্রতিটি পদক্ষেপেই নারী অসাম্যের মুখোমুখি হয়। বাবার সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ের অসম অধিকার, পারিবারিক আইনে নারীর অসম অধিকার, জাতীয় সম্পদে নারীর অসম অধিকার, যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীকে উপেক্ষা- রাষ্ট্রের আয়নায় এখনও নারীর অমর্যাদার প্রতিচ্ছবিই তুলে ধরে।

নারী উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা : নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে মানবজাতির কল্যাণের প্রশ্ন জড়িত। দেশে নারীর মর্যাদা আর অবস্থান থেকেই অনুধাবন করা যায় একটি দেশ কতখানি উন্নত বা সভ্য। তাই নারীকে পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা দেওয়ার জন্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, পেশা-শ্রেণি নির্বিশেষে সকলের গণতান্ত্রিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নারীকে দিতে হবে তার ন্যায্য পারিশ্রমিক, যথাযথ মর্যাদা। মনে রাখতে হবে বিশ্বের মেধা, দক্ষতা, প্রতিভার অর্ধেক ভাণ্ডার সঞ্চিত রয়েছে নারীর কাছে। এই অব্যবহৃত বা স্বল্প ব্যবহৃত মানব-সম্পদের সদ্ব্যবহার পুরো মানবজাতির স্বার্থেই জরুরি।

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার করণীয় : সারা পৃথিবীতে এখনও নারীকে পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় নানা ক্ষেত্রে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। নারীর কাছ থেকে মঙ্গলজনক কোনো কিছু আশা করতে হলে সর্বপ্রথম তাকে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমায় অধিকার অর্পণ করতে হবে। সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি যত তাড়াতাড়ি বদলানো যাবে ও নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দেওয়া যাবে পরিবার তথা সমাজ ও দেশের জন্য ততই কল্যাণকর। যে কোনো সমাজ তথা দেশ নারীর কাছ থেকে উন্নয়নমূলক ও সৃষ্টিশীল কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। তবে তা চাইলে সর্বাগ্রে ফিরিয়ে দিতে হবে নারীর অধিকার। প্রতিযোগী নয় বরং নারীকে সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে সকল ক্ষেত্রে। নারী নির্যাতনকারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বোপরি নারীর জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার : দেশে নারী যতদিন তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে ততদিন আমরা সমৃদ্ধ জাতি গঠন করতে পারব না। দেশের অর্ধেক জনশক্তিকে অবমূল্যায়ন করে কখনো কোনো জাতি উন্নত হতে পারে না। সামাজের প্রচলিত কুসংস্কার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং নারীর প্রতি হীনদৃষ্টি দূর করতে পারলেই আমরা জাতীয় জীবনে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারব।

৫৮ সমাজকল্যাণে ছাত্রসমাজের ভূমিকা

[সি. বো. ১৫, ব. বো. ১১, দি. বো. ১১]

ভূমিকা : স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে ছাত্রসমাজের গৌবরগাথা। স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশতাব্দী সময়ের পথপরিক্রমায় সামগ্রিক আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে যে উত্তরণের সৃষ্টি হয়েছে, তার নেপথ্যেও আছে একদল দেশপ্রেমিক তরবণ তাজাপ্রাণ ছাত্রসমাজের উজ্জ্বল ভূমিকা। দেশকে আরো এগিয়ে নিতে ছাত্রসমাজকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখতে হবে। ষাটের দশকে যে ছাত্র আন্দোলন ছিল, তা স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে স্বাধিকার আন্দোলন। আজকের আন্দোলন দেশ গড়ার। এই দেশ গড়ার আন্দোলনে ছাত্রসমাজ কীভাবে ভূমিকা পালন করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে নানামুনির নানা মত থাকলেও আন্দোলন সংগ্রাম, রাজনীতির বাইরে থেকেও যে ছাত্রসমাজের সমাজকল্যাণে ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে–এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

পড়ালেখাই একমাত্র সাধনা : সংস্কৃত একটি শেরাক আছে, 'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপ' অর্থাৎ ছাত্রদের একমাত্র সাধনা অধ্যয়ন করা। ছাত্ররা এই কাজটি সঠিকভাবে করলে দেশ ও সমাজে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। যার যা দায়িত্ব তা সঠিকভাবে পালন করার নামই দেশপ্রেম। শিবার আলো ছাত্রদের হাতে থাকলেই সে আলোকিত সমাজ গঠনে অংশ নিতে পারে।

নিরবরতা দূরীকরণে ছাত্রসমাজ : নিরবরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে না পারলে আমরা বেশিদূর যেতে পারব না। তাদের নিজেদের পড়ালেখার ফাঁকে কিংবা বিভিন্ন ছুটির দিনে ছাত্ররা পরিকল্পিতভাবে নিরবরতা দূর করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। যার যার বাড়ি বা বাসার কাজের ছেলে–মেয়ে, গ্রাম ও শহরের সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের একজন সদস্যকে সাবর করতে যদি একজন করে ছাত্র দায়িত্ব নেয়, তাহলে সমাজে নিরবর ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মানবসেবা : মানবসেবা পরম ধর্ম। একজন ছাত্র লেখাপড়ার উদ্দেশ্য ছাড়াও শিবাপ্রতিষ্ঠানে যায় মানবিকবোধকে জাগ্রত করতে। লেখাপড়া শেষ করে সে দেশ ও দেশের মানুষের সেবা করবে–এই শিবাই তাকে দেওয়া হয়। পুঁথিগত বিদ্যার সাথে মানবসেবার বিষয়টি তাকে হাতে–কলমে শিবা দিতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সংঘ আছে। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়সহ দেশ ও জাতির বিভিন্ন সংকটে এইসব সংগঠনের ব্যানারে ছাত্রসমাজ সমাজসেবায় গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বৃবরোপণ অভিযান : মানবসভ্যতার জন্য গাছের গুরবত্ব অপরিসীম। এই গুরবত্ব অনুবাধন করেই প্রতিবছর সরকারি উদ্যোগে বৃবরোপণ সপ্তাহ পালিত হয়। এই অভিযান সার্থক করতে ছাত্রসমাজ গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা বাড়ি, শিবাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি রাস্তাঘাটের পাশে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে গাছ লাগিয়ে সমাজ উন্নয়ন ও দেশ গড়ায় গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

চিকিৎসাসেবা : শুধু বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নয় অন্যান্য সময়ও ছাত্ররা চিকিৎসাসেবায় ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা যে এলাকায় বসবাস করে সেই এলাকার সামর্থ্যবান লোকদের বরাড গ্রবপিং করে তার তালিকা সংরবণ করে জরবরি প্রয়োজনে রক্ত সংগ্রহ পারে। অসহায় রোগীদের হাসপাতালে নিতে সহযোগিতা করতে পারে। ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা, গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং কলেরা ও অন্যান্য রোগে খাবার স্যালাইন ও সরবরাহ সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করতে পারে।

মাদকাসক্তি রোধে ভূমিকা : মাদকাসক্তি বাংলাদেশে অন্যতম একটি জাতীয় সমস্যার নাম। মাদকের বিস্তার ও অপব্যবহার গোটা যুবসমাজের ওপর আঘাত করেছে। সাধারণত উচ্ছল তরবণ সমাজ ও কোমলমতি কিশোররা মাদকের নেশার পথ ধরে চলে ধ্বংসের পথে। নেশার ফাঁদে পড়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে। মাদকের প্রতি ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ছে নতুন প্রজন্ম। এজন্য অনেকাংশে দায়ী মাদকের কুফল সম্পর্কে ছাত্র ও তরবণদের অজ্ঞতা, উদাসীনতা, অসচেতনতা। ছাত্রসমাজ এই অজ্ঞতা দূর করতে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

দরিদ্র ছাত্রদের মাঝে শিবা উপকরণ বিতরণ : সামর্থ্যবান ছাত্ররা মিলে তাদের পুরাতন বই সংগ্রহ করে দরিদ্র ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করতে পারে। তাদের পুরোনো জামা–কাপড় ফেলে না দিয়ে দরিদ্র বন্ধুদের উপহার দিতে পারে। বিন্দু হতেই সিন্ধু হয়, সবাই দশ/পাঁচ টাকা করে দিয়ে ফান্ড গঠন করে দরিদ্র শিবার্থীদের মাঝে খাতা–কলম ও অন্যান্য শিবা উপকরণ বিতরণ করতে পারে।

পলির উন্নয়নে ভূমিকা : আমাদের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস কারে। কিন্তু অশিবা, অবহেলা আর কুসংস্কারের কারণে গ্রামের মানুষ অনেক দিক থেকে পিছিয়ে। ছাত্রসমাজ পলির উন্নয়নে হাতের আলোর মশাল নিয়ে এগিয়ে এলে প্রতিটি গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগবে। তারা সরকারের একটি বাড়ি একটি খামার, খাল কাটা, বায়োগ্যাস প্রকল্প, বিভিন্ন টিকা দান কর্মসূচি পালনে সহযোগিতা করতে পারে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রকল্পকে এগিয়ে নিতে তথ্যপ্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারেও সহযোগিতা করতে পারে। পলিরর অশিবিত অর্ধ–শিবিত কৃষকদের মাঝে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষির ধারণা সৃষ্টিতেও ছাত্রসমাজ গুরবত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। 'একতাই বল' মন্ত্রে তাদের উদ্বুদ্ধ করে সমবায়ের ভিত্তিতে উন্নত জীবন গড়ার কাজেও ছাত্রসমাজ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে।

অন্যায়ের প্রতিবাদ : ছাত্রসমাজ চিরপ্রতিবাদী। তারা অন্যায়–অবিচার সহ্য করে না। আমরা যদি আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকাই দেখতে পাব, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতাযুদ্ধসহ ইতিহাসের প্রতিটি পর্বেই লেখা আছে এ দেশের ছাত্রসমাজের রক্তরাঙা ইতিহাস। সমাজ থেকে অন্যায়–অবিচার দূর করতে ন্যায়ের পবে আজও ছাত্রসমাজ সোচ্চার হলে কোনো শক্তিই তাদের রবখতে পারে না। সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার দূর করতে তারা সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে পারে। বাল্যবিবাহ, অনিয়ম, দুর্নীতি ইত্যাদির বিরবদ্ধে ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে রবখে দাঁড়াতে পারে।

উপসংহার : ছাত্রসমাজকে সব সময় মনে রাখতে হবে, 'বিশ্ব গড়তে হলে সবার আগে নিজেকে গড়তে হবে।' তাদেরকে সবার আগে নিজেকে গড়ার দিকে মনোযোগী হতে হবে। সমাজ উন্নয়নে তারা যে ভূমিকা পালন করবে তা তাদের সহ–শিবামূলক কাজ বলে গণ্য হবে। দেশের ভবিষ্যৎ

যোগ্য ও দৰ কর্ণধার হিসেবে নিজেকে গড়তে এ ধরনের কাজের গুরবত্ব অপরিসীম। কিন্তু তাই বলে স্কুল–কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার বাইরে গিয়ে মূল কাজের ৰতি করে নয়। তাদেরকে বুঝতে হবে, শিৰক ও অভিভাবকরা চালিত হন বিবেক দিয়ে, কিন্তু তরৰণদের বিবেকের চেয়ে অনেক ৰেত্রেই আবেগ বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাই তাদেরকে অবশ্যই শিৰক ও অভিভাবকদের পরামর্শ মেনেই সমাজকল্যাণে অবদান রাখতে হবে।

৫৯ মানুষের বন্ধু গাছপালা

অথবা, বৃৰরোপণ অভিযান [ব. বো. ১৫, রা. বো. ১৩]

অথবা, গাছ লাগান-পরিবেশ বাঁচান

সূচনা : বৃৰ বা গাছপালা মানুষের অকৃত্রিম ও চিরস্থায়ী বন্ধু। মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রৰায় বৃৰের অবদান অসামান্য। এ ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বই আজ সচেতন। বৃৰরোপণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমাদের দেশেও সেৱাগান উঠেছে, 'গাছ লাগান–পরিবেশ বাঁচান'।

বৃৰের প্রয়োজনীয়তা : বিশ্বের বনভূমি উজাড় হতে হতে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে বিশ্ব–পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। অথচ মানুষের বসবাসের উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবীর জন্যে গাছপালার কোনো বিকল্প নেই। অক্সিজেন দিয়ে গাছপালা কেবল আমাদের জীবন রৰা করে না, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রৰায় বৃৰ পালন করে অনিবার্য ভূমিকা। প্রস্বেদন প্রক্রিয়া ও বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বৃৰ আবহাওয়া মণ্ডলকে বিশুদ্ধ রাখে, জলীয় বাষ্প তৈরি করে বাতাসের আর্দ্রতা বাড়িয়ে বায়ুমণ্ডলকে রাখে শীতল। বৃৰ বৃষ্টি ঝরিয়ে ভূমিতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে, বাড়িয়ে দেয় মাটির জলধারণ ৰমতা। তাই বৃৰকে গণ্য করা হয় বায়ুমণ্ডলের বিশুদ্ধকরণ ও শীতলীভবনের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে। এ ছাড়াও গাছপালা মাটির উর্বরতা বাড়ায়, মাটির ৰয় রোধ করে। ঝড়–ঝঞ্ঝা–বন্যা রোধেও পালন করে সহায়ক ভূমিকা। নদী ছাপিয়ে আসা বন্যার তোড়তে ঠেকায় বনভূমি। মাটির ওপর শীতল ছায়া বিছিয়ে দিয়ে ঠেকায় মরৰকরণের প্রক্রিয়াকে।

বাংলাদেশে বৃৰনিধন ও তার প্রতিক্রিয়া : ভারসাম্যমূলক প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যে দেশের মোট ভূমির অন্তত ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। সেৰেত্রে সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ ১৭ শতাংশ। উপরন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ঐ বনভূমির পরিমাণও হ্রাস পাচ্ছে। যেখানে তিনটি গাছ কাটা হচ্ছে সেখানে একটি গাছও লাগানো হচ্ছে কিনা সন্দেহ আছে। ফলে বাস্তবে বনভূমি বাড়ছে না। দুঃখের বিষয়, গত একশ বছরে প্রাকৃতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বনাঞ্চল উজাড় হয়ে গেছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ব্যাপক হারে নির্বিকার বৃৰনিধনের ঘটনা ঘটেছে। ফলে দেশের উত্তর ও উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলের বনভূমির পরিমাণ নেমে এসেছে ৩.৫ শতাংশে। তারই বিরূ প প্রতিক্রিয়া পড়েছে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর আবহাওয়ায়। দিনের বেলা দুঃসহ গরম আর রাতে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, এ লৰণ মরৰকরণ প্রক্রিয়ার আশঙ্কাজনক পূর্বাভাস।

বৃৰরোপণ অভিযান : দেশকে মানুষের বসবাস উপযোগী করার জন্য বনায়নের বিকল্প নেই। কেননা গাছপালাই পরিবেশের ভারসাম্য রৰা করে। কিন্তু গাছ না লাগিয়ে যদি কেবল কেটে ফেলা হয় তাহলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। এজন্য বৃৰরোপণে সমাজের সকল স্তরের লোকজনকে উৎসাহিত করতে হবে। বাংলাদেশের বনায়নের সম্ভাবনা বিপুল। নানাভাবে এ বনায়ন সম্ভব। একটি পন্থা হলো সামাজিক বন উন্নয়ন কর্মসূচি। এর লৰ্য হলো : রাস্তার পাশে বৃৰরোপণে জনসাধারণকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করানো। জনগণ যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কর্মসূচিতে যোগ দেয় সেজন্যে অর্থনৈতিক প্রণোদনা থাকতে হবে। তাছাড়া নানা জাতের বৃৰ মিশ্রণ করে রোপণ করতে হবে যেন গ্রামবাসীরা খাদ্য, ফল, জ্বালানি ইত্যাদি আহরণ করতে পারে। সাধারণ জনগণকে যদি বিপন্ন পরিবেশের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করা যায় তাহলে অনেকেই বৃৰরোপণের কাজে এগিয়ে আসবেন।

আমাদের করণীয় : বৃৰরোপণ অভিযান সফল করার জন্য সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। বাড়ির আশপাশে খালি জায়গাগুলোতে যথাসাধ্য গাছ লাগাতে হবে। বড়দের পাশাপাশি শিশুদের এ ব্যাপারে এখন থেকেই সচেতন করে তুলতে হবে। একটি গাছ কাটার প্রয়োজন হলে আগে কমপৰে দুটি গাছ লাগাতে হবে।

উপসংহার : মানুষ ও প্রাণিকুলের সুরৰিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য বৃৰরোপণ অভিযান অত্যন্ত জরৰরি। এ অভিযান সফল হলে আমাদের জীবন সমৃদ্ধ হবে। দেশ ভরে উঠবে সবুজের প্রশান্তিতে।

৬০ বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

ভূমিকা : বাংলাদেশের পোশাক শিল্প অন্যান্য শিল্পের তুলনায় বেশ এগিয়ে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের বেশির ভাগ অংশই আসে এই শিল্প থেকে। এই শিল্প বাংলাদেশের শিল্পৰেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এককালে মসলিন ও জামদানির জন্য পৃথিবীখ্যাত বাংলাদেশ আবার বস্ত্রৰেত্রে নতুন ধরনের গৌরব অর্জনের পথে পা বাড়িয়েছে। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ এখন সুপরিচিতি লাভ করেছে পোশাক শিল্পের কল্যাণে।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের সূচনা : বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরে মূলত ১৯৭৬ সাল থেকে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরব হয়। আশির দশকের গোড়ার দিকে গার্মেন্ট শিল্প দ্রবত বিকাশ লাভ করতে থাকে। মূলত বেসরকারি উদ্যোগেই এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ দেশে ১৯৮৩ সালে মাত্র ৫০টির মতো কারখানা ছিল। বর্তমানে তা তিন হাজারেরও অধিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ সময়ের মধ্যে কর্মসংস্থানও ১০ হাজার থেকে শুরব করে প্রায় ৩০ লাখে উপনীত হয়েছে, যা উৎপাদন খাতে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের ১৫%–এরও অধিক। পোশাক শিল্প খাত বর্তমানে দেশের অর্থনীতির বৃহৎ খাত, বৈদেশিক বাণিজ্যের সর্ববৃহৎ খাত এবং নারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী বৃহৎ খাত।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বাজার : বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ক্রেতা। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সবচেয়ে বড় ক্রেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তার পরেই ইউরোপ ও কানাডা। বিশ্বের

১২২টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়ে থাকে। যুক্তরাজ্য ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও বাংলাদেশ থেকে পোশাক রপ্তানি হয়ে থাকে। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। উলেরখ্য, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি পোশাকের বেশ চাহিদা রয়েছে। ফলে এর বাজার যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি এর উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোশাক শিল্প বিরাট অবদান রাখবে এবং দেশের বেকার সমস্যা সমাধানেও গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবদান : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ৰেত্রে পোশাক শিল্প সুদূরপ্রসারী অবদান রেখে চলেছে। এ খাতের অবদানের প্রধান দিকগুলো হচ্ছে :

১. জাতীয় আয়ের প্রায় ৬৪ অংশ আসে এই খাত থেকে। তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রাণপ্রবাহ সচল রাখতে সাহায্য করছে।
২. প্রায় ৩০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে এই খাতে। এরা পেয়েছে স্বাবলম্বী জীবন ও অর্থনৈতিক মর্যাদা।
৩. পোশাক শিল্প বিকশিত হওয়ায় দেশে রপ্তানিজাত আইটেমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রপ্তানি আয়ও বেড়েছে। বর্তমানে রপ্তানি আয়ের ৬৩% আসছে এই শিল্প থেকে।
৪. পোশাক শিল্প দেশে দ্রবত শিল্পের প্রসার ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন স্পিনিং, উইভিং, নিটিং ডাইং, ফিনিশিং এবং প্রিন্টিং শিল্প প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া গার্মেন্টস শিল্প রপ্তানির জন্যে প্যাকেজিং, গামটেপ, জিপার, বোতাম ও বগলস শিল্পের প্রসার ঘটেছে।
৫. তৈরি পোশাক শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছে। ২০১৪–২০১৫ অর্থবছরে এ খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে ২৫৪৯ কোটি ডলার।
৬. পোশাক শিল্পের সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানির ফলে বন্দর থেকে ফ্যাক্টরি পর্যন্ত পরিবহন শিল্পের অগ্রগতি হয়েছে এবং এসবের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে।
৭. গার্মেন্ট শিল্পে বিনিয়োগ করে ব্যাংক লাভবান হচ্ছে। বিমা কোম্পানির প্রিমিয়ামের পরিমাণ বাড়ছে।

পোশাক শিল্পের সমস্যা : বহুবিধ সুযোগ–সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে এখনো নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সরকার পোশাক শিল্পের অনুকূলে প্রায়ই মুদ্রার অবমূল্যায়ন করে যাচ্ছে। তথাপিও সুদের হার এবং অন্যান্য আর্থিক নীতি এ খাতের অনুকূল নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বন্দর সুবিধাও পর্যাপ্ত নয়। অসুবিধাসমূহের মধ্যে উলেরখযোগ্য হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অস্পষ্ট খরচ। ফাইল মুভমেন্ট, এলসি খোলা, মাল খালাস প্রভৃতি ৰেত্রে নানা ধরনের অস্পষ্ট ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা এ শিল্পকে দারবণভাবে ৰতিগ্রস্ত করছে। এর ফলে উৎপাদন ব্যয়ও বেড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কাঁচামাল ঢাকার কারখানায় পৌঁছাতে যেখানে সাত দিন সময় লাগার কথা সেখানে বর্তমানে প্রায় একুশ দিন লেগে যায়।

সমস্যা সমাধানে সরকারের করণীয় : ইতিমধ্যে সরকার পোশাক শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধির লব্যে অনেকগুলো সুযোগ–সুবিধা দিয়েছে। যেমন– এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম, এক্সপোর্ট পারফরম্যান্স লাইসেন্স, রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত এলাকা স্থাপন, রপ্তানিকারকদের বিদেশ সফরের সুবিধা, সরকারি পুরস্কার ইত্যাদি। তারপরও আরও কিছু করণীয় সরকারের রয়ে গেছে। এগুলো হচ্ছে :

১. মূল্য সংযোজন কর হার কমিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে শক্তিশালী প্রতিযোগিতার ৰেত্রে টিকে থাকতে সহযোগিতা করা।
২. কারখানা বিমার ৰেত্রে ফ্লাড সাইক্লোন শর্ত শিথিল করা।
৩. দ্রবত রপ্তানির জন্য কার্গো বিমান চার্টার করার অনুমতি প্রদান।
৪. লোডশেডিং বন্ধ করা এবং নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৫. রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে ইপিজেডের মতো সুযোগ–সবিধা প্রদান।
৬. পোশাক শিল্প প্রসারের জন্যে উদারভাবে সুযোগ–সুবিধা প্রদান।
৭. কোটানীতি–সংক্রান্ত দুর্নীতির অবসান।
৮. আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী আরো নতুন নতুন পোশাক তৈরির দিকে মনোযোগ প্রদান।
৯. বস্ত্রশিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দেশে পর্যাপ্ত কাঁচামাল উৎপাদনের পদৰেপ গ্রহণ।

পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা : পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় ৰেত্র বলে মনে করা হয়। তবে বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্পকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এজন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে আইএসও সনদ গ্রহণ করতে হবে; যেহেতু ক্রেতারা এ বিষয়টির ওপর গুরবত্ব দিচ্ছে। সর্বোপরি দৰতা বৃদ্ধি ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের বস্ত্র ও পোশাকের মানোন্নয়ন, মূল্য হ্রাস করে চ্যালেঞ্জকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার : আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যান্য দেশের সাথে প্রবল প্রতিযোগিতা করেই আমাদেরকে টিকে থাকতে হবে। কিন্তু অবকাঠামোগত সুযোগ–সবিধার অভাবসহ বিরাজিত অন্যান্য সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ এখনই না নিলে ভবিষ্যতে মুক্ত বাজারে আমাদের এ সম্ভাবনাময় খাতটি যে মার খাবে তা একপ্রকার নিশ্চিত। বিশেষত আমাদের কাঁচামাল দিয়েই যদি আমরা পোশাক তৈরি করতে পারি তা হবে দেশের জন্য সোনায় সোহাগা। পোশাক শিল্পের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোকে সমাধান করে বিশ্বের দরবারে এই শিল্পকে অনন্য মর্যাদায় আসীন করা যায়।

৬০ গ্রাম্য মেলা

ভূমিকা : গ্রামীণ জীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান উপকরণ গ্রাম্য মেলা। বিনোদনহীন নিরানন্দ একঘেয়ে গ্রাম্য জীবনে আনন্দের জোয়ার নিয়ে আসে মেলা। গ্রামবাসী এই দিনটির প্রতীৰায় প্রহর গোনে। জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। মানুষের সাথে মানুষের, শিল্পের সাথে শিল্পীর এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হয়। মানুষের মেলা আর মেলার মানুষ একসূত্রে বাঁধা পড়ে।

মেলার উৎপত্তি : মেলার শুরব ঠিক কবে থেকে সে সম্পর্কে কোনো লিপিবদ্ধ ইতিহাস নেই। অর্থাৎ, মেলার জন্মকথা সম্পর্কে সঠিক ধারণা

দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এ কথা বলা যায়, যখন থেকে ব্যবসায়–বাণিজ্যের শুরব, তখন থেকে মেলারও শুরব।

মেলার স্থান, উপলব্য : গ্রামের বেশির ভাগ মেলাই বসে নদীর তীরে। মেলার পসরা সাজিয়ে দূর–দূরান্ত থেকে আসে নৌবহর। বিশাল বট কিংবা অশ্বত্থের ছায়ায়, কখনো বা বিস্তৃত খোলা মাঠে বসে মেলা। নির্জন অশ্বত্থতল কিংবা নদীতীর হয়ে ওঠে কোলাহল মুখরিত। নানা উপলৰে গ্রামে মেলা বসে। আবহাওয়া ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন জনপদে মেলার বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রবীণরা এখনো বলেন, এলো পৌষ বলে শীত যখন জেঁকে বসে তখন প্রথমেই মনে পড়ে যায় মেলার কথা। শীতের শেষে গাঁয়ের মানুষের শস্যভাণ্ডার থাকে পূর্ণ। পিঠা–পার্বণের উৎসব চলে। এ সময় তাদের অখণ্ড অবসর। এই অবসরে আনন্দের স্পর্শ জাগায় মেলা। বাংলা বছরের শেষে চৈত্রসংক্রান্তির মেলার মধ্য দিয়ে পুরোনো বছরকে বিদায় আর বৈশাখি মেলায় নববর্ষকে স্বাগত জানানো হয়। এ ছাড়াও মহররমের সময়ও মেলা বসে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে বসে মেলা। আবহমানকাল থেকেই ধর্মীয় ও লৌকিক উপলৰকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে মেলা। রবীন্দ্র পরিবারে ছিল মেলার চল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দীৰা উপলৰে বাংলা ১২৫০ সনের ৭ই পৌষ একটি মেলার আয়োজন করেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে শান্তিনিকেতনে মেলা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। মেলার উদ্বোধনী দিনে তিনি ভাষণও দিতেন। এমনই এক মেলায় উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'এই মেলার উৎসবে পলৰী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়। হৃদয় খুলে দান করবার ও গ্রহণ করবার এই মেলাই হলো প্রধান উৎস ও উপলৰ।'

গ্রাম্য মেলার পুরনো ইতিহাস : বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে মেলার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। মোগল আমলে নানা উপলৰকে কেন্দ্র করে প্রায়ই গ্রাম্য মেলা বসত। 'আইন–ই–আকবরী'তে বলা হয়েছে, মেলা এলেই গ্রামে পড়ে যেত সাজ সাজ রব। গ্রামবাংলার আসল রূ প যেন তখনই ফুটে উঠত। মানুষের মন তখন আনন্দমুখর। এরও আগে মেলা রাজ–আঙিনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কালের আবর্তে মেলা সাধারণ জনগণের আওতায় আসে। গাঁয়ের সাধারণ মানুষই হয়ে ওঠে গ্রাম্য মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা ছিল গ্রাম্য মেলাগুলোর। মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল কবিগান, পালাগান, যাত্রা, লেটোর আসর। অতীতে প্রধানত শীতকালেই মেলা হতো। কালক্রমে তা ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান, ঋতু উৎসব, লোকজ সংস্কৃতি, পালা–পার্বণ ইত্যাদিতে বিস্তৃতি পায়। বৈশাখি মেলা, কার্তিকের মেলা, আশুরার মেলা, রথের মেলা, পৌষ সংক্রান্তির মেলা, রাস পূর্ণিমার মেলা, মাঘী পূর্ণিমা তিথি মেলা ইত্যাদি একসময় শুধুই গ্রামবাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে তা গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে আধুনিক যান্ত্রিক জীবনের কর্মকোলাহলের মাঝেও ঠাঁই করে নিয়েছে।

মেলায় যেসব জিনিসের সমাগম ঘটে : নতুন ধানের তৈরি পিঠে–পুলি, পায়েস, কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য যেমন– বাঁশ–বেতের ডালা, কুলা ও অন্যান্য আসবাব, বিভিন্ন ধরনের খেলনা; মৃৎশিল্প যেমন– মাটির হাঁড়ি–পাতিল, ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিস, পুতুল, তাল পাতার পাখা, শীতলপাটি, নকশিকাঁথা, লোহার ও কাঠের নানা সামগ্রী, বিন্নি ধানের খই, বাতাসা, নাড়ু, ছাঁচের তৈরি বিভিন্ন জিনিস যেমন– হাতি, ঘোড়া, পাখি, আম, কাঁঠাল, মসজিদের গম্বুজ, মন্দিরের চূড়ো, নলেন গুড়ের তৈরি বিভিন্ন মিষ্টি ইত্যাদি অসংখ্য সামগ্রীর সমাবেশ ঘটে।

গ্রাম্য মেলার তাৎপর্য : বাংলার গ্রামীণ জীবন যেন সার্থকভাবে ফুটে ওঠে গ্রামের মেলায়। মেলা যেন উপেৰিত গ্রামের মানুষদের আত্মপ্রকাশের ৰেত্র। গ্রামের আর্থ–সামাজিক জীবনের সাথে মেলার যোগ নিবিড়। হস্ত ও কুটিরশিল্প এবং রকমারি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সমাবেশ ঘটে মেলায়। গ্রামের অবহেলিত সম্প্রদায়– দরিদ্র কুমোর, কামার, তাঁতি তাদের তৈরি পণ্য নিয়ে সহজেই মেলায় আসতে পারে। পণ্যের কারিগরের সাথে ক্রেতার সরাসরি সংযোগ তৈরি হয়। সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়। আবিষ্কৃত হয় নানা রকম নকশা, কারৰকাজ। ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান পায় পূর্ণতা। কঠোর পরিশ্রমী মানুষ কিছুদিনের জন্য আনন্দে অভিভূত হয়। এমন প্রাণপ্রাচুর্যময় আয়োজন আর দেখা যায় না। পসরা কেনাবেচার পাশাপাশি চলে লাঠিখেলা, ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতা, মোরগের লড়াই, হা–ডু–ডু, পুতুল নাচ প্রভৃতি খেলা। বাঙালি নতুন করে স্বাদ পায় হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যের।

উপসংহার : গ্রামবাংলার মেলা আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্য। বছরের পর বছর এই মেলা আমাদের সংস্কৃতিকে একভাবে টিকিয়ে রেখেছে, যদিও আজ নগর জীবনের বিলাসিতার উপকরণ গ্রামগুলোকেও ছুঁয়ে যাচ্ছে। শহরের বৈদ্যুতিক বাতি, মাইক্রোফোনে ব্যান্ড সংগীত মেলার পুরনো ঐতিহ্যকে অনেকটাই পাল্টে দিয়েছে। তারপরও মেলার দিনটির জন্যই অধীর আগ্রহে অপেৰা করে থাকে গাঁয়ের মানুষ। গ্রামে এমন প্রাণোচ্ছল সময়, এমন প্রাচুর্যময় মিলনমেলা আর কখনো আসে না।